অধ্যাপক অমল রায়
অধ্যাপক মোহিত ভট্টাচার্য

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্স পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুসারে লিখিত

• •

সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও মহারাজা
মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক

শ্রীঅমল রায়, এম. এ.

ও

মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ ও যাদবপুর
বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীমোহিত ভট্টাচার্য, এম. এ.

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ ঃ কলিকাতা-১২

ARTHANITI

O

POURABIJNAN

[Elements of Economics and Civics in Bengali for Pre-University & Entrance Students]

By Profs. Ray & Bhattacharya

Price Rs. 5·00 only

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ, ১৯৬১

মূল্য ৫·০০ (পাঁচ টাকা মাত্র)

মুদ্রাকর :
শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত
নবশক্তি প্রেস
১২৩, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

গ্রন্থ-পরিচিতি

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নিজস্ব পরিভাষা ও বিশ্লেষণভংগীর মাধ্যমে আলোচনার স্বয়ংসম্পূর্ণ শৃঙ্খলায় রূপান্তর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আধুনিক সমাজবিজ্ঞান-গুলিতে সুসম্বদ্ধ তত্ত্বসৃষ্টির বহুল প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতির আলোচনায় এ-জাতীয় তত্ত্বের সংখ্যা প্রচুর। অনুরূপ তত্ত্বগুলি আপাতকঠিন হইলেও সামাজিক ব্যবহার হইতে উদ্ভূত বলিয়া দুর্বোধ্য নয়; তত্ত্বের সহিত ব্যবহারের ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করিতে পারিলে এগুলি সহজেই বোধগম্য হয়। প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য লিখিত এই পুস্তকটিতে অনুরূপ বিশ্লেষণভংগী সাবলীলভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রসংগতঃ প্রাক্‌বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর পাঠ্যসূচীর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। পাঠ্যসূচীর পরিধি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নয়, অথচ, অত্যল্প সময়ের মধ্যে সম্যক্ সূচী-পরিচিতি প্রয়োজন। সমস্যাটি 'পঞ্চতন্ত্র'-বর্ণিত বিষ্ণুশর্মার সমস্যার সমগোত্রীয়। সমাধানের কোন স্বর্ণালী পথ নাই জানিয়া বিষয়নিষ্ঠ বিশ্লেষণ প্রয়োগে স্বল্পপরিসরের মধ্যে আলোচনা সাবলীল ও সীমিত করা হইয়াছে। বিষয় পরিবেষণ করা ছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের বিষয়-আগ্রহী করা পুস্তকটির অন্যতম লক্ষ্য।

রচনা-প্রচেষ্টায় উৎসাহদাতাদের মধ্যে অধ্যাপক জ্যোতিরিন্দ্র দাশগুপ্ত (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ) ও অধ্যাপক জয়ন্ত রায়ের (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থনীতি অংশের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া ও সুচিন্তিত মন্তব্য করিয়া অধ্যাপক কানন মজুমদার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। নানারূপে সাহায্য করিয়া আমাদের ঋণপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন শ্রীসুনীল চক্রবর্তী, অধ্যাপক নবেন্দু সেন (প্রেসিডেন্সী কলেজ), অধ্যাপক সরল চট্টোপাধ্যায় (সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ), অধ্যাপক অনিল গুহ (মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজ), অধ্যাপক অমর সেনগুপ্ত (ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ) ও রবীন্ মাইতি।

পরিশেষে, সুবিখ্যাত প্রকাশক শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সুযোগ্য সহকারীবৃন্দের অকুণ্ঠ সহযোগিতা পুস্তকটির প্রকাশনে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কলিকাতা
১১ই আষাঢ়, ১৩৬৮

অমল রায়
মোহিত ভট্টাচার্য

৭

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড ঃ অর্থনীতি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা ও অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা

তৃতীয় খণ্ড : রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরনীতি

প্রথম খণ্ড

অর্থনীতি

প্রথম অধ্যায়

অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়
(Subject-matter and Scope of Economics)

সমাজ-বদ্ধ মানুষের আর্থিকজীবন ও তাহার আনুষঙ্গিক সমস্যাবলী অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়। প্রতিটি মানুষকে কোন না কোন কার্যে লিপ্ত থাকিয়া জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিতে হয়। মানুষ অর্থ উপার্জন করে এবং এই উপার্জিত অর্থের সাহায্যেই প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকে। সামাজিক জীবনে অর্থের ভূমিকা স্বভাবতঃই গুরুত্বপূর্ণ। চাল, ডাল হইতে সুরু করিয়া সিনেমার টিকিট, কবিতার বই সমস্তই অর্থের বিনিময়ে আমরা পাইয়া থাকি। জীবনের প্রায় সর্বক্ষেত্রেই অর্থের এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য মনে করা হয় যে, মানুষের কার্যাবলীতে অর্থের ভূমিকাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কিন্তু, একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় ঠিক অর্থের ভূমিকা পর্যালোচনা নয়; অর্থের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি মৌলিক সমস্যার আলোচনাই অর্থনীতির বিষয়বস্তু।

প্রথমতঃ, মানুষের চাহিদার তুলনায় সামগ্রীর যোগান অপ্রচুর। মানুষের অভাবের সীমা নাই। প্রকৃতপক্ষে, অভাববোধ মানুষের একটি বৈশিষ্ট্য। প্রাথমিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য অন্নবস্ত্র প্রয়োজন হয়; আবার, উচ্চতর রুচির সন্তুষ্টির জন্য মানুষ চাহিয়া থাকে রুচিসম্পন্ন অভিজাত সামগ্রী। এই সমস্ত চাহিদার তুলনায় কিন্তু, অভাব-সন্তুষ্টির সামগ্রীর অপ্রাচুর্য (scarcity) একটি নূতন সমস্যার সৃষ্টি করে। সামগ্রীর অপ্রাচুর্যই নির্বাচন (choice) সমস্যার সৃষ্টি করে। ইহাই অর্থনীতিক জীবনের দ্বিতীয় সমস্যা। নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক করিতে হয় কোন্ অভাবটির আশু নিষ্পত্তি করা প্রয়োজন, কোন্‌টি আপাততঃ স্থগিত রাখিলেও চলিবে এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে নিয়োগ করা প্রয়োজন। কোন একখণ্ড জমিতে ধান রোপণ করা যায় আবার পাটও উৎপাদন করা যায়। এই ক্ষেত্রে উপাদানের বিকল্প ব্যবহারের সমস্যা দেখা দেয়। ফলে, সঠিক নির্বাচনের সমস্যার উদ্ভব ঘটে। তৃতীয়তঃ, বিনিময়ের (exchange) সমস্যা অর্থনীতির তৃতীয় সমস্যা। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহার হেতু

বিশেষীকরণ (specialisation) দেখা দেয়। যেমন, যাহারা জুতা প্রস্তুত করে তাহাদের শুধুমাত্র এই কার্যেই বিশেষীকরণ হয়। অতএব জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর (চাল, ডাল ইত্যাদি) জন্য তাহারা অন্যান্য উৎপাদনকারীর উপর নির্ভরশীল। এই পরস্পর নির্ভরশীলতা হইতে বিনিময় সমস্যা দেখা দেয়। অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন সামগ্রীর মধ্যে বিনিময় ঘটিয়া থাকে।

যে সমাজ-বিজ্ঞান উপরোক্ত সমস্যাগুলি আলোচনা করে তাহাকেই অর্থনীতি বলা হয়।

অর্থনীতির আলোচনার মধ্যে অর্থের ভূমিকার উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করিয়া কেহ কেহ ইহার কদর্থ করিয়াছেন 'অর্থের শাস্ত্র' (science of wealth) বলিয়া। কিন্তু, এই মত ভ্রান্ত। কারণ, অর্থের কোন নিজস্ব মূল্য নাই। মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার কার্যেই ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। মানুষের প্রয়োজনের বাহিরে অর্থের নিজস্ব কোন অস্তিত্ব নাই ; অর্থের জন্য অর্থ নয়, সামগ্রীর জন্য অর্থ। প্রয়োজন ও পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টাই অর্থনীতির মুখ্য আলোচ্য বিষয়। অর্থের ভূমিকা মুখ্য নয়, গৌণ ; অর্থ উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য সাধনের নিছক উপায় মাত্র। কার্লাইল্, রাস্কিন্ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হইয়া অর্থনীতিকে যখের শাস্ত্র ও নীরস ও ভয়ঙ্কর শাস্ত্র এইরূপ আখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধারণা,—অর্থনীতি একমাত্র অর্থ-সঞ্চয়কেই জীবনের চরমতম উদ্দেশ্য হিসাবে শিক্ষা দেয়। বহুমুখী জীবনের বৈচিত্র্য হইতে বঞ্চিত করিয়া মানুষকে অর্থনীতি সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে। কিন্তু, সমালোচকদের এইরূপ মন্তব্য ভ্রমাত্মক। জীবনের বৈচিত্র্যকে উপেক্ষা করিয়া অর্থনীতি মানুষকে অর্থকেন্দ্রিক করিয়া তোলে না। অর্থ উপায় মাত্র, ইহা জীবনের উদ্দেশ্য নয়। জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনকে চরিতার্থ করিবার জন্যই অর্থকে উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। অর্থনীতির আলোচনার গুরুত্ব আরোপ করা হয় অর্থের উপর নয়, অর্থের সাহায্যে জীবনের প্রয়োজন পরিতৃপ্তির প্রচেষ্টার উপর।

অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of the study of Economics) :

অর্থনীতির বিরুদ্ধ সমালোচকদের ভ্রান্ত মতবাদ বর্তমানযুগে গ্রহণযোগ্য নয়। আধুনিক জগতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ইহার

কারণ প্রথমতঃ, পরস্পরবিরোধী ভ্রান্ত ধারণার নিরসন হয় অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমে। ভোগব্যবহারকারী হিসাবে আমরা অধিক অর্থ উপার্জন করিতে চাই অভাব-পরিতৃপ্তির জন্য ; আবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা চাই যে সামগ্রীগুলির মূল্য যেন স্বল্প হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার এদুটি ধারণা পরস্পরবিরোধী। কারণ, আয় বৃদ্ধি পাইলে বর্ধিত চাহিদার জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থনীতি পাঠ করিলে এই ভ্রান্ত ধারণা হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যাবলী উপলব্ধি করিতে হইলে অর্থনীতির জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক রাষ্ট্রের গঠন ও রূপবিন্যাস অনেকাংশে অর্থনীতিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থার বিভিন্ন রূপ নির্ধারিত হয়। বর্তমান কালে রাজনীতিতে যে সমস্ত মতবাদের বহুল প্রচার দেখা যায় তাহাদের ভিত্তি মূলতঃ অর্থনৈতিক। যেমন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি মতবাদের উদ্দেশ্য হইল অর্থনৈতিক ত্রুটিগুলির অপসারণের মাধ্যমে নূতন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করা। বর্তমানকালে প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রই জনসাধারণের কল্যাণকার্যে লিপ্ত। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতি ও উপাদানগুলির সুষ্ঠু ব্যবহারের প্রচেষ্টা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং, অর্থনীতিতে ব্যুৎপত্তি না থাকিলে আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী ও রাজনৈতিক মতবাদের অর্থ ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, অর্থনীতি পাঠের ফলে কুসংস্কারের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল হইয়া উঠে।

চতুর্থতঃ, অর্থনীতির একটি ব্যবহারিক দিক আছে। ব্যবসায়ীদের পক্ষে অর্থনীতির জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। ব্যবসায়ের গতিপ্রকৃতি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমস্যা, প্রভৃতি অর্থনৈতিক সমস্যা অনুধাবন করিতে না পারিলে ব্যবসায় সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয় ন।

সুতরাং, অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the scope of Economics and frame a suitable definition.
   (অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু আলোচনা করিয়া ইহার একটি উপযুক্ত সংজ্ঞা নির্দেশ কর।)
   (পৃঃ ৩ ও ৪ দেখ)

2. "Economics is a study of mankind in the ordinary business of life." Explain.

(অর্থবিদ্যা মানুষের সাধারণ কাজকর্মের পর্যালোচনা করে—এই উক্তিটির ব্যাখ্যা কর।)

(পৃঃ ৩ ও ৪ দেখ)

3. "Economics is the science of wealth." Do you think this definition satisfactory ?

'অর্থবিদ্যা অর্থের বিদ্যা', এই সংজ্ঞাটি কি সন্তোষজনক ?) (পৃঃ ৪ দেখ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

অর্থনীতির কয়েকটি মৌলিক ধারণা
(Some Fundamental Economic concepts)

অর্থনীতিতে ব্যবহৃত মৌলিক ধারণাগুলির বিশিষ্ট অর্থ আছে। এইগুলি উপলব্ধি করিতে পারিলে অর্থনীতির আলোচনা অনুধাবন করিতে সুবিধা হয়।

দ্রব্য (Goods)ঃ যাহা মানুষের প্রয়োজন মেটায় তাহাই দ্রব্য। দ্রব্য দুই প্রকার ঃ বস্তুগত (material) ও অ-বস্তুগত (non-material)। যেমন, ডাক্তারের চিকিৎসা আমাদের প্রয়োজন মেটায়, কিন্তু ইহা অ-বস্তুগত ; অপরপক্ষে, কলমের সাহায্যে আমরা লিখিয়া থাকি, অতএব, কলম বস্তুগত দ্রব্য। এই সমুদয় বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ আয়াসলব্ধ (Economic) ও অনায়াসলব্ধ (Free) দ্রব্য। বাতাস, সূর্যালোক ইত্যাদি প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি ইচ্ছামত সংগ্রহ করা যায়। এই দ্রব্যগুলির সরবরাহ অফুরন্ত। অতএব, এইগুলি অনায়াসলব্ধ দ্রব্য। কিন্তু, কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা ইচ্ছামত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। ইহাদের সরবরাহ সীমাবদ্ধ। খাদ্য, বস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্যগুলি এই জাতীয়। এইগুলির সাহায্যে মানুষ তাহার প্রয়োজন মেটায় ; কিন্তু, প্রয়োজনের তুলনায় ইহাদের যোগান সীমাবদ্ধ। এইগুলি আয়াসলব্ধ দ্রব্য।

আয়াসলব্ধ দ্রব্যগুলি দুই প্রকার ঃ ভোগ্য দ্রব্য (consumption goods) ও উৎপাদন দ্রব্য (production goods)। যে সমস্ত আয়াসলব্ধ দ্রব্য সরাসরি উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাহাদের বলা হয় ভোগ্য দ্রব্য। চাউল, তৈল, বস্ত্র প্রভৃতি এই জাতীয়। অপরপক্ষে, যে সমস্ত আয়াসলব্ধ দ্রব্য সরাসরি

ভোগের জন্য ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাদের উৎপাদন দ্রব্য বলা হয়। কৃষকের লাঙল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদন দ্রব্য।

ব্যবহার অনুযায়ী কোন বস্তু কখনও ভোগ্য দ্রব্য কখনও বা উৎপাদন দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। যেমন, একটি বাড়ী যদি বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে ইহা ভোগ্যদ্রব্য ; আবার যদি বাড়ীটি কারখানা হিসাবে উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তবে ইহা উৎপাদন দ্রব্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পদ (Wealth)ঃ চলিত কথায় সম্পদ বলিতে টাকাকড়ি বুঝায়। কিন্তু অর্থনীতির পরিভাষায় ইহার বিশেষ অর্থ আছে। মানুষের অভাব-চরিতার্থকারী অপ্রচুর ও দুর্লভ দ্রব্যকে অর্থনীতিতে সম্পদ বলা হয়। এই অর্থে বাতাস বা সূর্যালোক সম্পদ নয় ; কিন্তু, চাল, গম, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সম্পদ। কোন দ্রব্য সম্পদ কি না, তাহা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে ঃ

(ক) উপযোগিতা (Utility)ঃ যে বস্তু সম্পদ-পর্যায়ভুক্ত মানুষের প্রয়োজন মিটাইবার শক্তি তাহার থাকা দরকার। যে বস্তু মানুষের প্রয়োজন মেটায় না তাহাকে সম্পদ বলা যায় না।

(খ) অপ্রাচুর্য (Scarcity)ঃ শুধুমাত্র অভাব মিটাইবার সামর্থ্য থাকিলেই কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলা যায় না। দ্রব্যটির যোগান সীমাবদ্ধ হওয়া চাই। একই বস্তু অবস্থাভেদে সম্পদ হইতেও পারে, আবার নাও হইতে পারে। যেমন, নদীবহুল অঞ্চলে জলের সরবরাহ প্রচুর বলিয়া সেখানে উহা সম্পদ-পদবাচ্য নয়। কিন্তু, সহরাঞ্চলে জলের সরবরাহ অপ্রচুর হওয়ায় সেখানে উহা সম্পদ শ্রেণীভুক্ত।

(গ) হস্তান্তরযোগ্যতা (Transferability)ঃ

সম্পদ-শ্রেণীভুক্ত বস্তু শুধু প্রয়োজনীয় ও অপ্রচুর হইলেই চলিবে না ; ইহা হস্তান্তরযোগ্যও হওয়া চাই। এই অর্থে ব্যক্তিগত গুণাবলী (সততা, ভদ্রতা ইত্যাদি) হস্তান্তর করা সম্ভব নয়। এই ব্যক্তিগত গুণাবলী মানুষের আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা। ইহারা বাহ্যদ্রব্য নয়। অতএব, এই গুণগুলি সম্পদ নয়। অপরপক্ষে, ঝরণা কলম, চাল, ডাল ইত্যাদি হস্তান্তরযোগ্য। ইহারা সম্পদ-শ্রেণীভুক্ত।

শিক্ষকের শিক্ষাদান, চিকিৎসকের চিকিৎসা ইত্যাদি বস্তুগত দ্রব্য নয়। কিন্তু, সম্পদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই এই কার্যগুলিতে দৃষ্ট হয়। এগুলি প্রয়োজনীয়, অপ্রচুর ও হস্তান্তরযোগ্য ; অতএব, এই সমস্ত কার্যাবলী সম্পদভুক্ত।

ব্যক্তিগত সম্পদ ও যৌথ সম্পদ (Individual wealth and collective wealth) :

সম্পদ দুই প্রকার : ব্যক্তিগত ও যৌথ। ব্যক্তিগত সম্পদের উপর এক বা একাধিক ব্যক্তির মালিকানা থাকে। ঘরবাড়ী, জমিজমা ইত্যাদি ব্যক্তিগত সম্পদ। অপরপক্ষে, যে সম্পদ এক বা একাধিক ব্যক্তির নহে, রাষ্ট্রের মালিকানা যাহার উপর থাকে তাহা যৌথ সম্পদ। যেমন, ভারতবর্ষের রেলব্যবস্থা, ডাক ব্যবস্থা ইত্যাদি যৌথ সম্পদ।

সম্পদ ও জনকল্যাণ (Wealth and welfare) :

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেই জনসাধারণের মঙ্গল হইয়া থাকে। কিন্তু, জনকল্যাণের সহিত সম্পদের কোন প্রত্যক্ষ যোগ নাও থাকিতে পারে। অর্থাৎ, সম্পদ বৃদ্ধি পাইলে জনকল্যাণের ব্যাপ্তি নাও ঘটিতে পারে। যেমন, সম্পদ বৃদ্ধির ফলে যদি দেশের আয়গত অসাম্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং দেশের জনসাধারণ বস্ত্র, খাদ্য ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী হইতে বঞ্চিত হয় তবে, সম্পদবৃদ্ধি সত্ত্বেও জনকল্যাণ হয় না।

আয় (Income) :

বস্তুগত দ্রব্য ও সেবাকার্যের মূল্যের সমষ্টিকেই অর্থনীতিতে আয় বলে। আয় দুই প্রকার—আর্থিক আয় (Money income) ও প্রকৃত আয় (Real income)। শ্রমের বিনিময়ে ব্যক্তি যে অর্থ উপার্জন করে তাহাই তাহার আর্থিক আয়। আবার, উপার্জিত অর্থের দ্বারা ব্যক্তি যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্য ভোগ করিতে পারে তাহাই ব্যক্তির প্রকৃত আয়। আর্থিক আয় বৃদ্ধি পাইলেই প্রকৃত আয় বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে। মুদ্রাস্ফীতিকালে মূল্যস্তর বৃদ্ধির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে ব্যক্তির আর্থিক আয় কিছুটা বৃদ্ধি পাইলেও তাহার প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায় না।

ব্যক্তিগত আয়ের ধারণা হইতেই জাতীয় আয় (National income) সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। জাতির অন্তর্ভুক্ত সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক আয়কেই বলা হয় জাতীয় আয়।

মূল্য (Value) :

প্রত্যেক প্রয়োজনীয় বস্তুর একটি মূল্য থাকে। এই 'মূল্য' কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয় : প্রয়োজনমূল্য (value-in-use) এবং বিনিময়মূল্য

(value-in-exchange)। প্রয়োজনের দিক হইতে কোন অভাব-চরিতার্থকারী বস্তুর যে মূল্য স্বীকৃত হয়, তাহাই তাহার প্রয়োজনমূল্য। যেমন, সূর্যালোক বা বাতাসের প্রয়োজনমূল্য যথেষ্ট। কিন্তু ইহাদের বিনিময়-মূল্য নাই। অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে ইহাদের সংগ্রহ করিতে হয় না। কোন একটি বস্তুর বিনিময়ে অপর একটি বস্তুর যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাহাই প্রথমোক্ত বস্তুর বিনিময় মূল্য। যেমন, একটি ঘড়ির বদলে যদি পাঁচটি ঝরণা কলম পাওয়া যায় তবে, ঘড়িটির বিনিময় মূল্য পাঁচটি ঝরণা কলমের সমান।

প্রয়োজন মূল্য ও বিনিময়মূল্য দুইটি পৃথক ধারণা। একটি পোস্ট কার্ডের প্রয়োজনমূল্য যথেষ্ট, কিন্তু, ইহার বিনিময়মূল্য সামান্য। অপরপক্ষে, একটি হীরকখণ্ডের বিনিময়মূল্য যথেষ্ট, কিন্তু প্রয়োজনমূল্য স্বল্প।

অর্থের প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যের বিনিময়মূল্য অর্থের অঙ্কে প্রকাশিত হয়। যেমন, একটি ঝরণা কলমের বিনিময়মূল্য ৫৲ টাকা; ইহাই ঝরণা কলমের দাম। অতএব, দাম (price) হইল অর্থের অঙ্কে প্রকাশিত দ্রব্যের মূল্য।

প্রশ্নাবলী

1. Define Wealth. Distinguish between 'wealth' and a 'free' good. How is wealth related to welfare?
(অর্থ বা সম্পদ কাহাকে বলে? অর্থ ও মূল্যহীন দ্রব্যের পার্থক্য কি? সম্পদ ও জনকল্যাণের সম্পর্ক কি?) (পৃঃ ৭ ও ৮ দেখ)
2. Distinguish between (a) Money Income and (b) Real Income.
(মুদ্রাগত আয় ও প্রকৃত আয় ইহাদের পার্থক্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৮ দেখ)

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয় ও তাহার বিভিন্ন বিভাগ
(National Income and its Classifications)

জাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয়কে একত্রিত করিলে সেই সমষ্টিগত আয়কে বলা হয় জাতীয় আয় (National income)। কোনো

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (ধর, এক বৎসর) এই সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ সম্পদ অর্জন করিতে পারিয়াছে জাতীয় আয় তাহারই পরিমাপ করে। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে পরিমাণ সম্পদ দেশে উৎপন্ন হইয়াছে তাহাকে দেশজ উৎপাদন (National product) বলা হইয়া থাকে। দেশজ উৎপাদন এবং জাতীয় আয়ের মধ্যে পার্থক্য হইতে পারে শুধু একটি কারণে। যদি দেশজ উৎপাদনের কিছু অংশ ভিন্নদেশীয় লোকের দখলে যায়, তবে জাতীয় আয় দেশজ উৎপাদনের চেয়ে কম হইবে। আবার অন্য দেশের উৎপাদনের কিছু অংশ যুক্ত হইয়া জাতীয় আয় দেশজ উৎপাদন অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। যদি দেশজ উৎপাদনে বিদেশীয় লোকের কোনো অংশ না থাকে, তবে জাতীয় আয় এবং দেশজ উৎপাদনে কোনো পার্থক্য থাকিবে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে,

জাতীয় আয়=দেশজ উৎপাদন+বিদেশীয় উৎপাদনে জাতীয় অংশ—দেশজ উৎপাদনে ভিন্নদেশীয় লোকের অংশ। সুতরাং জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দেশ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তাহাদের নিজ নিজ আয়ের পরিসংখ্যান পৃথকভাবে সংগ্রহ করিয়া তাহা যোগ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানা যাইতে পারে। এই উপায়কে বলা হয় 'আয় সংগ্রহের রীতি' (Income approach)। দ্বিতীয়তঃ, দেশের সমস্ত উৎপন্ন সম্পদের মূল্য সংগ্রহ করিয়া তাহার সমষ্টিগত ফল হইতে বিদেশীয় লোকের অংশ বাদ দিয়া এবং বিদেশজাত সম্পদের উপর দেশীয় লোকের দাবীর পরিমাণ যোগ দিয়া জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যাইতে পারে। এই উপায়কে বলা হয় 'উৎপাদন সংগ্রহের রীতি' (Product approach)। আয় সংগ্রহের রীতি অবলম্বন করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে হইলে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের আয় সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। ইহা শুধু আয়াসসাধ্য নহে, একরূপ অসম্ভব বলা যাইতে পারে। সেইজন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিতে হইলে উৎপাদন সংগ্রহের রীতির উপরই নির্ভর করিতে হয়।

এই রীতি অনুসরণ করিয়া জাতীয় আয়ের পরিমাপ করিতে গেলে কয়েকটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমতঃ, দেখিতে হইবে যেন দেশজ উৎপাদনের তালিকা হইতে কোনো মূল্যবান দ্রব্যই বাদ না পড়ে।

তালিকাটি যেন সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হয়। কেবল বস্তুগত সম্পদ নয় সমস্ত অবস্তুগত মূল্যবান দ্রব্যও এই তালিকায় স্থান পাইবে। তবে যে সকল সেবামূলক কাজ প্রয়োজনীয় হইলেও অর্থ বা সম্পদ বলিয়া পরিগণিত হয় না (যেমন, গৃহকর্ত্রীর ঘরকন্নার কাজ, কিংবা সৌজন্য বা বন্ধুত্ব দেখাইবার জন্য সেবা) তাহারা এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে না। বর্তমান সমাজে সমস্ত মূল্যবান দ্রব্য বা সম্পদের সম্পূর্ণ তালিকা তৈয়ারী করিতে গেলে তাহা যে যথেষ্ট দীর্ঘ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই ধরণের তালিকায় ভুলচুক হইবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট। তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্যও নির্ধারণ করা খুব সহজ নয়। একই দ্রব্য দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন্ মূল্যটি সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য তাহা স্থির করা কঠিন। কোনো কোনো মূল্যবান দ্রব্য আবার বিক্রয়ের জন্য উৎপন্ন হয় না, যেমন, দেশরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম। ইহাদের উৎপাদন করিতে যে ব্যয় পড়ে তাহাকেই ইহাদের মূল্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বস্তুর মূল্য নির্ধারণ করিবার সময় ঐ বস্তুর উৎপাদনে অন্যান্য যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাদের মূল্য অবশ্যই বাদ দিতে হইবে। মনে করা যাক একটি আলমারীর মূল্য স্থির করিতে হইবে। আলমারীটি তৈয়ারী করিতে কাঠ, কাচ, পেরেক ইত্যাদি ব্যবহার করা হইয়াছে। সুতরাং আলমারীটির সমগ্র মূল্য (Gross value) হইতে কাঠ, কাচ ইত্যাদির মূল্য বাদ দিয়া যাহা থাকিবে তাহাই উহার স্বকীয় মূল্য (Net value)। এইভাবে প্রতিটি বস্তুর স্বকীয় মূল্য বাহির করিয়া লইতে হইবে। যদি এরূপ করা না হয় তবে আলমারীর সমগ্র মূল্য কাঠ, কাচ ইত্যাদির মূল্যের সহিত যুক্ত হইয়া তাহাদের সমষ্টিগত মূল্যকে ফাঁপাইয়া তুলিবে এবং একই জিনিসের মূল্য বার বার হিসাবের মধ্যে ধরা হইতে থাকিবে।

তৃতীয়তঃ, একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে যে পরিমাণ সম্পদ উৎপন্ন হইল তাহার সমগ্র মূল্য (Gross value) হইতে ঐ সম্পদ উৎপাদন করিতে যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জামের যে ক্ষয়ক্ষতি (Depreciation) হইল তাহা অবশ্যই বাদ দিয়া লইতে হইবে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিবার পর উৎপাদনের যে অংশ উদ্বৃত্ত থাকে তাহাকেই প্রকৃত আয় (Net income) বলা চলে। সমগ্র দেশজ উৎপাদন (Gross national product) হইতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই প্রকৃত জাতীয় উৎপাদন (Net

national product) বা দেশজ উৎপাদন। ইহার সহিত জাতীয় আয়ের সম্পর্ক পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

বর্তমান জগতে সকল বস্তুর মূল্যই মুদ্রার হিসাবে ধরা হয়। সুতরাং আয়ের পরিমাপও মুদ্রার হিসাবেই নিরূপণ করা হইয়া থাকে। যেমন, বলা হইয়া থাকে যে ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল ১০০০০ কোটি টাকা। ইহার অর্থ এই যে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভারতে যে পরিমাণ সম্পদ উৎপন্ন হইয়াছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাদ দিয়া এবং বিদেশের সহিত দেনা পাওনার হিসাব যোগবিয়োগ করিয়া তাহার মূল্য দাঁড়ায় দশ হাজার কোটি টাকা। টাকার হিসাবে প্রকাশ করা হইলেও প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয় দ্বারা কতকগুলি মূল্যবান দ্রব্যের সমষ্টিকেই নির্দেশ করা হয়।

টাকার হিসাবে জিনিসপত্রের মূল্য সর্বদা একরূপ থাকে না, তাহা কখনও বা বাড়ে, কখনও বা কমে। সেইজন্য টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি বা হ্রাস পাইলে উৎপাদনের পরিমাণও বাড়িয়াছে কিংবা কমিয়াছে এরূপ বলা চলে না। টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ (Money national income) যে হারে বাড়ে বা কমে, যদি জিনিসপত্রের দরও সেই হারে বাড়ে কিংবা কমিয়া যায়, তবে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের পরিমাণ (Real national income) অপরিবর্তিত থাকে। জাতীয় আয়ের প্রকৃতপক্ষে কোনো পরিবর্তন হইতেছে কিনা তাহা জানিতে হইলে জিনিসপত্রের দর সেই সঙ্গে কিভাবে পরিবর্তিত হইতেছে তাহা জানা আবশ্যক। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক, ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতের জাতীয় আয় বাড়িয়া ১২৫০০ কোটি টাকায় দাঁড়াইল। ইহা ১৯৫৭-৫৮ সালের জাতীয় আয়ের ১¼ গুণ। যদি উক্ত সময়ের মধ্যে জিনিসপত্রের বাজার-দরও ঠিক ১¼ গুণ বাড়িয়া থাকে, তবে প্রকৃতপক্ষে জাতীয় আয়ের কোনো বৃদ্ধি হয় নাই, বাজারদর বৃদ্ধি পাওয়াতে টাকার হিসাবে জাতীয় আয়ের পরিমাণ ফাঁপিয়া উঠিয়াছে মাত্র।

জাতীয় আয়কে দেশের জনসমষ্টির সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে গড় (Average) বা মাথা পিছু (per capita) জাতীয় আয় বাহির করা যায়। এই গড় জাতীয় আয়ের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা দেশের আর্থিক অবস্থার খানিকটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলে দেশের সমৃদ্ধি সম্প্রসারণের পক্ষে এরূপ অনুমান করা চলে। অন্যদিকে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের হ্রাসকে আর্থিক অবনতির লক্ষণ হিসাবে ধরিয়া নেওয়া যায়।

জাতীয় আয়ের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ ঃ

জাতির অন্তর্গত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের আয়ই জাতীয় আয়। আবার জাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টার দ্বারা উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণও জাতীয় আয়ের দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে উৎপন্ন সম্পদ এবং উপার্জিত আয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ থাকিতে পারে না। উৎপাদনই যেমন আয়ের একমাত্র উৎস, সেইরূপ সমস্ত উৎপন্ন সম্পদই কোনো-না-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয় হিসাবে গণ্য হয়।

জাতীয় আয়কে সাধারণতঃ কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়।

(১) মজুরী—জাতীয় আয়ের যে অংশ শ্রমের বিনিময়-মূল্য হিসাবে অর্জন করা হয় তাহাকেই বলা হয় মজুরী। এই শ্রম শারীরিক কিংবা মানসিক উভয় প্রকারেরই হইতে পারে। অধিকাংশ লোককেই অর্থ উপার্জন করিতে হয় কোনো প্রতিষ্ঠানের কাজে তাহাদের শ্রম নিয়োগ করিয়া। কল, কারখানা, সরকারী দপ্তর, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মজুরীর বিনিময়ে এই শ্রম কিনিয়া লয়।

(২) সুদ—কোনো কোনো লোকের অর্থ উপার্জনের উপায় ঋণদান এবং সুদ গ্রহণ। অবশ্য যাহারা বিত্তবান কেবল তাহারাই এই উপায়ে অর্থ উপার্জন করিতে পারে। বহু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান নিজেদের ব্যবসায় চালাইবার জন্য নিয়মিতভাবে ঋণগ্রহণ করে এবং ঋণদাতাকে নির্দিষ্টহারে সুদ দিয়া থাকে। ব্যবসায়ের আয় হইতেই এই সুদ ঋণদাতাদের হাতে আসে।

(৩) খাজনা, ভাড়া ইত্যাদি—যাঁহারা বাড়ী, জমি ইত্যাদির মালিক, তাঁহারা এই সকল সম্পত্তি ভাড়া দিয়া অর্থ উপার্জন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্পত্তি ব্যবহার করিয়া অন্য কেহ যে অর্থ উপার্জন করে তাহারই কিছু অংশ খাজনা বা ভাড়া হিসাবে ইহাদের আয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

(৪) মুনাফা—ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা দ্বারা যে আয় অর্জিত হয় তাহাকেই মুনাফা বলা হয়। ব্যবসায়ী যদি এককভাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তবে ব্যবসায়ের সমস্ত মুনাফা তিনি একাই লাভ করেন। যদি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানটি কয়েকজনের মিলিত প্রচেষ্টায় গড়িয়া উঠে তবে মুনাফা তাঁহাদের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়।

(৫) রাজস্ব—জাতীয় আয়ের যে অংশ সরকার কর বা রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করেন তাহা সরকারের আয় হিসাবে গণ্য হয়।

জাতীয় আয়ের নিয়ামকসমূহ (Determinants of National ncome) ঃ

জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় প্রধানত জাতির উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। যে জাতির উৎপাদনের ক্ষমতা যত বেশী তাহার জাতীয় আয়ও তত বেশী হইবে। উৎপাদনের ক্ষমতা কম হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণও কম হইবে।

জাতির উৎপাদন ক্ষমতা আবার কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ইহা নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্বাভাবিক সম্পদের পরিমাণের উপর। প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের অনুকূল হয় এবং প্রকৃতিদত্ত সম্পদের পরিমাণ যদি সন্তোষজনক হয় তবে উৎপাদনের পরিমাণ সহজেই বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ উৎপাদনের অনুকূল হইলে জাতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয়েরও বৃদ্ধি ঘটে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে দেশে উপযুক্তসংখ্যক কর্মী ও দক্ষ শ্রমিক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি শ্রমশক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও শ্রমিকেরা যদি অলস বা অপটু হয় তবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন।

প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক জ্ঞান (technical knowledge) থাকা আবশ্যক। লোহা কিংবা পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার কিভাবে করিতে হয় তাহা না জানা পর্যন্ত মানুষ এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যে সকল জিনিস এককালে অকেজো ছিল তাহাও এখন মানুষের ব্যবহারে লাগানো যাইতেছে। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার যতই পুষ্ট হইয়া উঠিবে, উৎপাদনের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যবহারিক জ্ঞানবৃদ্ধির ফল হিসাবে দেখা যায় উৎপাদনের কাজে নানা রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। এই ধরণের মূলধন (capital) আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত না হইলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইত না এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণও

নিতান্ত অল্প থাকিত। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্য মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির (capital formation) উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিক ও বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে দেশে উপযুক্তসংখ্যক পরিকল্পক ও সংগঠক থাকাও বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত সংগঠকের অভাবে সম্পদ সৃষ্টির কাজে পদে পদে ব্যাঘাত জন্মে। দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎসাহী শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও সংগঠকের অভাবে উৎপাদনের কাজে ভাঁটা পড়িতে পারে। সেইজন্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ সংগঠক শ্রেণীর দক্ষতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি এবং নানা ধরণের মূলধনের সংযোগে এবং সংগঠকশ্রেণীর তত্ত্বাবধানে দেশে বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের কাজ প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এই উৎপাদনের কাজ সর্বদা পুরাদমে চলিবে কিনা তাহা আবার নির্ভর করে উৎপাদনের জন্য মোট চাহিদার (effective demand) উপর। যদি জিনিসপত্রের জন্য লোকের চাহিদা কোনো কারণে হ্রাস পায়, তবে সংগঠককে বাধ্য হইয়া উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে হয়। জাতীয় আয়ের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। দেশের সমস্ত শ্রমশক্তি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ যাহা হইত, চাহিদা হ্রাস পাইবার ফলে জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইতে পারে। তখন কিছু শ্রমিককে কর্মহীন জীবন যাপন করিতে হয়। তবে চাহিদা হ্রাসের এই ব্যাপারটি সাধারণতঃ সাময়িক এবং ইহার প্রতিবিধান করাও খুব কঠিন নয়। সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে জাতির শ্রমশক্তি, সংগঠননৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর।

উৎপাদনের উপাদানসমূহ (Factors of Production):

উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে যে-কোনো উৎপাদনের কাজে চারিটি মূল উপাদান থাকা আবশ্যক। এই চারিটি উপাদান হইতেছে—

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ; ইহাকে সংক্ষেপে বলা হইয়া থাকে ভূমি (Land),

(খ) শ্রমশক্তি (Labour),

জাতীয় আয়ের নিয়ামকসমূহ (Determinants of National ncome) ঃ

জাতীয় আয়ের পরিমাণ নির্ধারিত হয় প্রধানত জাতির উৎপাদন ক্ষমতার দ্বারা। যে জাতির উৎপাদনের ক্ষমতা যত বেশী তাহার জাতীয় আয়ও তত বেশী হইবে। উৎপাদনের ক্ষমতা কম হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণও কম হইবে।

জাতির উৎপাদন ক্ষমতা আবার কয়েকটি জিনিসের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, ইহা নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও স্বাভাবিক সম্পদের পরিমাণের উপর। প্রাকৃতিক পরিবেশ যদি প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের অনুকূল হয় এবং প্রকৃতিদত্ত সম্পদের পরিমাণ যদি সন্তোষজনক হয় তবে উৎপাদনের পরিমাণ সহজেই বৃদ্ধি পাইতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশ উৎপাদনের অনুকূল হইলে জাতির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় এবং জাতীয় আয়েরও বৃদ্ধি ঘটে।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করিতে হইলে দেশে উপযুক্তসংখ্যক কর্মী ও দক্ষ শ্রমিক থাকা প্রয়োজন। সুতরাং উৎপাদন ও জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি শ্রমশক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। দেশে প্রাকৃতিক সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকিলেও শ্রমিকেরা যদি অলস বা অপটু হয় তবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়া কঠিন।

প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তুলিতে হইলে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারিক জ্ঞান (technical knowledge) থাকা আবশ্যক। লোহা কিংবা পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার কিভাবে করিতে হয় তাহা না জানা পর্যন্ত মানুষ এই সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাইতে পারে নাই। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে যে সকল জিনিস এককালে অকেজো ছিল তাহাও এখন মানুষের ব্যবহারে লাগানো যাইতেছে। মানুষের জ্ঞানের ভাণ্ডার যতই পুষ্ট হইয়া উঠিবে, উৎপাদনের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ব্যবহারিক জ্ঞানবৃদ্ধির ফল হিসাবে দেখা যায় উৎপাদনের কাজে নানা রকমের যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের ব্যবহার ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিতেছে। এই ধরণের মূলধন (capital) আবিষ্কৃত এবং ব্যবহৃত না হইলে প্রাকৃতিক সম্পদের উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করা সম্ভব হইত না এবং জাতীয় আয়ের পরিমাণও

নিতান্ত অল্প থাকিত। জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির জন্য মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির (capital formation) উপর বিশেষভাবে নির্ভর করিতে হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিক ও বিভিন্ন ধরণের যন্ত্রপাতি নিয়োগ করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে দেশে উপযুক্তসংখ্যক পরিকল্পক ও সংগঠক থাকাও বিশেষ প্রয়োজন। উপযুক্ত সংগঠকের অভাবে সম্পদ সৃষ্টির কাজে পদে পদে ব্যাঘাত জন্মে। দেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং উৎসাহী শ্রমিক থাকা সত্ত্বেও সংগঠকের অভাবে উৎপাদনের কাজে ভাঁটা পড়িতে পারে। সেইজন্য জাতীয় আয়ের পরিমাণ সংগঠক শ্রেণীর দক্ষতার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

প্রাকৃতিক সম্পদ, শ্রমশক্তি এবং নানা ধরণের মূলধনের সংযোগে এবং সংগঠকশ্রেণীর তত্ত্বাবধানে দেশে বিভিন্ন বস্তুর উৎপাদনের কাজ প্রতিনিয়ত চলিতেছে। এই উৎপাদনের কাজ সর্বদা পুরাদমে চলিবে কিনা তাহা আবার নির্ভর করে উৎপাদনের জন্য মোট চাহিদার (effective demand) উপর। যদি জিনিসপত্রের জন্য লোকের চাহিদা কোনো কারণে হ্রাস পায়, তবে সংগঠককে বাধ্য হইয়া উৎপাদনের পরিমাণ কমাইতে হয়। জাতীয় আয়ের পরিমাণও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পায়। দেশের সমস্ত শ্রমশক্তি উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত হইলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ যাহা হইত, চাহিদা হ্রাস পাইবার ফলে জাতীয় আয় প্রকৃতপক্ষে তাহা অপেক্ষা কিছু কম হইতে পারে। তখন কিছু শ্রমিককে কর্মহীন জীবন যাপন করিতে হয়। তবে চাহিদা হ্রাসের এই ব্যাপারটি সাধারণতঃ সাময়িক এবং ইহার প্রতিবিধান করাও খুব কঠিন নয়। সেইজন্য বলা যাইতে পারে যে জাতীয় আয়ের পরিমাণ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে জাতির শ্রমশক্তি, সংগঠননৈপুণ্য, বৈজ্ঞানিক দক্ষতা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর।

উৎপাদনের উপাদানসমূহ (Factors of Production) ঃ

উপরের আলোচনা হইতে সহজেই বুঝা যাইবে যে যে-কোনো উৎপাদনের কাজে চারিটি মূল উপাদান থাকা আবশ্যক। এই চারিটি উপাদান হইতেছে—

(ক) প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সম্পদ ; ইহাকে সংক্ষেপে বলা হইয়া থাকে ভূমি (Land),

(খ) শ্রমশক্তি (Labour),

(গ) মূলধন (Capital) এবং

(ঘ) সংগঠন (Organisation)

যে কোনো প্রাকৃতিক শক্তি বা সম্পদ, যাহা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহাকেই ভূমি বলা হইয়া থাকে। জমির উর্বরাশক্তি, জলস্রোতের চালক শক্তি বা বিদ্যুৎ উৎপাদন শক্তি, কয়লার তাপ প্রদানের ক্ষমতা, অন্যান্য খনিজ দ্রব্য, এই জাতীয় সকল উপাদানকেই ভূমি বলা হইয়া থাকে। ভূমির বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে ইহা সম্পূর্ণ ই প্রকৃতিপ্রদত্ত। ইহা উৎপাদনের মূল উপাদান, কিন্তু ইহা নিজে কখনও উৎপাদিত হইতে পারে না। ভূমির পরিমাণ পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট, মানুষ চেষ্টা করিয়া ইহার পরিমাণ বাড়াইতে পারে না। অথচ প্রত্যেক উৎপাদনের কাজেই ভূমি কোনো-না-কোনো রূপে একান্ত আবশ্যক। মানুষ নিজে কোনো প্রয়োজনীয় দ্রব্যই সোজাসুজি সৃষ্টি করিয়া লইতে পারে না। প্রকৃতির নিকট হইতে লব্ধ বিভিন্ন উপাদানকে ব্যবহার করিয়া তাহাকে নিজের বিভিন্ন অভাবপূরণের ব্যবস্থা করিতে হয়।

শ্রমশক্তিও উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান। প্রত্যেক বস্তুর উৎপাদনেই মানুষকে কিছু-না-কিছু পরিশ্রম করিতে হয়। কোনো কোনো বস্তুর উৎপাদনে শারীরিক শ্রমই প্রধান, আবার কোনো কোনো বস্তু (যেমন, একটি মূল্যবান গ্রন্থ) উৎপাদন করিতে হইলে প্রচুর মানসিক শ্রম প্রয়োজন। উৎপাদনের কাজে সাফল্য লাভ করিতে শারীরিক পরিশ্রমের সহিত বুদ্ধি সংযোগের প্রয়োজন প্রায় সর্বদাই দেখা যায়। নির্বোধ শ্রমিক যতই কঠোর পরিশ্রম করুক, তাহার কাজ কখনই দক্ষ শ্রমিকের কাজের সমান হইতে পারে না।

প্রাকৃতিক শক্তি এবং শ্রমশক্তি, এই দুইটি উৎপাদনের প্রাথমিক (Primary) উপাদান। ইহাদের সাহায্যে কিছু কিছু সহজ উৎপাদনের কাজ সম্পন্ন হইতে পারে। কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য সাধারণতঃ উৎপাদনের কাজটিকে আরও খানিকটা জটিল করিয়া তুলিতে হয়। তখন প্রয়োজন হয় মূলধন এবং সংগঠনের। ইহাদিগকে উৎপাদনের অতিরিক্ত (Secondary) উপাদান বলা যাইতে পারে।

যে বস্তু নিজে উৎপাদিত হইয়া অন্য কোনো বস্তুর উৎপাদনের উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাই মূলধন। বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপন্ন কাঁচা মাল (raw materials), কলকব্জা, জ্বালানি বা ইন্ধন, রেলপথ, জাহাজ, রেলগাড়ী ইত্যাদি সকল বস্তুই মূলধনের পর্যায়ে পড়ে। মূলধনের সহায়তা না পাইলে কেবল

শ্রমশক্তির সাহায্যে যে ধরনের উৎপাদনের কাজ সম্ভব হইত, তাহাতে উৎপন্ন বস্তুর পরিমাণ হইত খুবই সামান্য। যেমন, চাষের কাজে হাত দিয়া মাটি খুঁড়িতে হইলে খুব কম শস্যই উৎপন্ন হইত। লাঙলের ব্যবহার শিখিয়াই মানুষ আরও বেশী ফসল উৎপাদন করিতে শিখিল। পরে আরও ভারী যন্ত্রপাতির (যেমন, ট্র্যাক্টর) আবিষ্কার হওয়াতে ফসলের পরিমাণ আরও বাড়িয়া গেল। এইরূপে প্রায় সকল বস্তুর উৎপাদনেই মূলধনের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং উৎপাদনের পরিমাণও তাহার ফলে বাড়িয়া গিয়াছে।

মূলধনকে সাধারণতঃ দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্থির (Fixed) এবং চলমান (Circulating)। যে মূলধন একাধিকবার উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হইয়াও মোটামুটি অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে তাহাকে বলা হয় স্থির মূলধন। কলকব্জা, রেলপথ ইত্যাদি স্থির মূলধন। উৎপাদনের কাজে একবার ব্যবহৃত হইলেই যে মূলধনের রূপান্তর ঘটে তাহাকে বলা হয় চলমান মূলধন। কাঁচামাল, জ্বালানি ইত্যাদি চলমান মূলধনের দৃষ্টান্ত।

ভূমি, শ্রমশক্তি ও বিভিন্ন প্রকারের মূলধনকে একত্রিত করিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা পরিচালনা করাকে বলা হয় সংগঠন। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপর সংগঠনের ভার থাকে, তাহার দক্ষতা ও দূরদর্শিতার উপর উৎপাদনের সাফল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে। সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য জিনিসপত্রের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদনের ব্যবস্থা করা এবং যাহাতে প্রতিটি জিনিস সর্বাপেক্ষা কম খরচে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা। উৎপাদনের জটিলতা যতই বৃদ্ধি পায়, উৎপাদনের উপাদান হিসাবে সংগঠনের গুরুত্বও ততই বাড়িয়া যায়।

প্রশ্নাবলী

1. What is National Income? How can we measure it?

(জাতীয় আয় কাহাকে বলে? ইহা পরিমাপ করিবার উপায় কি?) (পৃঃ ৯-১২ দেখ।)

2. What is the relation between Gross National Product, Net National Product and National Income?

(সমগ্র দেশজ উৎপাদন, প্রকৃত দেশজ উৎপাদন এবং জাতীয় আয়, ইহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক আলোচনা কর।) (১১ ও ১২ দেখ।)

3. What are the different divisions of the National Income? Give a brief account of each.

(জাতীয় আয়ের ভিন্ন ভিন্ন অংশের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।) (পৃঃ ১৩ দেখ।)

4. What are the factors governing the level of national income in a country?

(জাতীয় আয়ের নিয়ামক মূল কারণসমূহ সম্বন্ধে যাহা জান লিখ) (পৃঃ ১৪ ও ১৫ দেখ।)

5. What are the factors of production? Give a brief account of each.

(উৎপাদনের উপাদান বলিতে কি বুঝায়? প্রত্যেকটি উপাদানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।) (পৃঃ ১৫-১৭ দেখ।)

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি (Land)

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, যে-কোনো প্রাকৃতিক শক্তি বা সম্পদ যাহা উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়, তাহাকেই ভূমি বলা হইয়া থাকে।

ভূমির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ

প্রথমতঃ, ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট। কয়েকটি প্রাকৃতিক কারণে (যেমন, বন্যার ফলে) ভূমির পরিমাণ কিছু পরিবর্তিত হয়। কিন্তু, মোটামুটি ভূমির পরিমাণের বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতিদত্ত বলিয়া ভূমির কোন উৎপাদন-ব্যয় নাই। কোন ভূমিখণ্ডের স্বাভাবিক উর্বরতা এবং জলবায়ু ও অবস্থানজনিত সুবিধার জন্য কোন ব্যয় বহন করিতে হয় না।

তৃতীয়তঃ, ভূমি সমজাতীয় (Homogeneous) নয়। একখণ্ড জমি অপর একটি খণ্ড হইতে উর্বরতা ও অবস্থানের দিক হইতে একরূপ হয় না। এইজন্য উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট বিভিন্ন প্রকারের ভূমিখণ্ড দেখা যায়। ফলে, এক একটি জমির ব্যবহার লাভজনক হয়, আবার কোন কোন জমির ব্যবহার তেমন লাভজনক হয় না।

***ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র (Law of Diminishing Marginal Returns) :**

ভূমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ ও সুনির্দিষ্ট হওয়ার দরুণ একই ভূমিখণ্ডে উত্তরোত্তর মূলধন ও শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলে, বাস্তব অভিজ্ঞতায় কৃষি উৎপাদনে একটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে এমন এক অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন উৎপাদন শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির হারের সমানুপাতিক না হইয়া ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র বলা হয়।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটি উৎপাদনের উপাদানের সংজ্ঞা হইতে প্রমাণ হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে প্রকৃতিগত ও গুণগত পার্থক্য আছে। যেমন, ভূমি ও শ্রম এক জিনিস নয়। অতএব, শ্রম বা মূলধন ভূমির পূর্ণ পরিবর্ত (Perfect substitute) হইতে পারে না। ভূমির পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া অন্যান্য উপাদানগুলিকে বৃদ্ধি করিলে উপাদানগুলির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। সুষ্ঠু উৎপাদন কার্য নির্ভর করে উপাদানগুলির মধ্যে আনুপাতিক সম্পর্কের উপর। অতএব, কোন একটি উপাদানকে স্থির ও নির্দিষ্ট রাখিয়া অন্য উপাদানগুলির পরিমাণের পরিবর্তন সাধন করিলে উৎপাদন কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হয়; ফলে, উৎপাদনের হার হ্রাস পায়। সেইজন্য কৃষির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটি কার্যকরী হয়।

উপরের আলোচনাটি নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে পরিবেশন করা যায় :

ভূমি	শ্রম ও মূলধন (লাঙল)	মোট উৎপাদন	উৎপাদন বৃদ্ধির হার বা প্রান্তিক উৎপাদন
১	১+১	২৫ মণ	—
১	২+২	৫৫ মণ	৩০ মণ
১	৩+৩	৮০ মণ	২৫ মণ
১	৪+৪	১০০ মণ	২০ মণ

এই তালিকায় দেখা যায় যে, কোন কৃষক একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে একটি শ্রমিক ও একটি লাঙলের সাহায্যে কৃষিকার্য চালাইলে উৎপাদনের পরিমাণ হয় ২৫ মণ ধান। ধরা যাউক, সে আর একটি শ্রমিক ও একটি লাঙল নিয়োগ করিল। ইহাতে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৫৫ মণ ; অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ মণ হইল। অতঃপর সে শ্রমিক ও লাঙলের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দিল। এখন তাহার উৎপাদন ৮০ মণ। সুতরাং, প্রান্তিক উৎপাদন ২৫ মণ। পুনর্বার, শ্রমিক ও লাঙল একটি করিয়া বাড়াইয়া সে ১০০ মণ ধান পাইল। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ২০ মণ। সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রমিক ও লাঙলের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে এমন একটি অবস্থায় পৌছান যায় যখন অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্য (যেমন, শ্রমিকের মজুরী) যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অতএব, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের সূত্রও (Law of Increasing costs) বলা যায়।

ব্যতিক্রম (Limitations) :

(১) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে (ট্র্যাক্টর ইত্যাদির দ্বারা) চাষ করিলে সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র কার্যকরী হইবে না। অর্থাৎ, উন্নত প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত এই নিয়ম কার্যকরী হইবেই ; কারণ ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম।

(২) প্রথম অবস্থায় একখণ্ড নির্দিষ্ট জমিতে উৎপাদনের উপাদান বৃদ্ধি করিলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ, উপাদানসমূহের পরিমাণ স্বল্প থাকায় প্রথমদিকে জমির উর্বরা শক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় নাই।

খনি ও মৎস্য চাষ এবং শিল্পে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন সূত্রের কার্যকারিতা (Law of Diminishing Marginal Returns as applicable to Mines, Fisheries and Manufacturing Industries) :

খনি ও মৎস্য চাষ :

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র খনি ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য। কয়লা খনি হইতে অধিকতর কয়লা উত্তোলন করিতে হইলে খনির গভীরে কাজ করিতে হয়। ফলে, উত্তরোত্তর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিক মৎস্য ধরিবার জন্য নদী বা সমুদ্রে বেশী লোক নিয়োগ করিতে হয়, বা দূরে পাড়ি দিতে হয় ; ফলে ব্যয়ের তুলনায় মৎস্যের পরিমাণ কম হয়।

শিল্পকর্ম ঃ

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটি একটি সার্বজনীন নিয়ম। শিল্পকর্মেও ইহা কার্যকরী হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমস্ত উপাদানসমূহের সমানুপাতিক বৃদ্ধি সম্ভব হইলে এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। কিন্তু, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, শিল্পকর্মে ক্রমশঃ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে করিতে কোন এক বিশেষ উৎপাদনের উপাদানের অভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় উল্লিখিত উপাদানটিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অন্যান্য উপাদানগুলিকে বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুষ্ঠু উৎপাদনকার্য ব্যাহত হওয়ায় প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদনের হার হ্রাস পাইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the main characteristics of land.
(ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত কর।) (পৃঃ ১৮ দেখ।)

2. State and illustrate the law of diminishing marginal returns. Is it applicable to mines, fisheries and manufacturing industries ?
(ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটি উদাহরণসহ বিবৃত কর। খনি, মৎস্যচাষ ও শিল্পে এই সূত্রটি প্রযোজ্য কি ?) (পৃঃ ১৯, ২০, ২১ দেখ।)

এই তালিকায় দেখা যায় যে, কোন কৃষক একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে একটি শ্রমিক ও একটি লাঙলের সাহায্যে কৃষিকার্য চালাইলে উৎপাদনের পরিমাণ হয় ২৫ মণ ধান। ধরা যাউক, সে আর একটি শ্রমিক ও একটি লাঙল নিয়োগ করিল। ইহাতে তাহার উৎপাদনের পরিমাণ হইল ৫৫ মণ; অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ৩০ মণ হইল। অতঃপর সে শ্রমিক ও লাঙলের সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দিল। এখন তাহার উৎপাদন ৮০ মণ। সুতরাং, প্রান্তিক উৎপাদন ২৫ মণ। পুনর্বার, শ্রমিক ও লাঙল একটি করিয়া বাড়াইয়া সে ১০০ মণ ধান পাইল। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ২০ মণ। সুতরাং দেখা যায় যে, শ্রমিক ও লাঙলের সংখ্যা বাড়াইতে বাড়াইতে এমন একটি অবস্থায় পৌছান যায় যখন অতিরিক্ত বা প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশঃ হ্রাস পায়।

উৎপাদনের উপাদানসমূহের মূল্য (যেমন, শ্রমিকের মজুরী) যদি অপরিবর্তিত থাকে, তবে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। অতএব, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটিকে ক্রমবর্ধমান উৎপাদন ব্যয়ের সূত্রও (Law of Increasing costs) বলা যায়।

ব্যতিক্রম (Limitations):

(১) বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে (ট্র্যাক্টর ইত্যাদির দ্বারা) চাষ করিলে সাময়িকভাবে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র কার্যকরী হইবে না। অর্থাৎ, উন্নত প্রক্রিয়ায় প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য, শেষ পর্যন্ত এই নিয়ম কার্যকরী হইবেই; কারণ ইহা একটি প্রাকৃতিক নিয়ম।

(২) প্রথম অবস্থায় একখণ্ড নির্দিষ্ট জমিতে উৎপাদনের উপাদান বৃদ্ধি করিলে প্রান্তিক উৎপাদনের হার না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে পারে। কারণ, উপাদানসমূহের পরিমাণ স্বল্প থাকায় প্রথমদিকে জমির উর্বরা শক্তির পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় নাই।

খনি ও মৎস্য চাষ এবং শিল্পে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন সূত্রের কার্যকারিতা (Law of Diminishing Marginal Returns as applicable to Mines, Fisheries and Manufacturing Industries):

খনি ও মৎস্য চাষ:

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্র খনি ও মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও

প্রযোজ্য। কয়লা খনি হইতে অধিকতর কয়লা উত্তোলন করিতে হইলে খনির গভীরে কাজ করিতে হয়। ফলে, উত্তরোত্তর উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। মৎস্য চাষের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, অধিক মৎস্য ধরিবার জন্য নদী বা সমুদ্রে বেশী লোক নিয়োগ করিতে হয়, বা দূরে পাড়ি দিতে হয় ; ফলে ব্যয়ের তুলনায় মৎস্যের পরিমাণ কম হয়।

শিল্পকর্ম ঃ

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটি একটি সার্বজনীন নিয়ম। শিল্পকর্মেও ইহা কার্যকরী হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমস্ত উপাদানসমূহের সমানুপাতিক বৃদ্ধি সম্ভব হইলে এই নিয়ম কার্যকরী হইবে না। কিন্তু, সাধারণতঃ দেখা যায় যে, শিল্পকর্মে ক্রমশঃ উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে করিতে কোন এক বিশেষ উৎপাদনের উপাদানের অভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় উল্লিখিত উপাদানটিকে অপরিবর্তিত রাখিয়া যদি অন্যান্য উপাদানগুলিকে বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন কার্যে বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। সুষ্ঠু উৎপাদনকার্য ব্যাহত হওয়ায় প্রান্তিক উৎপাদন বা অতিরিক্ত উৎপাদনের হার হ্রাস পাইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the main characteristics of land.

(ভূমির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত কর।) (পৃঃ ১৮ দেখ।)

2. State and illustrate the law of diminishing marginal returns. Is it applicable to mines, fisheries and manufacturing industries ?

(ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদনের সূত্রটি উদাহরণসহ বিবৃত কর। খনি, মৎস্যচাষ ও শিল্পে এই সূত্রটি প্রযোজ্য কি ?) (পৃঃ ১৯, ২০, ২১ দেখ।)

পঞ্চম অধ্যায়

জনসংখ্যা (Population)

উৎপাদনের পরিমাণ প্রধানতঃ নির্ভর করে শ্রমের পরিমাণ ও শ্রমের দক্ষতার উপর। শ্রমের পরিমাণ মূলতঃ জনসংখ্যার উপর নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রথম অবস্থায়, অবশ্য স্বল্পবয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা অধিক থাকে বলিয়া, কর্মোপযোগী শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় না। কিছুকাল পরেই বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের শ্রমের পরিমাণকে বর্ধিত করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরও একটি অর্থনৈতিক গুরুত্ব আছে। উৎপাদন দ্রব্যের ভোগব্যবহারকারীও দেশের জনসংখ্যা। সুতরাং, দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে; ফলে, উৎপন্ন দ্রব্যের সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়া প্রয়োজন। উৎপাদন দ্রব্যের সরবরাহ না বাড়িলে জনসাধারণের উপভোগের পরিমাণ হ্রাস পাইবে এবং তাহাদের জীবনধারণের মানের অবনতি ঘটিবে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা প্রত্যেক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতেই পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণের উপর জাতীয় আয় নির্ভরশীল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হইবে।

জনসংখ্যা সম্বন্ধীয় মতবাদ (Theories of Population) :

জনসংখ্যার আলোচনা আমরা বিভিন্ন মতবাদে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুবিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ ম্যাল্‌থাস্ (Malthus) জনসমস্যার বিস্তারিত আলোচনা করেন। তাঁহার মতবাদের মূল বক্তব্য বিষয় হইল যে, জনসংখ্যা জ্যামিতিক প্রগতিতে (Geometrical Progression) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণ পাটীগণিতিক প্রগতিতে (Arithmetical Progression) বৃদ্ধি পায়। যেমন, কোন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১, ২, ৪, ৮, ১৬ প্রভৃতি; কিন্তু, সেই দেশে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণের হার

ম্যাল্‌থাসের মতে, ১, ২, ৩, ৪, ৫ প্রভৃতি। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি এরূপ দ্রুত ঘটিতে থাকে যে, খাদ্যের উৎপাদন তাহার সহিত সংগতি রাখিয়া বৃদ্ধি পায় না। ইহার ফলে, জনসংখ্যার মাথা পিছু খাদ্য দ্রব্যের উপভোগ কমিতে থাকিবে। এই অবস্থার অপরিহার্য পরিণতি খাদ্যাভাব, মহামারী, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ। ম্যাল্‌থাস্ বলেন যে, এই দুর্যোগসমূহ জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রকৃতিসৃষ্ট অমোঘ প্রতিষেধক (Positive checks)। প্রকৃতির এই অভিশাপ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য প্রয়োজন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির স্বেচ্ছা-নিয়ন্ত্রণ (Preventive checks)। বিলম্বে বিবাহ, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার উপায়।

সমালোচনা ঃ

ম্যাল্‌থাসের তত্ত্বটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। ব্যবহারিক জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সহিত খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হারের অসামঞ্জস্য ঘটিলে অর্থনৈতিক জীবনে সত্যই বিপর্যয় উপস্থিত হয়। কিন্তু, তবুও এই তত্ত্বের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে।

প্রথমতঃ, আধুনিককালে বিজ্ঞানের সহায়তায় কৃষিপদ্ধতিতে যে যুগান্তকারী উন্নয়ন সম্ভব হইয়াছে, তাহা ম্যাল্‌থাসের কল্পনাতীত ছিল। কৃষি প্রণালীর এই অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে, জনসংখ্যাবৃদ্ধির সহিত সংগতি রাখিয়া খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত সংগতি রাখিয়া খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পাইলে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব ঘটে,—ম্যাল্‌থাসের এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাটিকে শুধুমাত্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের পটভূমিকায় বিচার করিলে চলিবে না ; দেশের সমগ্র উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা বিচার্য। ইংল্যাণ্ডে যন্ত্রপাতির বিনিময়ে বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়। খাদ্যোৎপাদনের অপ্রাচুর্য সত্ত্বেও ম্যালথাসের তত্ত্ব এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তৃতীয়তঃ, নিছক জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ নয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি দেশের শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, এবং তাহার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে, জাতীয় আয় বৃদ্ধিও ঘটিয়া থাকে। জাতীয় আয়ের সুসম বণ্টন হইলে ম্যাল্‌থাস্ বর্ণিত দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী নয়।

চতুর্থতঃ, জনসংখ্যা যে জ্যামিতিক প্রগতিতে বৃদ্ধি পায়, ম্যাল্‌থাসের এই ধারণা আধুনিক শিক্ষিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রযোজ্য নয়। কল্যাণ রাষ্ট্রে সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে জনচেতনার উন্মেষ হইয়াছে। সাংস্কৃতিক চেতনার ফলে আধুনিক সমাজে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ ও বিলম্বে বিবাহ ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে, বর্তমানে জনসংখ্যার প্রবণতা বৃদ্ধির দিকে না হইয়া হ্রাসের দিকে হইয়াছে।

অভিপ্রেত জনসংখ্যা (The Optimum population) :

ম্যাল্‌থাসের মতে, জনসংখ্যা ও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের মধ্যে প্রকৃত সম্বন্ধ নির্ণয়ের সমস্যাই জনসংখ্যার সমস্যা। আধুনিক অর্থনীতিবিদরা এই মতে বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা মনে করেন যে, কোন দেশের জনসংখ্যার সমস্যা সেই দেশের মোট সম্পদের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিতে হইবে। প্রত্যেক দেশের অভিপ্রেত জনসংখ্যা বলিতে সেই জনসংখ্যা বুঝায় যাহাতে কোন বিশেষ সময় মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। প্রকৃত জনসংখ্যা যদি অভিপ্রেত সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে দেশে জনাধিক্য (over-population) উপস্থিত হয়। জনসংখ্যা অভিপ্রেত সংখ্যা অপেক্ষা কম হইলে জনাভাব (under-population) দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কোন দেশে জনসংখ্যা যদি ৪০,০০০ হয়, তাহা হইলে সেই দেশের প্রকৃতিদত্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় ; যদি জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৪৫,০০০ হয়, তাহা হইলে সম্পদের অনুরূপ সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না ; ফলে, মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। অতএব, সেই দেশে জনাধিক্য দেখা যাইবে। অপরপক্ষে, জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়া ৩০,০০০ হইলে আলোচ্য দেশটিতে সম্পদের যথাযোগ্য ব্যবহার সম্ভব হয় না ; তখন সেদেশে জনাভাব ঘটিয়াছে বলা যায়।

শ্রমের দক্ষতা (Efficiency of labour) :

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন দেশে উৎপাদনহার নির্ভর করে সেদেশের জনসংখ্যা ও শ্রমদক্ষতার উপর। শ্রমিকের কর্মদক্ষতা তাহার দৈহিক ও মানসিক উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। উপরন্তু, যে সমস্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিক কাজ করে, উহাদের উৎকর্ষের উপর এবং শিল্পের ব্যবস্থাপনার উপরও শ্রমিকের দক্ষতা নির্ভরশীল।

প্রথমতঃ, জাতিগত বৈশিষ্ট্যের (Racial characteristics) উপর শ্রমিকের কর্মকুশলতা নির্ভর করে। কোন কোন জাতীয় লোক অন্য জাতীয় লোক অপেক্ষা অধিকতর কর্মকুশল।

দ্বিতীয়তঃ, জলবায়ুর দ্বারাও শ্রমিকের কর্মদক্ষতা প্রভাবিত হয়। শীতপ্রধান ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের অধিকতর পরিশ্রমী হইতে দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, শ্রমিকের কর্মনৈপুণ্য তাহার জীবনধারণের মানের উপরও নির্ভরশীল। পুষ্টিকর খাদ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে। স্বাস্থ্যকর পরিবেশও শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক।

চতুর্থতঃ, সাধারণ কারিগরী শিক্ষা শ্রমদক্ষতার অন্যতম উপাদান। আধুনিক শিল্পব্যবস্থায় যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য এই শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। ইউরোপীয় দেশগুলিতে সাধারণ কারিগরী শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে শ্রমদক্ষতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, দেশের অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর শ্রমদক্ষতা নির্ভরশীল। শ্রমিকের কর্মস্পৃহা তাহার দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। ইহা নির্ভর করে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির উপর। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শ্রমিকের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সহায়ক হইলে, শ্রমিকের কাজ করিবার ইচ্ছাও বাড়ে। পদোন্নতির সম্ভাবনা, বিশ্রামের সুযোগ, মানসিক ও বৈষয়িক নিশ্চিন্ততা, উপযুক্ত বেতন প্রভৃতি শ্রমদক্ষতার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

ষষ্ঠতঃ, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনাও (Entrepreneurial Skill) শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক। বুদ্ধিমান ও সংবেদনশীল পরিচালক শ্রমিকদের সর্বদাই কর্মে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিতে পারে। যোগ্য শ্রমিককে উপযুক্ত কর্মে নির্বাচন করিয়া পরিচালক শ্রমদক্ষতা বহুপরিমাণে বৃদ্ধি করিতে পারেন।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the Malthusian Theory of Population. Is this theory in conformity with facts?

(ম্যাল্‌থাস্‌-এর জনসংখ্যাবিষয়ক তত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর। বাস্তব অবস্থার সহিত এই তত্ত্বের সঙ্গতি কতটুকু?) (পৃঃ ২২, ২৩ ও ২৪ দেখ।)

2. What is the relation between the growth of population and the labour supply ?

(জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং ব্যবহারোপযোগী শ্রমশক্তির সরবরাহ, ইহাদের মধ্যে কি সম্পর্ক ?)

(পৃঃ ২২ দেখ ।)

3. Discuss the factors promoting the efficiency of labour.

(শ্রমদক্ষতা নির্ধারক উপাদানগুলির আলোচনা কর ।) (পৃঃ ২৪ ও ২৫ দেখ ।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

মূলধন (Capital)

আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধন অপরিহার্য উপাদান। মূলধনের প্রাপ্তি ও উৎকর্ষের উপরই উৎপাদন ব্যবস্থা প্রধানতঃ নির্ভরশীল। কিন্তু মূলধন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব দেখা যায়। প্রচলিত অর্থে, টাকাকড়িকেই মূলধন হিসাবে গণ্য করা হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিভাষায় ইহার অর্থ স্বতন্ত্র।

কোন দেশের সম্পদকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়ঃ (ক) ভোগ্যদ্রব্য (consumption goods) ও (খ) মূলধন ও উৎপাদক দ্রব্য (capital goods)। যে সমস্ত দ্রব্য (চাউল, গম, চিনি প্রভৃতি) মানুষের প্রত্যক্ষ উপভোগে ব্যবহৃত হয়, তাহাদিগকে ভোগ্যদ্রব্য বলা হয়। অপরপক্ষে, যে সমস্ত দ্রব্য (যন্ত্রপাতি, তুলা, লৌহ ইত্যাদি) আরও সম্পদ সৃষ্টির জন্য উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাহাদিগকে মূলধন বা উৎপাদক দ্রব্য বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে, মূলধন হইল উৎপাদনের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য।

মূলধন ও জমি (Capital and Land) :

মূলধন অতীত শ্রমের ফল। অতএব, জমি (Land) সম্পদ (Wealth) কিন্তু মূলতঃ মূলধন নয়। প্রধানতঃ জমি প্রকৃতিদত্ত সম্পদ। তবে, মানবীয় শ্রমের সাহায্যে জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধি করা সম্ভব। সেইজন্য বহুলাংশে জমি প্রকৃতিদত্ত হইলেও অংশতঃ ইহা মানবীয় শ্রমের ফল, অর্থাৎ মূলধনের গোষ্ঠীভুক্ত।

মূলধন ও সম্পদ (Capital and Wealth) :

সমস্ত মূলধনই সম্পদের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সমস্ত সম্পদ মূলধনের পর্যায়ভুক্ত নয়। যে সমস্ত দ্রব্যের যোগান সীমাবদ্ধ, যাহা দ্বারা মানুষের চাহিদা পরিতৃপ্ত হয় এবং যাহা হস্তান্তরযোগ্য এই সমুদয় বস্তুকেই সম্পদ বলা হয়। সম্পদের যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে মানুষের চাহিদা পরিতৃপ্ত করে তাহা ভোগ্যদ্রব্য এবং মূলধনের পর্যায়ভুক্ত নহে। সম্পদের সেই অংশই মূলধন যাহা আরও উৎপাদনের কার্যে ব্যবহৃত হয়। বস্তুর ব্যবহারের উপরেই মূলধন ও অন্যান্য সম্পদের পার্থক্য নির্ভর করে। যেমন, কোন বাড়ী বসবাসের জন্য ব্যবহৃত হইলে তাহা সম্পদ কিন্তু মূলধন নয়, কিন্তু সেই বাড়ী যদি কারখানা হিসাবে আরও উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা মূলধন বলিয়া গণ্য হইবে।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, যে সকল সামগ্রী প্রত্যক্ষ চাহিদা পরিতৃপ্ত না করিয়া অন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদনের পথে পূর্বগামী হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাই মূলধন। পূর্বের উদাহরণ অনুযায়ী বসতবাটীটি যখন কারখানা হিসাবে ব্যবহৃত হইল, তখন তাহা কোন সামগ্রী উৎপাদনের পূর্বগামী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে ; অতএব তাহা মূলধনের শ্রেণীভুক্ত।

স্থায়ী মূলধন ও চল্‌তি মূলধন (Fixed Capital and Circulating Capital) :

মূলধন প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর ; (ক) স্থায়ী মূলধন, ও (খ) চল্‌তি মূলধন।

স্থায়ী মূলধন : মূলধন হিসাবে যে সমস্ত বস্তুকে বারংবার উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায়, তাহা স্থায়ী মূলধন। কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া উৎপাদনকার্যে অবিরত ব্যবহৃত হয়। ইহারা স্থায়ী মূলধনের শ্রেণীভুক্ত।

চল্‌তি মূলধন : মূলধন হিসাবে যে সমস্ত বস্তু একবারই মাত্র উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায় তাহা চল্‌তি মূলধন। নির্দিষ্ট বস্ত্রখণ্ড উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা একবারই কাঁচা মালরূপে ব্যবহৃত হয়। অতএব, তুলা চলতি মূলধন শ্রেণীভুক্ত।

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital) :

উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে মূলধন অন্যতম। উৎপাদন ব্যবস্থায় মূলধনের ভূমিকা নিম্নরূপ :

প্রথমতঃ, মূলধনের ব্যবহারে শ্রমিকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় ; ফলে, উৎপাদনের পরিমাণ বর্ধিত হয় এবং সাধারণতঃ উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায়।

আধুনিক যুগে উন্নতধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিককালে মূলধনের বহুল ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে সময়ের ব্যবধানটি দূরীভূত হইয়াছে। আজকাল শ্রমিকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্য বাজারে বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিককে অপেক্ষা করিতে হয় না। দ্রব্যটি বিক্রয় হওয়ার পূর্বেই শ্রমিক তাহার ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার পারিশ্রমিক (wage) পায়। মূলধনরূপে অর্থের উৎপাদনে অংশ গ্রহণের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মূলধনের সাহায্যে উৎপাদন-পদ্ধতি পরোক্ষ ও সময়সাপেক্ষ (Roundabout Process of Production) হয়। বর্তমানে কোন দ্রব্য উৎপাদন আরম্ভ ও উহার সম্পন্ন হইবার মধ্যে সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধান প্রয়োজন হয়, কিন্তু, সেই দ্রব্যের কোন এক বিশেষ অংশ মূলধনের সাহায্যে শীঘ্রই প্রস্তুত করা যায়। যেমন, যন্ত্রের সাহায্যে একটি সম্পূর্ণ জুতা প্রস্তুত করা সময়-সাপেক্ষ ; কিন্তু জুতাটির যে কোন একটি অংশ (গোড়ালি ইত্যাদি) প্রস্তুত করিতে বেশী সময় লাগে না।

মূলধনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির উৎপাদন সমূহ (Factors governing accumulation of Capital) ঃ

মূলধনের উৎস সঞ্চয়। আয় হইতে ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়িত অর্থ বাদ দিলে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহাই সঞ্চয়। যেমন কোন ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০০৲ টাকা ; ইহা হইতে সে যদি ভোগ্যদ্রব্যের জন্য ৪০০৲ টাকা ব্যয় করে, তবে উদ্বৃত্ত থাকে ১০০৲ টাকা ; ইহাই তাহার সঞ্চয়। সুতরাং মূলধনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির উপাদান হইল ব্যক্তির আয়।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু আয় বৃদ্ধি পাইলেই সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না ; ইহার জন্য প্রয়োজন ব্যক্তির সঞ্চয়ের বাসনা। সঞ্চয়ের ইচ্ছা, আবার, বিভিন্ন পরিবারিক ও সামাজিক প্রেরণার উপর নির্ভরশীল ঃ (ক) পারিবারিক স্নেহ ঃ স্ত্রী ও সন্তানাদির জন্য স্নেহ মানুষকে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করে। (খ) সামাজিক সম্মানের প্রতি আকর্ষণ ঃ আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তশালী লোকেরাই

বেশী সম্মান পায়। এই সম্মান পাইবার ইচ্ছা মানুষকে সঞ্চয়মুখী করিয়া তোলে। (গ) দূরদৃষ্টি : দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা ভবিষ্যৎ দুর্দিনের জন্য সঞ্চয় করিতে উৎসাহ বোধ করে।

তৃতীয়তঃ, সামাজিক পরিবেশ ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভর করে। বিশৃঙ্খল সমাজ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তি সঞ্চয় করিতে আগ্রহী হয় না। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা ব্যতীত সঞ্চয়ের উৎসাহ সৃষ্ট হয় না। কোন দেশে যদি গৃহযুদ্ধ ইত্যাদির ফলে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা যায়, তাহা হইলে সেই দেশের জনসাধারণ সঞ্চয়মুখী হইতে পারে না।

যে দেশে সুদৃঢ় ও নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা আছে, সে দেশে লোকে সঞ্চয়ী হয়। সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে নিরাপত্তা জনসাধারণকে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত করে। ইহা ছাড়াও, তীব্র মুদ্রাস্ফীতির (Hyper-inflation) উদ্ভব হইলে মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি ব্যাহত হয়। মুদ্রামূল্য অত্যধিক কমিয়া গেলে অর্থব্যবস্থার কাঠামোর উপর মানুষ সন্দিহান হইয়া পড়ে। ফলে,সে আর সঞ্চয়ে উৎসাহ বোধ করে না। অতএব, সুদৃঢ় অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাই মানুষকে সঞ্চয়ী করিয়া তোলে।

চতুর্থতঃ, অনেক অর্থনীতিবিদের মতে সঞ্চয়ের পরিমাণ সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পাইবে, এবং সুদের হার হ্রাস পাইলে সঞ্চয়ের ইচ্ছাও কমিয়া যাইবে।

কিন্তু, আধুনিক অর্থনীতিবিদরা এই মত সমর্থন করেন না। সঞ্চয় প্রধানতঃ আয়ের উপর নির্ভরশীল, সুদের হারের উপর নয়। উপরন্তু, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকার বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে ; ফলে আয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। অতএব, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে সঞ্চয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলেই মূলধন বৃদ্ধি পায় না। ইহার জন্য প্রয়োজন আরও উৎপাদনের জন্য ব্যবসাবাণিজ্যে এই সঞ্চিত অর্থের যথার্থ বিনিয়োগ। সুতরাং, কোন দেশে অর্থের বিনিয়োগের উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা থাকিলেই সঞ্চিত অর্থ মূলধনে রূপান্তরিত হয়।

ভারতবর্ষে মূলধনের স্বল্পতার কারণ (Reasons for Low Savings in India) :

মূলধনের স্বল্পতা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অগ্রগতির অন্তরায়। এই স্বল্পতার বিভিন্ন কারণ আছে :

প্রথমতঃ, ভারতবাসীর মাথা-পিছু আয় নিতান্তই কম। জীবনধারণের জন্য আয়ের প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হয় ; ফলে, সঞ্চয়ের জন্য কোন উদ্বৃত্ত থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার অভাবহেতু গ্রামবাসীরা বিবাহ, মামলা মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্যে অহেতুক অধিক অর্থব্যয় করে। ইহাতে সঞ্চয়ের জন্য উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না।

তৃতীয়তঃ, দূর গ্রামাঞ্চলে নির্ভরযোগ্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা না থাকায় গ্রামবাসীরা সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হয় না।

ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন ও নানাবিধ অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। ইহাতে জনসাধারণের মাথা-পিছু আয় স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু, তাহাদের জীবনধারণের মান এত অনুন্নত যে, এই বর্ধিত আয় উন্নততর জীবনযাপনের জন্য ব্যয়িত হইবে। সুতরাং, অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে সঞ্চয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা কম।

প্রশ্নাবলী

1. What is Capital? What is the use of Capital in production?

(মূলধন কাহাকে বলে ? উৎপাদনে মূলধনের প্রয়োজন কি জন্য হয় ?)

(পৃঃ ২৬, ২৭ ও ২৮ দেখ।)

2. Distinguish between (a) Capital and Wealth and (b) Capital and Land.

মূলধন ও সম্পদ এবং মূলধন ও ভূমির মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?) (পৃঃ ২৬ ও ২৭ দেখ।)

3. Explain how the growth of Capital depends on saving. Does saving always lead to the creation of Capital?

(মূলধনের বৃদ্ধি সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে, এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। সঞ্চয় করিলেই মূলধনের সৃষ্টি হইবে এরূপ বলা ঠিক হইবে কি ?) (পৃঃ ২৮ ও ২৯ দেখ।)

4. What are the factors that govern the level of saving in a country?

(দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণের উপর প্রভাব আছে, এরূপ কয়েকটি উপাদানের উল্লেখ কর।)

(পৃঃ ২৮ ও ২৯ দেখ।)

সপ্তম অধ্যায়

ব্যবসা-সংগঠনের বিভিন্ন রূপ
(Forms of Business Organisation)

সংগঠকের ভূমিকা (Role of the Entrepreneur) :

উৎপাদনের উপাদানগুলির মধ্যে সংগঠন অন্যতম। আধুনিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় সুষ্ঠু সংগঠনের গুরুত্ব সর্বাধিক। সংগঠকের দক্ষতার উপর শিল্প-ব্যবসায়ের উৎপাদন-দক্ষতা নির্ভরশীল। প্রকৃতপক্ষে, উৎপাদনের সর্বময় দায়িত্ব সংগঠককেই বহন করিতে হয়। সাধারণতঃ, দুইটি প্রধান কার্য সংগঠককে সম্পন্ন করিতে হয় : শিল্প-ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি বহন। উৎপাদন পরিকল্পনা, উপাদান-সংগ্রহ ও উৎপাদনের সফল সম্পাদনা—সংগঠকের উপর নির্ভর করে। সংগঠকই স্থির করেন, কোথায় ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান করা লাভজনক, কয়জন বিশেষজ্ঞ বা শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইবে, কি পরিমাণ যন্ত্রপাতি বা কাঁচামালের প্রয়োজন হইবে, শ্রমবিভাগ কিরূপে করা উচিত, কি পরিমাণ উৎপাদন লাভজনক ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের কিরূপ সুবন্দোবস্ত করা যায় ইত্যাদি। এইরূপ শিল্প-ব্যবস্থাপনা ছাড়াও ঝুঁকিবহন সংগঠকের অন্যতম দায়িত্ব। শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট হারে মজুরী, সুদ বা খাজনা দিতে হয়। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ অনির্দিষ্ট থাকিলেও উপাদানগুলিকে নির্দিষ্ট হারে অর্থ দিতে হয়। ফলে, বিক্রয়লব্ধ অর্থ যদি এমন হয় যে, উপাদানগুলিকে খাজনা, সুদ ও মজুরী দিয়াও কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে সংগঠক মুনাফা অর্জন করিয়া থাকে। অপরপক্ষে, এইরূপ উদ্বৃত্ত না থাকিলে অর্থাৎ সামগ্রিক উৎপাদন ব্যয় বিক্রয়লব্ধ অর্থ অপেক্ষা বেশী হইলে সংগঠকের কোন মুনাফা থাকে না। সংগঠক ব্যবসা-পরিচালনা করেন মুনাফা প্রত্যাশায় ; অথচ, মুনাফা অর্জন সম্পর্কে একেবারে স্থিরনিশ্চয় হওয়া সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

সাধারণতঃ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন একজন সংগঠকের উপরই ন্যস্ত থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ স্বল্প হওয়ায় ও উৎপাদন-ব্যবস্থা

বিশেষ জটিল না হওয়ায় এই সকল শিল্পে তত্ত্বাবধান-কার্য বিশেষ জটিল ও দায়িত্বপূর্ণ হয় না। কিন্তু, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন-ব্যবস্থার জটিলতার জন্য সংগঠন-দায়িত্ব একাধিক সংগঠকের উপর ন্যস্ত থাকে। বেতন-ভোগী তত্ত্বাবধায়কগণ বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের তত্ত্বাবধান করেন।

ব্যবসা সংগঠনের বিভিন্ন রূপ ঃ

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের বিভিন্ন রূপের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ঃ

(১) ব্যক্তিগত সংগঠন (Single Entrepreneur System) ঃ

ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মালিক একজন হইলে এবং তাহারই ব্যক্তিগত ব্যবস্থাপনায় ব্যবসা পরিচালিত হইলে এইরূপ ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত সংগঠন বলা হয়। ইহাই ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে সচরাচর চোখে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের যাবতীয় উন্নতি অবনতির দায়িত্ব একটিমাত্র ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। নিজের দায়িত্বে ব্যবসা পরিচালনা করে বলিয়া ব্যয় সংক্ষেপ ও ব্যবসার উন্নতির দিকে মালিক স্বভাবতঃই মনোযোগী হয়। ব্যক্তিগত সংগঠনরীতি ব্যবসা পরিচালনার সহজতম পদ্ধতি হইলেও, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি হইলে ইহা কার্যকরী হয় না। মূলধনের প্রয়োজন অত্যধিক হওয়ায় ও উৎপাদন পদ্ধতির ব্যাপ্তি ও জটিলতার দরুণ বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত সংগঠনরীতির মাধ্যমে পরিচালনা সম্ভব হয় না।

(২) অংশীদার প্রথা (Partnership) ঃ

যদি দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিয়া ব্যবসায়ের মূলধন যোগান দেয় এবং ব্যবসায়ের লাভক্ষতির দায়িত্ব যৌথভাবে গ্রহণ করে, তাহা হইলে অংশীদার প্রথার উদ্ভব হয়। এইরূপ ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অংশীদারের দায়িত্বকে অপরিমিত দায়িত্ব (unlimited liability) বলা হইয়া থাকে। প্রত্যেক অংশীদার ব্যবসায়ের দেনার জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকে। ব্যবসায়ের দেনা পরিশোধের জন্য, আবশ্যক হইলে অংশীদারকে নিজস্ব অর্থসম্পত্তিও দিতে বাধ্য থাকিতে হয়।

অংশীদার প্রথার সুবিধা এই যে, এইরূপ ব্যবস্থার মাধ্যমে অংশীদারগণ

মিলিতভাবে মূলধন দিয়া থাকে বলিয়া মূলধন সংগ্রহ সহজ হয়। ইহা ছাড়া, ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য অংশীদারগণ মিলিতভাবে পরামর্শ করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করে বলিয়া পরিচালনা কার্যও সহজ ও সুনিপুণ হয়। কিন্তু, এই প্রথার প্রধান ত্রুটি এই যে, সকল অংশীদারকেই ব্যবসায়ের দেনার জন্য অপরিমিত দায়িত্ব বহন করিতে হয়। ইহার ফলে, কোন একজন অংশীদারের ব্যক্তিগত ত্রুটি বা নির্বুদ্ধিতার জন্য অন্যান্য সকল অংশীদারেরও ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে। আবার, ব্যক্তিগত কর্মদক্ষতা বা উদ্যম প্রদর্শনের অবকাশও অংশীদারী প্রথায় থাকে না ; কারণ, ব্যবসা পরিচালনার নীতি ও পদ্ধতি যৌথভাবে স্থিরীকৃত হইয়া থাকে।

(৩) যৌথ মূলধন ব্যবসা (Joint Stock Company) :

একাধিক ব্যক্তির প্রদত্ত যৌথমূলধনের ভিত্তিতে এইরূপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া স্বল্প বা অধিক পরিমাণ মূলধন যোগান দিয়া থাকে 'শেয়ার হোল্ডার'রা। এই সকল 'শেয়ার হোল্ডার'দের মূলধন লইয়াই যৌথমূলধন ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যবসায়ের লাভ ক্ষতির দায়িত্ব ইহারাই গ্রহণ করে। যৌথমূলধন ব্যবসায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শেয়ার হোল্ডারদের পরিমিত দায়িত্ব (Limited liability)। ইহার অর্থ হইল যে, 'শেয়ার হোল্ডার' যে পরিমাণ মূলধন যোগান দেয় তাহার অধিক আর দায়িত্ব তাহাকে বহন করিতে হয় না। নিজস্ব শেয়ারের পরিমাণ পর্যন্ত শেয়ার হোল্ডার কোম্পানীর দেনার জন্য দায়ী থাকে, তদতিরিক্ত তাহার আর কোন দায়িত্ব থাকে না। শেয়ার হোল্ডাররা নিজেদের মধ্য হইতে কয়েকজনকে নির্বাচিত করিয়া ব্যবসা পরিচালনার ভার ইহাদের হাতে অর্পণ করে। নির্বাচিত পরিচালকমণ্ডলী (Board of Directors) শেয়ার হোল্ডারদের স্বার্থে ব্যবসা তদারকী ও পরিচালনা করিয়া থাকে। পরিচালকমণ্ডলীকে শেয়ার হোল্ডারদের নিকট আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ দাখিল করিতে হয়। যৌথমূলধন ব্যবসায়ে মূলধন সংগ্রহের উপায় সাধারণতঃ দুইটি : শেয়ার বিক্রয় ও ঋণ পত্র (Debenture) বিক্রয়।

যাহারা কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করে তাহারাই কোম্পানীর মালিক। ব্যবসায়ের লাভক্ষতির দায়িত্ব তাহারাই যৌথভাবে গ্রহণ করে। কোম্পানীর লাভ হইলে তাহারা লভ্যাংশ (Dividend) পাইয়া থাকে, ক্ষতি হইলে

তাহারা লভ্যাংশ পায় না। যৌথ মূলধন ব্যবসায় দুই প্রকার শেয়ার বিক্রয় করিয়া থাকে : সাধারণ শেয়ার (Ordinary Shares) ও বিশিষ্ট শেয়ার (Preference Shares)। যাহারা সাধারণ শেয়ার ক্রয় করে তাহারা কোম্পানীর লাভের অংশ পায়। তবে, এই লভ্যাংশ পূর্বনির্দিষ্ট থাকে না ; অর্থাৎ, কোম্পানীর লাভ কম বা বেশী হইলে হোল্ডারদের লভ্যাংশের পরিমাণও কম বা বেশী হয়।

যাহারা বিশিষ্ট শেয়ার ক্রয় করে তাহারাও সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের মত ব্যবসায়ের মালিক বলিয়া গণ্য হয়। তবে, এই প্রকার শেয়ার হোল্ডারদের বৈশিষ্ট্য হইল যে, কোম্পানীর লাভের উপর ইহাদের লভ্যাংশের দাবী সর্বাগ্রগণ্য। ইহাদের লভ্যাংশের পরিমাণ পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট থাকে। বিশিষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দিবার পর যাহা পড়িয়া থাকে তাহা হইতে সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশ দেওয়া হয়। অনেক-ক্ষেত্রে ব্যবসায়ের লাভ হইতে বিশিষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দেওয়া সম্ভব না হইলে, এই শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশের দাবী বৎসরের পর বৎসর সঞ্চিত হইতে থাকে। অর্থাৎ পরবর্তীকালে কোম্পানীর লাভ হইতে থাকিলে শেয়ার হোল্ডারদের পূর্ববর্তী বৎসরের নির্দিষ্ট লভ্যাংশ দিতে কোম্পানী বাধ্য থাকে। এই জাতীয় শেয়ার বিশিষ্ট শেয়ারেরই অপর এক প্রকার-ভেদ। ইহাকে সঞ্চয়শীল বিশিষ্ট শেয়ার বলা হয় (Cumulative Preference Shares)।

ঋণপত্র (Debenture) বিক্রয় করিয়াও যৌথমূলধন ব্যবসা মূলধন সংগ্রহ করে। শেয়ার ক্রেতা ও ঋণপত্র ক্রেতাদের মধ্যে পার্থক্য হইল যে, শেয়ার হোল্ডাররা কোম্পানীর লাভক্ষতির দায়িত্ব গ্রহণ করে ; কিন্তু ঋণপত্র ক্রেতারা কোম্পানীর ঋণদাতা। সাধারণ বা বিশিষ্ট শেয়ার হোল্ডারদের মত ঋণপত্র ক্রেতারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মালিক নয়। কোম্পানীর ঋণপত্র ক্রেতারা নির্ধারিত হারে সুদ পাইয়া থাকে। সকল অবস্থাতেই ঋণপত্র ক্রেতার নির্দিষ্ট সুদ মিটাইয়া দিতে হয়। শেয়ার হোল্ডারদের লভ্যাংশের ন্যায় ঋণপত্র ক্রেতার সুদ কোম্পানীর লাভক্ষতির উপর নির্ভরশীল নয়। অতএব, দেখা যাইতেছে যে, ঋণপত্র ক্রেতার আয় নিশ্চিত ও নির্ধারিত। বিশিষ্ট শেয়ার হোল্ডারের আয় সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের আয় অপেক্ষা অধিক নিশ্চিত এবং তাহার আয়ের পরিমাণও পূর্বনির্দিষ্ট।

অপর পক্ষে, সাধারণ শেয়ার হোল্ডারের আয় সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর লাভের হ্রাসবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল। ব্যবসায় ক্ষেত্রে সকল লোক সমান ঝুঁকি বহন করিতে রাজী থাকে না বলিয়াই যৌথমূলধন ব্যবসায়কে উপরোক্ত বিভিন্ন ভাবে মূলধন সংগ্রহ করিতে হয়।

বর্তমানযুগে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার মূলে যৌথমূলধন ব্যবসায়ের অবদান অনস্বীকার্য। বৃহদায়তন শিল্পে যে পরিমাণ মূলধন প্রয়োজন হয় তাহা একজন ব্যক্তির পক্ষে সরবরাহ করা অসম্ভব। আবার অংশীদারী প্রথার মাধ্যমে এরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠার অসুবিধা এই যে, অংশীদারদের দায় অপরিমিত থাকার দরুণ মূলধন সরবরাহ করিয়া ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহন করিতে মূলধন-যোগানকারীরা রাজী হয় না। যৌথ মূলধন ব্যবসার উদ্ভব হওয়ায় ব্যক্তিগত মালিকানা বা অংশীদারী প্রথার ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভব হইয়াছে। বস্তুতঃ, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান যৌথ মূলধন ব্যবসার দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে।

যৌথ-মূলধন ব্যবসায়ের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নরূপ :

সুবিধাবলী (Merits) :

(ক) বিভিন্ন শেয়ার হোল্ডারদের নিকট শেয়ার বিক্রয় করিয়া যৌথ-মূলধন ব্যবসা যথেষ্ট মূলধন সংগ্রহ করিয়া থাকে। সুতরাং আধুনিক বৃহদায়-তন শিল্প ও ব্যবসায়ের জন্য মূলধন সংগ্রহ করিতে যৌথমূলধন ব্যবসাই সর্বাপেক্ষা উপযোগী।

(খ) যে কোন ব্যক্তি স্বল্পসঞ্চয় দ্বারা শেয়ার বা ঋণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যক্তিগত আয় কিছু বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহার ফলে, জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের উৎসাহ সঞ্চারিত হয়।

(গ) দায় সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ যৌথ মূলধন ব্যবসায়ে যে কোন শেয়ার হোল্ডারের ঝুঁকি কম থাকে। শেয়ারগুলি হস্তান্তরযোগ্য হওয়ায় শেয়ার হোল্ডার সহজেই শেয়ার ক্রয়বিক্রয় করিতে পারে। এই সকল কারণে, ঝুঁকি কম থাকার দরুণ, সামান্যতম সঞ্চয়ও মূলধন হিসাবে ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং স্বল্পসঞ্চয়ী লোকও শিল্প ব্যবসায়ে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ পাইয়া থাকে।

(ঘ) যৌথমূলধন ব্যবসায়ে শেয়ার হোল্ডাররা মূলধনের যোগান দেয় ও কোম্পানীর লাভক্ষতির দায়িত্ব গ্রহণ করে। কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থা তত্ত্বাব-

ধানের জন্য বেতনভোগী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়। যে ব্যক্তির টাকা আছে. তাহার শিল্প পরিচালন-দক্ষতা নাও থাকিতে পারে; আবার, যাহার শিল্প-পরিচালন দক্ষতা আছে, তাহার মূলধন নাও থাকিতে পারে। মূলধন যোগানকারী ও দক্ষ পরিচালকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে যৌথমূলধন ব্যবসা। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইতে পারে তাহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন যৌথমূলধন ব্যবসা। এইরূপ বন্দোবস্তের ফলে, পরিচালনার ভার যোগ্য, শিক্ষিত ও দক্ষ পরিচালকগণের হাতে ন্যস্ত করা সম্ভব হয়।

(ঙ) মূলধন বেশী থাকায় যৌথমূলধন ব্যবসা বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধাগুলি ভোগ করে। বিভিন্ন গবেষণা ও পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবসাকে উন্নত করিয়া তোলা এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয়। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির পক্ষে, তাই এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য।

অসুবিধা (Demerits):

যৌথমূলধন ব্যবসায়ের কয়েকটি ত্রুটিও আছে। (ক) এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ হইল যে, এই ব্যবসায়ের মালিকগণ নিজেরা ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করিতে পারেন না বলিয়া পরিচালকমণ্ডলীর উপর এই দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। এই পরিচালকমণ্ডলী শেয়ার হোল্ডারদের যথার্থ লভ্যাংশ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে বা কোম্পানীর পরিচালনা যোগ্যতার সহিত নাও করিতে পারে। এক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডাররা ও কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

(খ) বেতনভোগী ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে যৌথ মূলধন ব্যবসা পরিচালিত হয় বলিয়া উৎপাদন ব্যবস্থা ত্রুটিপূর্ণ হইবারও আশঙ্কা থাকে। নিজস্ব ব্যবসায়ে লোক যেমন যত্ন লইয়া থাকে, বেতনভোগী ব্যবস্থাপকগণ সেইরূপ আগ্রহ ও যত্ন লইয়া ব্যবসা পরিচালনা করিবে ইহা আশা করা যায় না।

(গ) শেয়ারগুলি সহজে হস্তান্তরযোগ্য হয় বলিয়া যৌথমূলধন ব্যবসায়ে কোন ব্যক্তি বা উপদল একাধিপত্য স্থাপন করিবার নিমিত্ত অধিকাংশ শেয়ার কিনিয়া লইতে পারে। এইরূপে যৌথমূলধন ব্যবসায়ের মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্পের উপর ব্যক্তি বা উপদলের একাধিপত্য স্থাপিত হয়।

(ঘ) যৌথমূলধন ব্যবসায়ের আর একটি ত্রুটি হইল যে, মালিক ও

শ্রমিকের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এই ব্যবস্থায় থাকে না। শ্রমিকরা পরিচালিত হয় বেতনভোগী ব্যবস্থাপকদের দ্বারা, আর মালিকরা শেয়ারের লভ্যাংশটুকু পাইয়াই সন্তুষ্ট থাকে। ফলে শ্রমিক মালিকের কোন সম্পর্ক এইরূপ ব্যবসায় গড়িয়া উঠে না। সেইজন্য, শ্রমিক মালিক বিরোধের আশঙ্কা যৌথমূলধন ব্যবসায় দেখা দেয়।

(৪) সমবায় ব্যবস্থা (Co-operative System) :

সমবায় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল যে, এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রমিকবর্গ কিংবা ক্রেতাসাধারণ নিজেরাই ব্যবসায়ের মূলধন যোগান দেয় ও লাভক্ষতির দায়িত্ব বহন করে। ব্যবসায়ের মালিকরূপে তাহারা নিজেরাই ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে বলিয়া এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রমিক-মালিক কোন পার্থক্য থাকে না। ধনতন্ত্রের মত পুঁজিপতির কোন কায়েমী স্বার্থ সমবায় ব্যবস্থায় সৃষ্টি হয় না। আবার, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতিতে যে আমলাতান্ত্রিক শাসন সৃষ্ট হয় তাহাও সমবায় ব্যবস্থায় দেখা যায় না। গণতন্ত্রের অর্থনৈতিক রূপ সমবায় ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। তবে, এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বৃহদায়তন শিল্পব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার মত পর্যাপ্ত মূলধন সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক।

(৫) রাষ্ট্রীয় পরিচালনা (State management) :

ব্যক্তিগত মালিকানা বা সমবায় ব্যবস্থা ছাড়াও আরও একপ্রকার ব্যবসা পরিচালনা দেখা যায়। এরূপ ব্যবস্থায় সরকারী মূলধনের নিয়োগ ও সরকারী ব্যবস্থাপনা পরিলক্ষিত হয়। ইহাকে রাষ্ট্রীয় পরিচালনা বলা হয়। ভারতবর্ষে রেলপথ পরিচালনা বা জীবনবীমা পরিচালনা এইরূপ রাষ্ট্রীয় পরিচালনার দৃষ্টান্ত। এই ব্যবস্থার প্রধান গুণ হইল যে, কোন ব্যক্তিগত মালিকানা না থাকায় ব্যবসায়ের লাভ কোনো শ্রেণীর হস্তগত হয় না; ইহা জাতীয় কল্যাণ-কর কার্যে ব্যয়িত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য মূলধন সংগ্রহ এই ব্যবস্থার ফলে সহজ হয়। কিন্তু, এই ব্যবস্থার কয়েকটি ত্রুটিও চোখে পড়ে। বেতনভোগী পরিচালকগণের হস্তে ব্যবসা পরিচালনভার থাকায় তাহারা কার্যে বিশেষ উদ্যম বা আগ্রহ প্রদর্শন করে না। উপরন্তু, এই ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক প্রভাব বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু, এই সব অসুবিধা

সত্ত্বেও আধুনিক জটিল অর্থনীতিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রয়োজন বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the functions of an entrepreneur or business organiser?
(ব্যবসায়ের সংগঠককে কোন্ কোন্ কাজ করিতে হয়?) (পৃঃ ৩১ দেখ)

2. Name the different forms of business organisation.
(ব্যবসায় সংগঠনের বিভিন্ন রূপ সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৩২ হইতে ৩৮ দেখ)

3. What is a Partnership? What are its advantages and disadvantages?
(অংশীদারী ব্যবসায় কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা ও অসুবিধা সম্বন্ধে আলোচনা কর।) (পৃঃ ৩২ ও ৩৩ দেখ)

4. Describe the salient features of a Joint Stock Company. What are its advantages and disadvantages?
(যৌথমূলধন প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের সুবিধা ও অসুবিধা কোথায়?) (পৃঃ ৩৩ হইতে ৩৭ দেখ)

5. State the salient features of Co-operative and State-management.
(সমবায় ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় পরিচালনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর।) (পৃঃ ৩৭ ও ৩৮ দেখ)

অষ্টম অধ্যায়

শ্রমবিভাগ ও উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন
(Division of Labour and Scale of Production)

উৎপাদনের উৎকর্ষের জন্য সংগঠককে দুইটি বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হয়: (ক) শ্রম বিভাগ, ও (খ) উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন। শ্রম বিভাগের অর্থ শ্রমিকের স্ব স্ব রুচি ও যোগ্যতা অনুযায়ী কর্ম বিভাগ। ইহার ফলে শ্রমিকের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তনের উপরও উৎপাদনের উৎকর্ষ ও ব্যয় বহুলাংশে নির্ভরশীল। উৎপাদনের উপাদানসমূহের পরিমাণ ও উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন নির্ধারণ করা আধুনিক সংগঠকের

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন এমন হওয়া উচিত যাহাতে স্বল্পব্যয়ে অধিক পরিমাণ বস্তু উৎপাদন করা সম্ভব হয়। উৎপাদন কেন্দ্রের যে আয়তনে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন সম্পন্ন হয়, তাহাকে অভিপ্রেত আয়তন (optimum unit) বলা হয়। উৎপাদন কেন্দ্রকে এই অভিপ্রেত আয়তনে সংগঠিত করাই আধুনিক সংগঠকের প্রধান দায়িত্ব।

শ্রমবিভাগ ঃ

শ্রমবিভাগ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। রুচি ও যোগ্যতা অনুসারে শ্রমিকদের মধ্যে কর্মবণ্টন করিয়া দেওয়া শ্রম বিভাগের মূলনীতি। ইহার ফলে, স্বভাবতঃই, প্রত্যেক শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট কর্মে নিযুক্ত থাকার দরুণ, তাহার সেই কর্মে বিশেষীকরণ (specialisation) সম্ভব হয়। পূর্বে একই ব্যক্তিকে কোন বস্তু উৎপাদনের সমগ্র অংশই একাকী সম্পাদন করিতে হইত। কিন্তু, বর্তমানে শ্রম বিভাগের ফলে, বস্তুর উৎপাদন প্রণালী বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হইয়াছে। এইভাবে, প্রত্যেকটি বস্তুর উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর বিন্যাস করা হইয়াছে এবং এক একটি অংশ পৃথক পৃথক শ্রমিকের হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে।

শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে শ্রম বিভাগ বলিতে কোন নির্দিষ্ট কর্মে তাহার বিশেষীকরণ ; কিন্তু সমগ্র সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমবিভাগের অর্থ উৎপাদন কার্যে বিভিন্ন শ্রমিকের সহযোগিতা।

বিভিন্ন প্রকারের শ্রমবিভাগ ঃ (Kinds of Division of Labour) ঃ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন প্রকারের শ্রমবিভাগ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ, শিল্প ব্যবসায়ের প্রকৃতি অনুযায়ী শ্রমবিভাগ ঘটিয়া থাকে। যেমন, একজন কৃষক চাষের সমস্ত কার্য একাই সম্পন্ন করিয়া থাকে ; একটি মুচি এক জোড়া জুতা নিজেই সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত তৈয়ারী করে। ভারতবর্ষে আর্যযুগে সমাজে যে কর্ম বিভাগ ছিল, তাহা এই শ্রমবিভাগের অনুরূপ। ব্রাহ্মণ শুধু ধর্মযাজকের কাজ করিত, ক্ষত্রিয় শুধু যোদ্ধার কাজ করিত, ব্যবসায়ের কাজ করিত বৈশ্য এবং শূদ্রকে করিতে হইত কায়িক শ্রম।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বস্তুর উৎপাদন প্রণালীকে কয়েকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্তরে

বিভক্ত করা যায়। এক একটি স্তরের দায়িত্ব এক একজন শ্রমিকের উপর ন্যস্ত হয়। একটি স্তরের উৎপন্ন দ্রব্য অন্যস্তরে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন যে সূতা তৈয়ারী করে, তাহার সূতা বয়নকারীর কাছে কাঁচা মাল। এই প্রকারের শ্রমবিভাগের বৈশিষ্ট্য হইতেছে যে, উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অপর স্তরের উপর নির্ভরশীল নয়।

তৃতীয়তঃ, উৎপন্ন দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশকে পরস্পর নির্ভরশীল বিভাগে বিন্যস্ত করিলে অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়ায় শ্রমবিভাগ ঘটিয়া থাকে। যেমন, দর্জির দোকানে একটি সম্পূর্ণ শার্ট তৈয়ারী করিতে বিভিন্ন কারিগরের পরস্পরনির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয়; একজন কাপড় কাটে, আর একজন সেলাই করে, আরও একজন হয়ত বোতাম বসাইয়া থাকে। এই বিভিন্ন পরস্পরনির্ভরশীল কাজের সমন্বয়ে সম্পূর্ণ জিনিসটি প্রস্তুত হয়।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন কারণে বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশিষ্ট শিল্পের একদেশতাকে (Localisation) স্থানগত শ্রমবিভাগ বলা হয়। পশ্চিম বাংলায় পাটশিল্প, গুজরাটে বস্ত্রশিল্প, জামসেদপুরে লৌহশিল্প প্রভৃতি এই জাতীয় শ্রমবিভাগের উদাহরণ।

শ্রমবিভাগের সুবিধা (Advantages of Division of Labour):

উৎপাদন কার্যকে উন্নত করিবার জন্য শ্রমবিভাগ একটি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া। ইহার ফলে উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং দ্রব্যের মূল্য সাধারণতঃ হ্রাস পায়। শ্রমিকরাই আবার ভোগব্যবহারকারী (consumers); সুতরাং, ভোগব্যবহারকারী রূপে শ্রমিক স্বল্পমূল্যে বেশী ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। শ্রমবিভাগের ফলে, তাই, জনসাধারণের সার্বিক কল্যাণ সাধিত হয়।

শ্রমবিভাগের সুবিধাগুলি নিম্নরূপ:

(ক) শ্রমবিভাগের মাধ্যমে শ্রমকে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়; ফলে, যে শ্রমিক যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। ইহাতে উৎপাদন ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায়।

(খ) শ্রমবিভাগের দরুণ একটি নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত থাকার ফলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। অভ্যাসের ফলেই নৈপুণ্যের সৃষ্টি হয়। একটি

কাজের প্রথমাবস্থায় হয়ত শ্রমিক দক্ষ নাও হইতে পারে; কিন্তু বারংবার একই কাজ করিতে হয় বলিয়া কিছুকাল পরে সেই কাজে দক্ষতা অর্জন করে।

(গ) শ্রমবিভাগের ফলে সময়সংক্ষেপ হয়। একই যন্ত্রের সাহায্যে শ্রমিককে একই স্থানে একটি নির্দিষ্ট কাজ করিতে হয়। ইহাতে স্থানান্তর ও যন্ত্রাদির পরিবর্তন প্রয়োজন হয় না। ফলে, কাজের প্রবাহ অব্যাহত থাকে এবং সময়েরও অপচয় হয় না।

(ঘ) শ্রমবিভাগনীতির বিকাশের ইতিহাসের সহিত যন্ত্র আবিষ্কারের ইতিহাসের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায়। এক একটি কর্ম নিয়মিত পুনরাবৃত্তির আকার ধারণ করিলে স্বভাবতঃই কর্মী কাজটুকু যন্ত্রের সাহায্যে সম্পাদন করিবার কথা ভাবিয়া থাকে। ইহাতে যন্ত্রের আবিষ্কার হয়।

(ঙ) শ্রমবিভাগের দ্বারা উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। এক একটি ক্ষুদ্র অংশে নিয়মিত ও নির্ধারিত কর্মপ্রণালী থাকার দরুণ যন্ত্রের বহুল ব্যবহার সম্ভব হয়। যন্ত্রের ব্যবহারের ফলে কতকগুলি সুবিধা হইয়া থাকেঃ প্রথমতঃ, কষ্টসাধ্য কাজ শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্রের সাহায্যে সুসম্পন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রের সহায়তায় শ্রমিকের দক্ষতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত শ্রমিক স্বাস্থ্যহীনতার জন্য কায়িক শ্রমে অসমর্থ তাহারা সহজেই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

(চ) স্থানগত শ্রমবিভাগের সুবিধা (Advantages of Territorial Division of Labour): ভৌগোলিক কারণে এক একটি অঞ্চল এক একটি শিল্পের পক্ষে উপযুক্ত। রাণীগঞ্জ অঞ্চলে কয়লা খনির অবস্থানের জন্য কয়লা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে। স্থানগত শ্রমবিভাগ আঞ্চলিক সুবিধার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠে। ইহাতে উৎপাদনে ব্যয়সংক্ষেপ হইয়া থাকে।

শ্রমবিভাগের অসুবিধা (Disadvantages of Division of Labour)

শ্রমবিভাগ যেমন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে, তেমন আবার কতকগুলি অসুবিধার সৃষ্টি করিয়াছেঃ

(ক) শ্রমবিভাগের দরুণ শ্রমিকের একটি কাজে বিশেষীকরণ (specialisation) ঘটিয়া থাকে। ইহার ফলে, তাহার কর্মের পরিধি সঙ্কুচিত হয়

এবং দৃষ্টিভঙ্গীও সঙ্কীর্ণ হয়। একটি নির্দিষ্ট কাজের নিয়মিত পুনরাবৃত্তি শ্রমিকের নিকট ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে হইয়া উঠে। এই মানসিক অবসাদের জন্য তাহার কর্মদক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

(খ) শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ পরস্পর নির্ভরশীল থাকে। কোন একটি অংশে শ্রমিক ধর্মঘট প্রভৃতি কারণে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইলে অপর অংশগুলিও অচল হইয়া পড়ে। ইহাতে, উৎপাদন ব্যাহত হয় এবং সমগ্র সমাজ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) শ্রমবিভাগের ফলে একজন শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত থাকে, ইহাতে তাহার সেই কার্যে বিশেষীকরণ ঘটিয়া থাকে। যদি কোন (চাহিদার পরিবর্তন ইত্যাদি) সেই শ্রমিকের শ্রমোৎপাদিত দ্রব্যের প্রয়োজন কমিয়া যায়, তাহা হইলে, তাহার বেকার হইবার আশঙ্কা থাকে। একটি নির্দিষ্ট কাজে বিশেষীকরণের জন্য অন্য কোন নূতন কাজে নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা তাহার থাকে না। সুতরাং, অনেক সময় শ্রমবিভাগের ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হইতে পারে।

(ঘ) শ্রমবিভাগের অবশ্যম্ভাবী ফল বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের একদেশীয়তা। ইহার দরুণ সহরাঞ্চলে কারখানা জীবন গড়িয়া উঠে। জনাকীর্ণ সহর, নোংরা পরিবেশ, নৈতিক অবনতি প্রভৃতি এই কারখানা জীবনের আনুষঙ্গিক হিসাবে দেখা যায়।

উপসংহারে বলা যায় যে, শ্রমবিভাগের ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইহার ভূমিকা অনস্বীকার্য। শ্রমবিভাগের ত্রুটিসমূহ প্রধানতঃ অপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ফল। একাধিক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় শ্রমিককে শিক্ষাদান, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ, কারখানায় সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি এবং সুপরিকল্পিত সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা—ইহাদের মাধ্যমে শ্রমবিভাগের ত্রুটিগুলি বহুলাংশে দূর করা সম্ভব।

শ্রমবিভাগের সীমা (Limits to the extent of Division of Labour):

শ্রমবিভাগের ফলে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের বিশেষীকরণ ও যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহারেই ইহা সম্ভব হয়। উৎপন্ন দ্রব্য যদি উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয়ের সুবিধা থাকে তাহা হইলেই ইহা পর্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করা

লাভজনক হয়। যে সমস্ত দ্রব্যের বিস্তৃত বাজার আছে, সেই সমস্ত দ্রব্যেরই উৎপাদনের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ শ্রমবিভাগ সম্ভব। অপর পক্ষে, যে সমস্ত দ্রব্যের চাহিদা সীমাবদ্ধ ও বাজার সঙ্কীর্ণ সেই সমস্ত দ্রব্যের উৎপাদনও কম হইয়া থাকে ; ফলে, এই সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ সম্ভব নয়। অতএব শ্রমবিভাগের সীমা নির্ধারিত হয় বাজারের পরিধির দ্বারা (Division of Labour is limited by the extent of the market)। বাজারের পরিধি স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট নয়। পরিবহন ব্যবস্থা ইত্যাদির সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের ফলে একটি দ্রব্যের চাহিদা ও বাজার পূর্বাপেক্ষা বিস্তৃতি লাভ করে। দ্রব্যটির উৎপাদনে পূর্বে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ সম্ভব ছিল না ; কিন্তু বাজারের নূতন ব্যাপ্তির ফলে ইহা সম্ভব হয়।

দ্বিতীয়তঃ, মূলধন প্রভৃতি উৎপাদনের উপাদানসমূহের অপ্রাচুর্য থাকিলে সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগ সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে মূলধনের একান্ত অভাব আছে। ইহার ফলে শ্রমিকের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও উৎপাদন কেন্দ্রের অভিপ্রেত আয়তন সৃষ্টি করা যায় না এবং সূক্ষ্ম শ্রমবিভাগও সম্ভব হয় না।

উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন (Scale of Production)

শ্রমের বিশেষীকরণ ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তনের উপর নির্ভরশীল। বৃহদায়তন শিল্পে শ্রমবিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ লোক নিয়োগ করা যায়, ও যন্ত্রপাতির বহুল ব্যবহার সম্ভব হয়। ইহার ফলে, উৎপাদনের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ব্যবস্থায় ইহা সম্ভব নয়।

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধা (Economies of Large Scale Production):

বৃহদায়তন শিল্পের সুবিধাকে দুইভাবে ভাগ করা যায়ঃ (ক) আভ্যন্তরীণ সুবিধা (Internal Economies) ও (খ) বাহ্যিক সুবিধা (External Economies)। কোন শিল্পের অন্তর্গত একটি উৎপাদনকেন্দ্র বা ফ্যাক্টরীর সুবিধাগুলি যদি সেই শিল্পের অন্তর্গত অন্যান্য উৎপাদনকেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল না হয়, তবে সেই সুবিধাগুলিকে পূর্বোক্ত উৎপাদনকেন্দ্রের আভ্যন্তরীণ সুবিধা বলা হয়। উৎপাদনকেন্দ্রের উৎপাদনের বৃদ্ধির দরুণই এই সুবিধাগুলি

পাওয়া যায়। আবার, যখন কোন শিল্পের বা কয়েকটি শিল্পের প্রসার ঘটে, তখন এই প্রসারজনিত সুবিধাগুলি একটি শিল্পের অন্তর্গত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বা বিভিন্ন শিল্পগুলি একই সঙ্গে ভোগ করে। এই সুবিধাগুলিকে বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক সুবিধা বলে।

আভ্যন্তরীণ সুবিধা ঃ

আভ্যন্তরীণ সুবিধাগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) বৃহদায়তন উৎপাদনে আধুনিক বৃহৎ ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি ব্যবহার সম্ভব। ইহাতে উৎপাদন বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন ব্যয়ও কম হয়। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পক্ষে এইরূপ ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। বৃহৎ শিল্পে মূলধন বেশী থাকে ; সুতরাং শিল্পোন্নয়নের গবেষণা কার্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। ইহাতে নূতন যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ও ব্যয়সংক্ষেপ হয়।

(২) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে পরিচালককে একাই বিভিন্ন কাজ করিতে হয়। ফলে, সব কাজ সমান দক্ষতার সহিত করা সম্ভব হয় না। বৃহদায়তন শিল্পে পরিচালনা কার্যকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত করা যায় এবং প্রত্যেকটি অংশকে এক একজন বিশেষজ্ঞের হাতে ন্যস্ত করা যায়। ইহাতে পরিচালনা সুষ্ঠু ও নিপুণ হয়।

(৩) বৃহদায়তন শিল্পে কাঁচামাল ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক জিনিস একত্রে সঠিক পরিমাণে ক্রয় করা হয়। তাহার ফলে, সুবিধাজনক দরে জিনিসগুলি পাওয়া যায়। এক সঙ্গে অনেক জিনিস ক্রয়বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া পরিবহন খরচও অনেক কম হয়। বিজ্ঞাপন, বিভিন্ন বিক্রয়কেন্দ্রে বিক্রয় প্রতিনিধি নিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে বিক্রয়ের সম্প্রসারণ করা বৃহদায়তন শিল্পে সম্ভব হয়।

(৪) শিল্প-প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন হইলে মূলধনপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সুবিধা হয়। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাজারে পরিচিতির জন্য সুবিধাজনক সর্তে অর্থাদি পাইতে অসুবিধা হয় না।

(৫) বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বহন করিবার সামর্থ্য ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা বেশী। উৎপন্ন দ্রব্যের সুবিস্তৃত বাজার থাকার দরুণই বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান ঝুঁকি বহন করিতে সাহসী হয়। যেমন, কোন একটি বৃহদায়তন বস্ত্র প্রতিষ্ঠানের বাজার বোম্বাই, দিল্লী, কলিকাতা,

মালয়, রেঙ্গুন ইত্যাদি অঞ্চল ব্যাপিয়া বিস্তৃত। ইহাদের মধ্যে কোন একটি বাজার মন্দা হইলেও বস্ত্রব্যবসায়ীর বিশেষ ক্ষতি হয় না। কারণ, অন্যান্য অঞ্চলে লাভ থাকার দরুণ কয়েকটি অঞ্চলের ক্ষতি পোষাইয়া যায়।

(৬) বৃহদায়তন শিল্পে উপজাত দ্রব্যের (By-Products) সদ্ব্যবহার হয়। যেমন টাটা কোম্পানীতে চুল্লী-নির্গত কয়লাজাত ধোঁয়া হইতে আলকাত্‌রা তৈয়ারী করা হয়।

বাহ্যিক সুবিধা : শিল্পের প্রসার ঘটিলে, সেই শিল্পের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি কতকগুলি সুবিধা ভোগ করে। যেমন, কোন অঞ্চলে একটি বিশেষ শিল্পের প্রসার ঘটিলে সেই অঞ্চলে দক্ষশ্রমিকের যোগান ও মূলধন প্রাপ্তির সুযোগ অব্যাহত থাকে। ফলে, শিল্পের অন্তর্গত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ইহার দ্বারা লাভবান হয়।

বৃহদায়তন শিল্পের সীমা : (Limits to Large Scale Production) :

বৃহদায়তন শিল্পের বিভিন্ন সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রত্যেক দেশেই ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। ইহার কারণ, শিল্পের আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা যায় না। প্রথমতঃ, উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন যদি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়, তবে, পরিচালনায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন বিভাগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয় যে সুষ্ঠু সংগঠনের পক্ষে তাহা অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন যদি অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পায়, তবে, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বাজারে চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা বেশী হইতে পারে। এই অবস্থায়, লাভজনক মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয় না। অতএব, বাজারের পরিধির দ্বারা উৎপাদন কেন্দ্রের আয়তন সীমায়িত ।

তৃতীয়তঃ, উৎপাদন কেন্দ্র অত্যধিক বৃহৎ হইবার পথে মূলধন প্রাপ্তির অসুবিধা বাধার সৃষ্টি করে। প্রয়োজনীয় সময়ে অভিপ্রেত মূলধনের অভাবে উৎপাদন কেন্দ্রের প্রসার ব্যাহত হয়।

চতুর্থতঃ, অনেক ক্ষেত্রে, উৎপাদন কেন্দ্রের সম্প্রসারণের জন্য বিক্রয় সংগঠনের দরুণ এত খরচ বহন করিতে হয় যে, উৎপাদন কেন্দ্রের প্রসারের পথে ইহা বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সুবিধা (Advantages of Small Scale Industries) :

ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে কয়েকটি সুবিধা দেখা যায়। প্রথমতঃ, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন কেন্দ্রের পরিচালক ব্যক্তিগতভাবে উৎপাদনের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান করিতে পারে। ইহার ফলে, অহেতুক অপচয়ের সম্ভাবনা হ্রাস পায় ও পরিচালনার ব্যয়-সঙ্কোচ হয়। পরিচালক প্রত্যেকটি কর্মীর প্রতি নজর দিতে পারে। ফলে কর্মীদের কাজে অবহেলা ঘটিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্রয়াতন উৎপাদন কেন্দ্রে পরিচালকের পক্ষে কোন ব্যাপারে সত্বর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব। কারণ, বৃহদায়তন শিল্পের মত, তাহাকে অনেকের মত গ্রহণ করিতে হয় না।

তৃতীয়তঃ, সৌখীন জিনিস (artistic goods) তৈয়ারীর ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন কেন্দ্রের একটি বিশেষ সুবিধা আছে। যে সমস্ত দ্রব্য ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি মাফিক করিতে হয়, সে সমস্ত দ্রব্য বৃহদায়তন শিল্পে প্রস্তুত হয় না। কারণ, বৃহদায়তন শিল্পে উৎপন্ন জিনিস বিশেষ বিশেষ ধরণের না হইয়া একই ধরণের হয়। কিন্তু, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন কেন্দ্রে কারিগর ক্রেতার ব্যক্তিগত রুচি অনুসারে বিশেষ ধরণের জিনিস তৈয়ারী করিয়া থাকে।

চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। মূলধনের অভাব ও শ্রমের প্রাচুর্য অনগ্রসর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। এই সকল দেশে শিল্পোন্নয়ন এমন হওয়া উচিত যাহাতে অধিক মূলধন নিয়োগকারী উৎপাদন পদ্ধতির (capital intensive) পরিবর্তে অধিক শ্রম নিয়োগকারী (labour intensive) শিল্পসমূহ স্থাপন করা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. What do you understand by division of labour? Indicate the advantages and disadvantages of division of labour.

(শ্রমবিভাগ বলিতে কি বুঝ? শ্রমবিভাগের সুফল এবং কুফল বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৩৯-৪২ দেখ)

2. 'Division of labour is limited by the extent of the market', Explain the statement.

('শ্রমবিভাগের মাত্রা বাজারের আয়তনের উপর নির্ভর করে', এই উক্তিটির তাৎপর্য কি?)

(পৃঃ ৪২ ও ৪৩ দেখ)

3. Describe the advantages of large-scale production. How is it that in spite of all these advantages of large-scale production, the small producer is still surviving ?

(বৃহদায়তনে উৎপাদনের সুবিধা বিবৃত কর। বৃহদায়তনের এত সুবিধা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র উৎপাদকের অস্তিত্ব বজায় থাকার হেতু কি ?) (পৃঃ ৪৩-৪৫ দেখ).

নবম অধ্যায়

চাহিদা ও যোগানের মূলসূত্রসমূহ
(Principles of Demand and Supply)

পরস্পর নির্ভরশীলতা সমাজবদ্ধ মানুষের বৈশিষ্ট্য। অর্থনৈতিক জীবনে ভোগব্যবহারকারী ও ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারীর মধ্যে এই পরস্পর নির্ভরশীলতা পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনকারী উৎপাদিত দ্রব্য অপরকে বিক্রয় করিয়া থাকে ; ভোগব্যবহারকারী তাহার অভাবপূরণের জন্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ কেনা-বেচার মাধ্যমে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে।

ক্রেতার কোন বস্তু ক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষাকে সেই বস্তুর চাহিদা (Demand) বলা হয়। তবে, শুধু আকাঙ্ক্ষা থাকিলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় না ; সেই বস্তুটি ক্রয় করিবার মত ক্রেতার আথিক ক্ষমতা না থাকিলে বস্তুর চাহিদাকে অর্থনৈতিক পরিভাষায় চাহিদা বলা সঙ্গত নয়। সুতরাং, ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা ও তাহার ক্রয় করিবার আথিক সামর্থ্যের উপর বস্তুর চাহিদা স্থির করা হয়। অপরপক্ষে, কোন দ্রব্যের উৎপাদনকারীর সেই দ্রব্যটি বিক্রয় করিবার আকাঙ্ক্ষাকে দ্রব্যটির যোগান (Supply) বলা হয়। কোন দ্রব্যের যোগান নির্ভর করে সাধারণতঃ সেই দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয় ও বাজার মূল্যের সম্বন্ধের উপর।

উপযোগিতা (Utility) :

অর্থনৈতিক পরিভাষায় কোন দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করার ক্ষমতাকেই সেই দ্রব্যের উপযোগিতা (Utility) বলে। কোন ব্যক্তির কোন জিনিসের প্রতি যদি চাহিদা থাকে এবং সেই জিনিসের যোগান যদি সীমাবদ্ধ হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কাছে সেই জিনিসের উপযোগিতা আছে। এই উপযোগিতার সহিত নীতিবোধের কোন সম্পর্ক নাই। কোন মদ্যপের যদি মদের চাহিদা থাকে, তাহা হইলে অন্ন বা বস্ত্রের ন্যায় তাহার নিকট মদেরও উপযোগিতা আছে। উপযোগিতা পরিমাপ করা হয় অর্থের মাধ্যমে। যেমন, কোন ব্যক্তি একটি বস্তুর জন্য যদি ১০৲ টাকা দিতে রাজী থাকে, তাহা হইলে তাহার নিকট সেই বস্তুটির উপযোগিতা দশ টাকার মত।

মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতা (Total and Marginal Utility) :

অর্থনৈতিক আলোচনায় মোট ও প্রান্তিক উপযোগিতার সম্বন্ধ নির্ণয় করার গুরুত্ব আছে। সমস্ত ক্রীত একক (unit) হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতার সমষ্টিকেই ক্রীত বস্তুটির মোট উপযোগিতা বলা হয়। ক্রয়ের শেষ একক (last unit) হইতে লব্ধ উপযোগিতাকেই প্রান্তিক উপযোগিতা বলা হয়। অতিরিক্ত এক একক ক্রয়ের ফলে মোট উপযোগিতায় যে বৃদ্ধি ঘটে, সেই বর্ধিত উপযোগই প্রান্তিক উপযোগ।

উদাহরণ : কোন ব্যক্তি এক-জোড়া জুতা ক্রয় করিবার জন্য ২০৲ টাকা দিতে ইচ্ছুক ; দ্বিতীয় জোড়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পাওয়ায় সে ইহা ১৬৲ টাকায় ক্রয় করিতে ইচ্ছুক ; তৃতীয় জোড়ার প্রতি আকাঙ্ক্ষা আরও হ্রাস পাওয়ায় সে ইহার জন্য ১২৲ টাকা দিতে প্রস্তুত। জুতার বাজার দর ১২৲ টাকা। সুতরাং, এই ক্ষেত্রে ক্রেতা চতুর্থ জোড়া ক্রয় করিবে না, কারণ চতুর্থ জোড়া হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা (১০৲ টাকার মত) বাজার দর (১২৲ টাকা) অপেক্ষা কম হইবে। অতএব, ক্রীত তিন জোড়া জুতার মোট উপযোগিতা হইল, (২০৲ + ১৬৲ + ১২৲ টাকা) = ৪৮৲ টাকা। এই ক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগিতা হইবে (২০৲ + ১৬৲ + ১২৲) − (২০৲ + ১৬৲) = ১২৲ টাকা।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র (Law of Diminishing Marginal utility) :

ক্রেতার কাছে কোন দ্রব্যের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই দ্রব্যের পূর্ব-

ক্রীত পরিমাণের উপর। ক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই দ্রব্যের অতিরিক্ত এককের প্রতি ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা হ্রাস পায়; ফলে, তাহার নিকট সেই দ্রব্যের অতিরিক্ত এককের উপযোগিতাও হ্রাস পায়। সুতরাং, ক্রেতা অতিরিক্ত এককের জন্য পূর্বাপেক্ষা কম মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকিবে। এইভাবে যত অতিরিক্ত একক ক্রীত হইবে, ততই ক্রেতার নিকট উপযোগিতা উত্তরোত্তর হ্রাস পাইবে এবং স্বভাবতঃই সে উত্তরোত্তর কম মূল্য দিতে চাহিবে। এইরূপে ক্রেতা এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌছায়, যখন ক্রীত অতিরিক্ত একক হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা সেই দ্রব্যের বাজারদরের সমান হয়।

উদাহরণ: পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতে প্রমাণ হয় যে, ক্রেতার ক্রীত জুতার পরিমাণ যতই বৃদ্ধি পাইতেছে, ততই অতিরিক্ত বা প্রান্তিক একক (Marginal unit) হইতে প্রাপ্ত উপযোগিতা হ্রাস পাইতেছে। যেমন, প্রথম জোড়া কিনিবার পর দ্বিতীয় জোড়ার উপযোগিতা ক্রেতার নিকট হ্রাস পাইয়াছে। এই ক্ষেত্রে, দ্বিতীয় জোড়া প্রান্তিক একক এবং প্রান্তিক উপযোগিতা, (২০৲+১৬)−২০৲=১৬৲ টাকা। দ্বিতীয় জোড়া কেনার দরুণ তৃতীয় জোড়ার প্রতি ক্রেতার আকাঙ্ক্ষা আরও হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগিতা (২০৲+১৬৲+১২৲)−(২০৲+১৬৲)=১২৲ টাকা। ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। ইহাকেই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র বলা হয়।

ভোগোদ্বৃত্ত (Consumer's Surplus):

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার সূত্র হইতেই ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি প্রমাণিত হয়। প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারাই বাজার মূল্য নির্ধারিত হয়। সুতরাং, প্রান্তিক একক ব্যতীত পূর্ববর্তী অন্যান্য এককের উপর ভোগ্য ব্যবহারকারীর উদ্বৃত্ত থাকে। ইহাই ভোগোদ্বৃত্ত। পূর্বোক্ত উদাহরণ হইতে বুঝা যায় যে, ক্রেতা ১২৲ টাকা মূল্যে তিন জোড়া জুতা ক্রয় করিয়াছে। অর্থাৎ, তাহার মোট ব্যয় হইয়াছে ৩৬৲ টাকা। কিন্তু সে তিন জোড়া জুতা ক্রয় করিবার জন্য ২০৲+১৬৲+১২৲=৪৮৲ টাকা দিতে

প্রস্তুত। অতএব, এক্ষেত্রে তাহার ভোগোদ্বৃত্ত ৪৮ – ৩৬৲ টাকা = ১২৲ টাকা।

চাহিদার সূত্র (Law of Demand) :

অর্থনৈতিক পরিভাষায় ব্যক্তির চাহিদা বলিতে নির্দিষ্ট দামে বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা বুঝায়। চাহিদা ও বাজার দরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কোন দ্রব্যের বাজার দর বৃদ্ধি পাইলে সেই দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায়, আবার, বাজার দর কমিলে দ্রব্যটির চাহিদা বৃদ্ধি পায়। মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার কতখানি (Quantitative) পরিবর্তন হয়, তাহা এই সূত্র পরিমাপ করে না। অর্থাৎ, কোন দ্রব্যের বাজার দর শতকরা তিনভাগ বৃদ্ধি পাইলে সেই দ্রব্যের চাহিদা শতকরা কতখানি হ্রাস পাইবে, তাহা এই সূত্র আলোচনা করে না। চাহিদা সূত্র শুধু প্রমাণ করে যে, সাধারণতঃ দ্রব্যের বাজার দরের সহিত দ্রব্যটির চাহিদার বিপরীত সম্পর্ক (Inverse Relation) আছে।

প্রথমতঃ, চাহিদার সূত্রটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম হইতে স্বতঃই প্রমাণিত হয়। কোন দ্রব্যের বাজারমূল্য ক্রীত দ্রব্যটির প্রান্তিক উপযোগিতার সমান। অতএব, দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার নিকট দ্রব্যটির শেষ বা প্রান্তিক এককের উপযোগিতা এই বর্ধিত মূল্য অপেক্ষা কম হইবে। ফলে, পূর্বের ন্যায় ক্রেতা শেষ এককটি ক্রয় করিবে না। অর্থাৎ, ক্রেতার চাহিদা হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ হিকস্ (Hicks) বলেন যে, দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন হয়; এবং এই দ্রব্যের মূল্যের সহিত ইহার পরিবর্ত দ্রব্যের (Substitute) মূল্যের সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। এই দুইটি কারণে, দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তন হইয়া থাকে। ইহাকে মূল্য পরিবর্তনের ফলে চাহিদার উপর (১) আয় প্রভাব (Income Effect) ও (২) পরিবর্ত প্রভাব (Substitution Effect) বলা হয়।

উদাহরণঃ (১) যখন প্রতি পাউণ্ড চায়ের মূল্য ৬৲ টাকা, তখন কোন একজন ক্রেতা পাঁচ পাউণ্ড চা ক্রয় করে অর্থাৎ, তাহার মোট খরচ হয় ৩০৲ টাকা। চায়ের মূল্য কমিয়া প্রতি পাউণ্ড ৫৲ টাকা হইলে এবং ক্রেতা পূর্বের মত পাঁচ পাউণ্ড চা কিনিতে মনস্থ করিলে, তাহার মোট খরচ হইবে

২৫৲ টাকা। অতএব, এই ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে ক্রেতার আয় ৫৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে বলা যায়। এই প্রকৃত আয় (Real Income) বৃদ্ধির ফলে, পূর্বাপেক্ষা চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে আশা করা যায়।

উদাহরণ: (২) চা ও কফি পরিবর্ত দ্রব্য। ধরা যাউক, প্রতি পাউণ্ড চা ও কফির মূল্য ৬৲ টাকা। এই অবস্থায় যদি কফির মূল্য কমিয়া ৫৲ টাকা হয়, তাহা হইলে অনেক চা পানকারী বর্তমানে চা ছাড়িয়া কফি পান করিবে। অতএব, কফির মূল্য কমিবার ফলে, কফির চাহিদা বাড়িবে ও চায়ের চাহিদা কমিবে।

চাহিদার সূত্রের ব্যতিক্রম (Limitations of the Law of Demand):

উল্লিখিত চাহিদার নিয়মের কতকগুলি ব্যতিক্রম আছে: (১) ক্রেতার রুচির পরিবর্তন ঘটিলে এই নিয়ম নাও খাটিতে পারে। যেমন, কোন ব্যক্তি চা-ই পান করিত। সম্প্রতি সেই ব্যক্তির চা অপেক্ষা কফির প্রতি স্পৃহা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষেত্রে চায়ের মূল্য হ্রাস পাইলেও সে চা বেশী ক্রয় করিবে না।

(২) ক্রেতার আয়ের পরিবর্তন ঘটিলে চাহিদার নিয়মের সাধারণতঃ ব্যতিক্রম হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির আয় যখন ২০০৲, তখন সে চার সের দুধ ক্রয় করে, তাহার আয় বৃদ্ধি পাইয়া ৩০০৲ টাকা হইলে সে পূর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ দুধ ক্রয় করিবে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, যে, দুধের দর অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও দুধের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) সম্মানসূচক দ্রব্যের (articles of conspicuous consumption) ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্যকরী নাও হইতে পারে। হীরক অলঙ্কার অভিজাত মহিলাদের বিশেষ সম্মানসূচক সামগ্রী। ইহার মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদা সাধারণতঃ অপরিবর্তিত থাকে।

(৪) নিতান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন, চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয় না। চাউল এত অপরিহার্য দ্রব্য যে ক্রেতা অন্যান্য ব্যয়সংক্ষেপ করিয়াও বর্ধিত মূল্যে পূর্বের পরিমাণের মতই চাউল কিনিয়া থাকে।

(৫) যে সমস্ত দ্রব্য (যথা, লবণ) ক্রয় করিতে ক্রেতার আয়ের নিতান্ত

সামান্য অংশ ব্যয়িত হয়, সে সমস্ত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না।

(৬) সুতীব্র মুদ্রাস্ফীতির সময় (Period of Hyper-inflation) চাহিদার সূত্র নাও কার্যকরী হইতে পারে। এই সময় দ্রব্যমূল্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি আশঙ্কা করা হয়। ফলে, মূল্যবৃদ্ধি সত্ত্বেও ক্রেতারা অধিকতর পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করে।

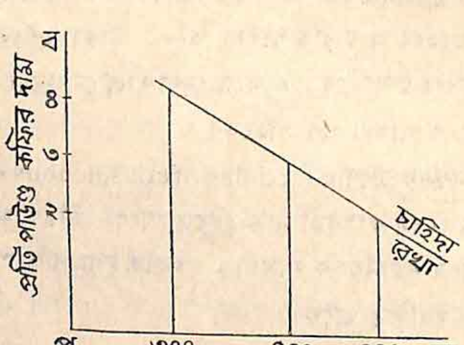
চাহিদা তালিকা (Demand Schedule) :

চাহিদার পরিমাণ মূল্যের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন মূল্যে কোন বস্তুর চাহিদা কিরূপ হইবে, তাহা চাহিদা তালিকার সাহায্যে দেখান যায় :

প্রতি পাউণ্ড কফির মূল্য	বাজারে চাহিদার পরিমাণ
৪৲	৩০০ পাউণ্ড
৩৲	৪০০ পাউণ্ড
২৲	৪৭৫ পাউণ্ড

উপরোক্ত চাহিদা তালিকা হইতে প্রমাণ হয় যে, কফির বাজার দর হ্রাস পাইবার সঙ্গে সঙ্গে কফির চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চাহিদার সূত্রটি নিম্নলিখিত রেখা-চিত্র দ্বারা বুঝান যায় :



কফির চাহিদার পরিমাণ

উপরের চিত্র হইতে বুঝা যায় যে, কফির দাম যত কমিতেছে, উহার চাহিদা তত বৃদ্ধি পাইতেছে।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Demand) :

মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার পরিবর্তন হয়—ইহা চাহিদার সূত্র হইতে বুঝা যায়। কিন্তু, এই চাহিদার পরিবর্তনের পরিমাপ করা হয় স্থিতিস্থাপকতার তত্ত্বটির দ্বারা। মূল্য পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন বস্তুর চাহিদার পরিবর্তনের হার বিভিন্ন রূপ হয়। কখনও, মূল্যের স্বল্প পরিবর্তনের ফলে, চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয়, আবার কোন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে মূল্যের পরিবর্তনের ফলে, চাহিদার পরিবর্তন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না। কোন বস্তুর মূল্য যে হারে পরিবর্তিত হয়, ঠিক সেই হারে যদি চাহিদার পরিমাণও পরিবর্তিত হয়, তবে বস্তুটির চাহিদার এই সমানুপাতিক পরিবর্তনকে একক স্থিতিস্থাপকতা (unit elasticity) বলা হয়। যখন কোন বস্তুর স্থিতিস্থাপকতা একক (unit) অপেক্ষা অধিক হয়, তখন, বস্তুটির চাহিদাকে স্থিতিস্থাপক (elastic demand) বলা হয়। ইহার অর্থ হইল যে, বস্তুটির মূল্য যে হারে পরিবর্তিত হয়, তদপেক্ষা অধিক হারে ইহার চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয়। অস্থিতিস্থাপক চাহিদা (Inelastic demand) বলিতে আমরা বুঝি যে, কোন বস্তুর মূল্য যে হারে পরিবর্তিত হয়, তদপেক্ষা কম হারে ইহার চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয়।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ (Measurement of elasticity of demand) :

কোন বস্তু ক্রয় করার জন্য যে মোট অর্থ ব্যয় হয়, তাহার মাধ্যমেই চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার পরিমাপ করা যায়।

তালিকা—১

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪৲	৪০০ পাউণ্ড	১৬০০৲
২৲	৮০০ পাউণ্ড	১৬০০৲
১৲	১৬০০ পাউণ্ড	১৬০০৲

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় নাই। ইহা বস্তুটির চাহিদার একক স্থিতিস্থাপকতার উদাহরণ।

তালিকা—২

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪\	৪০০ পাউণ্ড	১৬০০\
২\	৯০০ পাউণ্ড	১৮০০\
১\	১৯০০ পাউণ্ড	১৯০০\

এক্ষেত্রে মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অতএব, ইহা স্থিতিস্থাপক চাহিদার উদাহরণ।

তালিকা—৩

প্রতি পাউণ্ডের দাম	চাহিদার পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪\	৪০০ পাউণ্ড	১৬০০\
২\	৭০০ পাউণ্ড	১৪০০\
১\	১২০০ পাউণ্ড	১২০০\

উপরোক্ত তালিকায় মূল্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয় হ্রাস পাইয়াছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে, বস্তুর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক।

চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার উপাদান (Factors on which Elasticity of Demand depends) :

(ক) বস্তুর প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। কোন বস্তু মানুষের অবশ্য প্রয়োজনীয়, আবার কোন বস্তু বিলাস সামগ্রী মাত্র। অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর (চাউল, তৈল, আটা প্রভৃতি) মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় না ; কারণ, এগুলি জীবনধারণের জন্য অপরিহার্য। অপরপক্ষে, বিলাস সামগ্রীর (রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি) মূল্য বৃদ্ধি পাইলে চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় ; কারণ, ইহার অভাবে মানুষের জীবনধারণ অসম্ভব হয় না। অতএব, অতিপ্রয়োজনীয় বস্তুর চাহিদা অস্থিতিস্থাপক এবং বিলাস সামগ্রীর চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

(খ) কোন দ্রব্যের উৎকৃষ্ট পরিবর্ত (Perfect Substitutes) থাকিলে, সেই দ্রব্যের চাহিদা স্থিতিস্থাপক হইবে। যেমন বাসের ভাড়ার তুলনায়

ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি পাইলে, ট্রামযাত্রীর সংখ্যা বিশেষ হ্রাস পায়। ট্রাম-যাত্রীদের অনেকেই এখন বাসে যাতায়াত করিবে।

(গ) কোন বস্তু যদি নানাবিধ কাজে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে, তাহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির বিভিন্ন ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন, ইহার দ্বারা গৃহ আলোকিত করা, কাপড় ইস্ত্রি করা, রন্ধন কার্য করা ইত্যাদি হইয়া থাকে। সুতরাং বৈদ্যুতিক শক্তির মূল্য স্বল্প হ্রাস পাইলে চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে।

(ঘ) ব্যক্তির আয়ের উপর চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভরশীল। মাংসের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে ধনীদের ক্ষেত্রে ইহার চাহিদার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু গরীবদের পক্ষে বর্ধিত মূল্যে মাংস ক্রয় করা কষ্টসাধ্য হয় বলিয়া, তাহাদের ক্ষেত্রে চাহিদার বিশেষ পরিবর্তন হয়। সুতরাং ধনীদের ক্ষেত্রে মাংসের চাহিদা অস্থিতিস্থাপক ; অপরপক্ষে গরীবদের ক্ষেত্রে ইহার চাহিদা স্থিতিস্থাপক।

(ঙ) দ্রব্যের মূল্যস্তরের উপরও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা নির্ভর করে। কোন অল্পদামী ঝরণা কলমের দাম যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ইহার চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় না ; কারণ, এক্ষেত্রে ব্যক্তির মোট ব্যয়ের পরিমাণ নগণ্য। কিন্তু, যদি পার্কার ঝরণা কলমের মত মূল্যবান কলমের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ইহার চাহিদা বিশেষ হ্রাস পায় ; কারণ, এক্ষেত্রে ব্যক্তির মোট ব্যয়ের পরিমাণ যথেষ্ট।

উৎপাদন ব্যয় ও যোগান (Cost of Production and Supply) ঃ

কোন বস্তুর উৎপাদন ব্যয় বলিতে সেই বস্তুটি উৎপাদন করিতে যাহা খরচ হয় তাহাকে বুঝায়। উৎপাদন ব্যয়ের উপর যোগান নির্ভরশীল। উৎপাদন ব্যয়ের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিলে যোগানেরও হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা যোগান নিয়ন্ত্রিত হয় দুই উপায়ে ; প্রথমতঃ, কোন উৎপাদন কেন্দ্রের (Firm) লাভজনক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়ের উপর। দ্বিতীয়তঃ, কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন-কেন্দ্রের সংখ্যাও নির্ভর করে উৎপাদন ব্যয়ের উপর। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে, কোন একটি উৎপাদন-কেন্দ্রের উৎপাদনের পরিমাণ সঙ্কুচিত হইবে। আবার, উৎপাদন ব্যয় বর্ধিত হইলে একটি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি উৎপাদন-কেন্দ্রের

পক্ষে লাভজনক উৎপাদন করা সম্ভব হইবে না। এই তুইটি কারণে, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনের পরিমাণ বা যোগান হ্রাস পায়।

যোগানের সূত্র (Law of Supply) ঃ

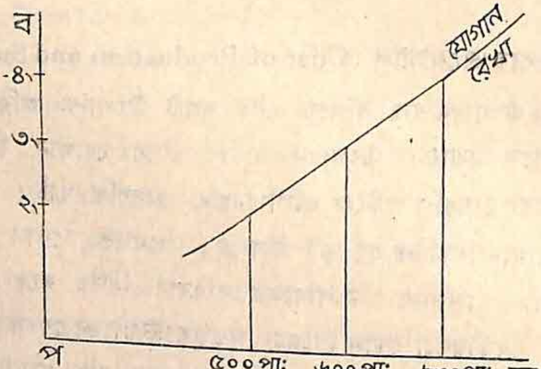
কোন দ্রব্যের যোগান শুধুমাত্র উৎপাদন ব্যয়ের উপরই নির্ভরশীল নয়; ইহা দ্রব্যের মূল্যের উপরও নির্ভরশীল। দ্রব্যের মূল্য ও যোগানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক দেখা যায়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদন অধিকতর লাভজনক হয়, ফলে যোগান বৃদ্ধি পায়; অপরপক্ষে মূল্য হ্রাস পাইলে উৎপাদন পূর্বের মত লাভজনক হয় না, স্থতরাং যোগান হ্রাস পায়। ইহাই যোগানের স্থত্র।

চাহিদা-তালিকার মত যোগানেরও তালিকা প্রস্তুত করা যায়। নিম্নের তালিকার সাহায্যে বিভিন্ন মূল্যে যোগানের অবস্থা দেখান যায় ঃ

প্রতি পাউণ্ডের দাম	যোগানের পরিমাণ
৪৲	৮০০ পাউণ্ড
৩৲	৬০০ পাউণ্ড
২৲	৫০০ পাউণ্ড

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, মূল্য কমিলে যোগান কমে ও মূল্য বাড়িলে যোগান বাড়ে।

উপরোক্ত যোগান তালিকাটির নিম্নাঙ্কিত রেখা-চিত্রের দ্বারা দেখান যায় ঃ



উপরের রেখা-চিত্রে দেখা যায় যে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায়, মূল্য হ্রাস পাইলে যোগান হ্রাস পায়।

কিন্তু, কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে যোগান বৃদ্ধি নাও পাইতে পারে। উৎপাদন যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়মের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে যোগান নাও বাড়িতে পারে। মূল্য যতখানি বাড়িয়াছে তদপেক্ষা অধিক খরচে যদি অতিরিক্ত উৎপাদন চালাইতে হয়, তবে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও যোগান বাড়িবে না।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity of Supply) :

মূল্য যে হারে পরিবর্তিত হয়, তদপেক্ষা অধিক হারে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তিত হইলে যোগান স্থিতিস্থাপক (Elastic) বলা যায়; অপরপক্ষে, অনুরূপ মূল্য পরিবর্তনের ফলে যোগানের পরিবর্তনের হার মূল্য পরিবর্তনের হার অপেক্ষা কম হইলে যোগান অস্থিতিস্থাপক (Inelastic) বলা হয়।

যোগানের স্থিতিস্থাপকতা কয়েকটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, কোন ব্যবসায়ী যদি একাধিক বিক্রয় কেন্দ্রে (market) পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করে, তবে একটি বিক্রয় কেন্দ্রে তাহার পণ্যদ্রব্যের যোগান স্থিতিস্থাপক হইবার সম্ভাবনা আছে। একটি বিক্রয়কেন্দ্রের দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাইলে বিক্রয়কেন্দ্রটি হইতে অন্যত্র তাহার পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরিত করিবে। ইহাতে প্রথম বিক্রয়কেন্দ্রের যোগান বিশেষ হ্রাস পাইবে। অতএব, প্রথম বিক্রয়কেন্দ্রে যোগান স্থিতিস্থাপক। দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের উপাদানসমূহ যদি সহজেই পাওয়া যায়, তাহা হইলে যোগান স্থিতিস্থাপক হয়। কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে তাহার যোগান বৃদ্ধি পাইবে, যদি সেই দ্রব্য উৎপাদনের উপাদানগুলি সহজেই সংগ্রহ করা যায়।

যোগান নির্ধারক উপাদানসমূহ (Factors Governing Supply) :

সামগ্রীর যোগান প্রধানতঃ নিম্নলিখিত উপাদানের উপর নির্ভরশীল :

(ক) উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা যোগান নিয়ন্ত্রিত হয়। উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে যোগান হ্রাস পায় ও উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইলে যোগান বৃদ্ধি পায়।

(খ) সামগ্রীর যোগান মূল্যের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত হয়। মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাসের উপর যোগানের বৃদ্ধি ও হ্রাস নির্ভরশীল।

(গ) উৎপাদনের উপাদানসমূহের যোগানের উপর উৎপন্ন দ্রব্যের

যোগান নির্ভর করে। উপাদানসমূহ সহজে পাওয়া গেলে যোগান সহজে বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(ঘ) ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এই আশায় যদি ব্যবসায়ীরা উৎপন্ন দ্রব্য গুদাম-জাত করিয়া রাখে, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও যোগান বৃদ্ধি পাইবে না।

প্রশ্নাবলী

1. What is demand ? How is the demand for a thing related to its utility and its market price ? (পৃঃ ৪৭ ও ৫০ দেখ।)

(চাহিদা বলিতে কি বুঝ ? কোন বস্তুর চাহিদা, উহার উপযোগ এবং বাজার দরের মধ্যে কি সম্পর্ক ?) (পৃঃ ৪৮, ৪৯ ও ৫০ দেখ।)

2. Explain the law of diminishing utility. Use this law to derive the law of demand.

(ক্রমিক উপযোগ হ্রাসের নিয়মটি ব্যাখ্যা কর। এই নিয়মের সাহায্যে চাহিদার নিয়মটি প্রতিপন্ন কর।)

3. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price to increase it.

(বাজার দরের বৃদ্ধি হইলে চাহিদা কেন কমে এবং বাজার দর হ্রাস পাইলে চাহিদা কেন বাড়ে সে সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।) (পৃঃ ৫০ ও ৫১ দেখ।)

4. How will you distinguish between an increase and decrease, and a rise and fall, in demand ?

(চাহিদার সংকোচন ও প্রসারণ, চাহিদার হ্রাস ও বৃদ্ধি, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য কি ?)

5. What do you understand by elasticity of demand ? How can you find out whether the demand for a thing is elastic or inelastic ?

(চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ? একটি বিশেষ বস্তুর চাহিদা স্থিতিস্থাপক কিংবা অস্থিতিস্থাপক তাহা কিরূপে নির্ণয় করিবে ?) (পৃঃ ৫৩ ও ৫৪ দেখ।)

6. What are the factors governing the elasticity of demand for a commodity ?

(চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা যে যে বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের একটি বিবরণ দাও।)
(পৃঃ ৫৪ ও ৫৫ দেখ।)

7. State the law of supply. What do you understand by elasticity o' supply ?

(যোগানের নিয়মটি বিবৃত কর। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা বলিতে কি বুঝ ?)
(পৃঃ ৫৬ ও ৫৭ দেখ।

8. Why does the supply of a thing generally increase as its price increases and diminish as the price falls?

(সাধারণতঃ দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যোগান কেন বাড়ে এবং দাম কমিলে যোগান কেন কমিয়া যায় ?) (পৃঃ ৫৬ দেখ ।)

9. What do you understand by the supply price of a thing? How is it related to the cost of production?

(বস্তুর যোগান বলিতে কি বুঝ ? বস্তুর উৎপাদন ব্যয়ের সহিত ইহার সম্পর্ক কি ?)

(পৃঃ ৫৫ ও ৫৬ দেখ।

দশম অধ্যায়

মূল্য নির্ধারণ
(Price determination)

ভূমিকা :

মানুষের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা সীমাহীন ; কিন্তু অভাব মিটাইবার সামগ্রী অপ্রচুর। পরিমিত সামগ্রীর সাহায্যে অপরিমিত অভাব সন্তুষ্টির যে সমস্যা তাহাই অর্থনীতির কেন্দ্র বস্তু। অর্থাৎ, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন অর্থনীতির মূল সমস্যা। মূল্য নির্ধারণের (Pricing) মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয়। যদি যোগান স্থির থাকে, এবং চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য বৃদ্ধি পায় ; ফলে চাহিদা হ্রাস পায় এবং চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্য পুনঃস্থাপিত হয়। অপর পক্ষে, যদি চাহিদা স্থির থাকে, এবং যোগান বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মূল্য কমিয়া যায়। ফলে, যোগান হ্রাস পায় এবং যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বাজার (Market) :

স্বভাবতঃই মূল্য নির্ধারিত হয় একটি নির্দিষ্ট বাজারে। 'বাজার' অর্থে সাধারণতঃ মনে করা হয় একটি নির্দিষ্ট কেনা-বেচার কেন্দ্রকে, যেমন,

শিয়ালদহ বাজার, কলেজস্ট্রীট বাজার, গড়িয়াহাট বাজার। কিন্তু অর্থনীতিতে ইহার একটি বিশেষ অর্থ আছে। কোন নির্দিষ্ট কেনা-বেচার কেন্দ্রকে অর্থনীতির ভাষায় বাজার বলে না। অর্থনীতিতে বাজার বলিতে কোন বস্তুর ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে সম্পর্ককে বুঝায়। ক্রেতা-বিক্রেতার সম্পর্ক কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়মমাফিক, সুনির্দিষ্ট ও সুসংগঠিত হইতে পারে, যেমন, স্টক্ এক্সচেঞ্জ। আবার, কোন কোন বস্তুর ক্ষেত্রে বাজার সুসংগঠিত নয়, যেমন ব্যবহৃত মোটর গাড়ীর বাজার।

কোন বস্তুর বাজারের আয়তন নির্ভর করে কয়েকটি উপাদানের উপর। প্রথমতঃ, বস্তুটির চাহিদা বেশী হইলে বাজারের আয়তনও বড় হইবে। দ্বিতীয়তঃ, বস্তুটি টেকসই (Durable) ও সহজে বহনযোগ্য (Portable) হইলে বাজার বিস্তৃত হয়। যেমন, সোনা, রূপা ইত্যাদি। তৃতীয়তঃ, বস্তুটির নমুনার সাহায্যে সহজেই যদি চেনা সম্ভব হয়, তাহা হইলে সে বস্তুর বাজারের পরিধি বিস্তৃত হইবে, যেমন, পাট, তুলা ইত্যাদি।

পূর্ণ প্রতিযোগিতা ও মূল্য নি . । Perfect Competition and Price-Fixation) :

জিনিসের মূল্য বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপে নির্ধারিত হয়। কোন বস্তুর ক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতা আছে বলিতে বুঝায় যে, প্রথমতঃ, বস্তুটির ক্রেতা ও বিক্রেতা বহুসংখ্যক। দ্বিতীয়তঃ, সমস্ত বিক্রেতা সমজাতীয় (Homogeneous) বস্তু বিক্রয় করে, অর্থাৎ, বিক্রীত দ্রব্যের মধ্যে কোন প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। তৃতীয়তঃ, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই বাজারের অবস্থা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার উপরোক্ত সর্তগুলি হইতে সুস্পষ্ট হয় যে, বাজারে কোন বস্তুর কেনা-বেচা একটি মাত্র মূল্যেই হইবে। ইহার কারণ, কোন বিক্রেতা যদি বাজার দর অপেক্ষা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে চাহে, তাহা হইলে ক্রেতা সেই বিক্রেতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিক্রেতার কাছ হইতে কিনিবে। ফলে, প্রথম বিক্রেতা মূল্য বাড়াইতে পারিবে না।

মূল্য নির্ধারণ : বস্তুর যোগান ও চাহিদার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া মূল্য নির্ধারিত হয়। যোগানের পরিমাণ নির্ভর করে বস্তুর মূল্য ও উৎপাদন ব্যয়ের উপর। উৎপাদন ব্যয় স্থির থাকিলে এবং মূল্য বৃদ্ধি পাইলে যোগানও

বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, চাহিদা নির্ভর করে বস্তুর মূল্য ও ক্রেতার নিকট বস্তুর উপযোগিতার উপর। ক্রেতার নিকট বস্তুর উপযোগিতা যদি স্থির থাকে, অথচ মূল্য বৃদ্ধি পায়, তবে, বস্তুটির চাহিদা হ্রাস পায়।

এখন, বিভিন্ন মূল্যে বস্তুর যোগানের পরিমাণ কিরূপ হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করা যায়। ইহাকে যোগান তালিকা বলে। অনুরূপভাবে, বিভিন্ন মূল্যে বস্তুর চাহিদার পরিমাণ কিরূপ হইবে তাহারও একটি তালিকা প্রস্তুত করা যায়। ইহাকে বলা হয় চাহিদা তালিকা। ক্রেতারা যে দামে জিনিস কিনিতে চাহে তাহাকে বলে চাহিদা মূল্য ; এবং বিক্রেতারা যে দামে বিক্রয় করিতে চাহে তাহাকে বলে যোগান মূল্য। উৎপাদনের পরিমাণ যদি এমন হয় যে, চাহিদা মূল্য যোগান মূল্য অপেক্ষা অধিক, তাহা হইলে বিক্রেতাদের লাভ বাড়িবে। ফলে, যোগান বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে, চাহিদা মূল্য যোগান মূল্য অপেক্ষা কম হইলে, বিক্রেতাদের লাভ কমিয়া যাইবে। ফলে, যোগান হ্রাস পাইবে। এই ঘাত-প্রতিঘাতের মাধ্যমে যখন চাহিদা মূল্য ও যোগান মূল্য সমান হয়, তখন বস্তুর উৎপাদনের পরিমাণে হ্রাস-বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায় না। এই অবস্থাকে ভারসাম্য অবস্থা (Equilibrium) বলে। যে মূল্যে যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমতা স্থাপিত হয় তাহাকে ভারসাম্য-মূল্য (Equilibrium price) বলা হয় ; এবং এই মূল্যে উৎপাদনের পরিমাণকে ভারসাম্য পরিমাণ (Equilibrium amount) বলা হয়।

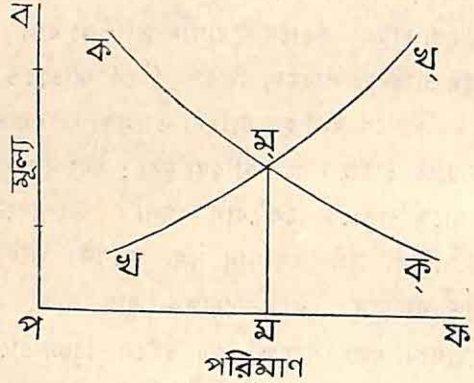
একটি উদাহরণের সাহায্যে উপরোক্ত তত্ত্বটি বুঝান যায় :

চাহিদার পরিমাণ	মূল্য	যোগানের পরিমাণ
৪০০ পাউণ্ড	৮৲	৬০০ পাউণ্ড
৪৫০ পাউণ্ড	৭৲	৫৭৫ পাউণ্ড
৫০০ পাউণ্ড	৬৲	৫০০ পাউণ্ড
৬০০ পাউণ্ড	৫৲	৪০০ পাউণ্ড
৭০০ পাউণ্ড	৪৲	২০০ পাউণ্ড

উপরের তালিকা হইতে বুঝা যায় যে, ৬৲ টাকা মূল্যে যোগান ও চাহিদার পরিমাণ সমান হয়। অতএব, ইহা ভারসাম্য মূল্য এবং এই মূল্যে চাহিদা যোগানের পরিমাণ ভারসাম্য পরিমাণ। যখন, মূল্য ৭৲ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ অপেক্ষা যোগানের পরিমাণ বেশী ; অপর পক্ষে, যখন

মূল্য ৪৲, তখন চাহিদার পরিমাণ যোগানের পরিমাণ অপেক্ষা বেশী। সুতরাং ৭৲ টাকা বা ৪৲ টাকা ভারসাম্য মূল্য হইতে পারে না।

নিম্নলিখিত রেখা-চিত্রের সাহায্যেও মূল্য নির্ধারণের তত্ত্ব বুঝান যায়।



উপরের রেখা-চিত্রে কক্ চাহিদা-রেখা এবং খখ্ যোগান-রেখা। এই দুইটি রেখা হইতে বিভিন্ন মূল্যে বস্তুর চাহিদা ও যোগানের অবস্থা বোঝা যায়। রেখা-চিত্রটিতে মম্ মূল্যে চাহিদা ও যোগান উভয়েরই পরিমাণ পম। অতএব মম্ ভারসাম্য মূল্য এবং পম ভারসাম্য পরিমাণ।

মূল্য নির্ধারণে সময়ের গুরুত্ব (Importance of time element in price determination) :

সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ মার্শাল মূল্য নির্ধারণে সময়ের গুরুত্বের প্রতি সর্বপ্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মূল্য নিরূপণে তিনি তিনটি সময়-বিভাগের কথা উল্লেখ করেন :

প্রথমতঃ, অতি অল্প সময়ে কোন বস্তুর যোগান স্থির ও নির্দিষ্ট থাকে, এই সময়ে বস্তুর মূল্যকে বাজার মূল্য (market price) বলা হয় ;

দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ সময়ে যখন উৎপাদনের হার কিছুটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, কিন্তু উৎপাদনের যন্ত্রপাতির পরিবর্তন করা যায় না, সেই সময়ের মূল্যকে স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য (short-run normal price) বলে।

তৃতীয়তঃ, সুদীর্ঘ সময়ে যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন হারের বিশেষ পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। এই সময়ের বস্তুর মূল্যকে দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য (long-run normal price) বলা হয়।

বাজার মূল্য ঃ অতি অল্প সময়ে (যেমন, একটি দিনে) কোন বস্তুর যোগান অপরিবর্তিত থাকে। দৈনন্দিন বাজারে দেখা যায় যে, শাকসব্জী, মাছ, মাংস ইত্যাদি বস্তুর যোগান সুনির্দিষ্ট থাকে। এই সমস্ত বস্তু দিনের মধ্যেই না বিক্রয় করিলে নষ্ট হইয়া যায়। অতএব, এই সব বস্তুর মূল্য নির্ধারণে চাহিদার গুরুত্বই বেশী। যদি কোন একদিন চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে, যদি চাহিদা হ্রাস পায় তবে, বাজার মূল্য হ্রাস পাইবে। অতএব, অপরিবর্তিত যোগান ও পরিবর্তনশীল চাহিদার মধ্যে বাজার মূল্য সামঞ্জস্য বিধান করে। এই অবস্থা বাজারে সাময়িক ভারসাম্য (Temporary Equilibrium) সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে কিন্তু, যোগানের প্রভাব বাজারে পরিলক্ষিত হয়।

স্বল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য ঃ স্বল্প সময়ের (কয়েক মাসের) মধ্যে উৎপাদনের পরিমাণ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধির মাধ্যমে যোগানের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই সময়ে কিন্তু উৎপাদনের হার বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু বৃদ্ধির পরিমাণ যথেষ্ট হয় না। এই বর্ধিত উৎপাদনের ফলে যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং মূল্য ইহার দ্বারা প্রভাবিত হইবে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শাল একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করিয়াছেন ঃ কোন একদিন বাজারে মাছের চাহিদা বৃদ্ধির দরুণ মাছের মূল্য হঠাৎ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহার ফলে, মৎস্য ব্যবসায়ীরা যোগান বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে। জাল, নৌকা প্রভৃতি যে সমস্ত সরঞ্জাম মৎস্য ব্যবসায়ীদের বর্তমানে আছে তাহাদের সাহায্যে মৎস্যের উৎপাদন কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব। অতএব, বাজারে মৎস্যের যোগানও কিছু বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহার প্রভাব বাজারে মৎস্যের মূল্য নির্ধারণে পরিলক্ষিত হইবে।

দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য ঃ সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে যন্ত্রপাতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যবসায়ী উৎপাদন হারের যথেষ্ট পরিবর্তন করিতে পারে। ফলে, বাজারে সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বস্তুর যোগান বিশেষ পরিবর্তন করা সম্ভব। সুতরাং সুদীর্ঘ সময়ে, মূল্য নির্ধারণে যোগানের প্রভাব

বিশেষ পরিলক্ষিত হয়। স্বল্প সময়ে কোন বস্তুর মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে; উৎপাদন ব্যয় মূল্য অপেক্ষা অধিক হইতে পারে। ফলে, ব্যবসায়ীর লোকসান হইবার আশঙ্কা থাকে। কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানে ব্যবসায়ী এইরূপ লোকসান বহন করিয়া ব্যবসা চালাইতে পারে না। সুতরাং, দীর্ঘ সময়ে দ্রব্যের মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে, তাহা না হইলে ব্যবসায়ীকে উৎপাদন বন্ধ করিতে হয়।

বাজার মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্যের সম্পর্ক (Relation between Market Price and Normal Price) :

চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে বস্তুর মূল্য স্থিরীকৃত হয়। সময়ের ব্যবধানে চাহিদা ও যোগানের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

অতি অল্প সময়ে (যেমন একদিনে) যোগানের পরিমাণ প্রায় অপরিবর্তনীয় থাকে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যোগানের পরিমাণ পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। ফলে, অতি অল্প সময়ে বস্তুর মূল্য চাহিদার দ্বারাই প্রধানতঃ প্রভাবিত হয়; উৎপাদন ব্যয়ের বিশেষ প্রভাব থাকে না। ক্রেতার নিকট বস্তুর প্রান্তিক উপযোগিতার উপর চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করে। সুতরাং স্বল্প সময়ে বাজার মূল্য বস্তুর প্রান্তিক উপযোগিতার দ্বারা নিরূপিত হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে মূল্য এরূপ বৃদ্ধি পায়, যে মূল্য অপেক্ষা উৎপাদন কম হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভ হইয়া থাকে।

অপর পক্ষে, চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে মূল্য যদি এরূপ কমিয়া যায় যে, উৎপাদন ব্যয় মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ব্যবসায়ীদের লোকসান হইবে। সুতরাং দেখা যায় যে, অতি অল্প সময়ে বাজার মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান নাও হইতে পারে।

দীর্ঘকালের ব্যবধানে যোগানের প্রভাব মূল্য নিরূপণের ক্ষেত্রে বিশেষ পরিলক্ষিত হয়; অর্থাৎ, উৎপাদন ব্যয়ের দ্বারা বস্তুর মূল্য নির্ধারিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। যদি স্বল্প সময়ে আকস্মিক চাহিদা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভ হইতে থাকে, তাহা হইলে, নূতন ব্যবসায়ীরা লাভের প্রত্যাশায় এই ব্যবসায়ে অনুপ্রবেশ করিবে। ইহাতে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, মূল্য হ্রাস পাইবে এবং ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত লাভ

আর থাকিবে না। ফলে, দীর্ঘকালের ব্যবধানে মূল্য উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইবে। স্বল্প সময়ের মধ্যে আকস্মিক চাহিদা হ্রাসের ফলে ব্যবসায়ীদের লোকসান হইলে উৎপাদন হ্রাস পায়। ইহাতে বাজারে যোগান কমিয়া যাওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন ব্যয়ের সমান হয়। কোন বস্তুর মূল্য দীর্ঘকালীন ব্যবধানে উৎপাদন ব্যয়ের সমান হইলে ইহাকে স্বাভাবিক মূল্য বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Show how the equilibrium price under perfect competition is determined by the inter-action of the forces of demand and supply.

(পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের টানাপোড়েনের ফলে কিভাবে সমতাবিধায়ক দর স্থির হয় তাহা দেখাও।) (পৃঃ ৬০-৬২ দেখ)

2. Explain how market price is determined under perfect competition.

(পূর্ণ প্রতিযোগিতার আওতায় বাজার দর কিরূপে নির্ধারিত হয় তাহার বিশদ আলোচনা কর।) (পৃঃ ৬৩ দেখ)

3. Discuss the relationship between market price and normal price.

(বাজার মূল্য ও স্বাভাবিক মূল্যের সম্পর্ক আলোচনা কর।) (পৃঃ ৬৪ ও ৬৫ দেখ)

একাদশ অধ্যায়

একচেটিয়া ব্যবসা (Monopoly)

যখন কোন বস্তুর সমগ্র উৎপাদন ও যোগান একটি মাত্র উৎপাদন-প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তখন তাহাকে একচেটিয়া ব্যবসা বলা হয়। এই উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানটিকে কোনরূপ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে

হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বহু ক্রেতা ও বিক্রেতার অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে বহু ক্রেতা এবং একটিমাত্র বিক্রেতা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান (Calcutta Electric Supply Company) এরূপ একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান।

একচেটিয়া ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের বিভিন্ন কারণ দেখা যায়। অধিক মুনাফা লাভের জন্য, ব্যয় সংক্ষেপের জন্য এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক প্রতিযোগিতা পরিত্যাগ করিয়া সংযুক্ত হইলে একচেটিয়া ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়। উপরন্তু, সরকারী সম্মতি লাভ করিয়াও কোন একটি সামগ্রীর একটিমাত্র উৎপাদন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হইলেও একচেটিয়া ব্যবসায়ের সৃষ্টি হয়।

একচেটিয়া ব্যবসায়ে মূল্য-নির্ধারণ (Price determination under Monopoly) :

কোন দ্রব্যের যোগানের উপর একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে। একচেটিয়া ব্যবসায়ী তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করিবে যাহাতে তাহার মোট লাভ সর্বাপেক্ষা অধিক হয়। সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, যেহেতু একচেটিয়া ব্যবসায়ীর কোন প্রতিযোগী নাই, সুতরাং তাহার উৎপাদিত সামগ্রীর মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু, এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, মূল্য বাড়ান একচেটিয়া ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্য নয়; তাহার লক্ষ্য মোট মুনাফা বৃদ্ধি করা। মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি পাইলে মোট বিক্রয়ের পরিমাণ কমিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং একচেটিয়া কারবারী তাহার সামগ্রীর মূল্য এরূপে নির্ধারিত করিবে যাহাতে তাহার মোট লাভ সর্বাধিক হয়। মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে কয়েকটি বিশেষ উপাদানের দিকে দৃষ্টি দিতে হয়। প্রথমতঃ, তাহাকে দ্রব্যের চাহিদার প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিতে হয়। যদি চাহিদা স্থিতিস্থাপক হয় তাহা হইলে বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি করিবার কোন সুবিধা থাকে না। কারণ, এরূপ ক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয়ের পরিমাণ বিশেষ হ্রাস পায়। কিন্তু, দ্রব্যটির চাহিদা অস্থিতিস্থাপক হইলে বিশেষ মূল্য বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। কারণ, এক্ষেত্রে মূল্য বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও এই দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার বিশেষ হ্রাস পায় না; ফলে,

বিক্রয়ের পরিমাণও হ্রাস পায় না। দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া ব্যবসায়ীকে উৎপাদন ব্যয়ের দিকেও নজর দিতে হয়। উৎপাদন ব্যবস্থা যদি ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন দ্বারা প্রভাবিত হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অপর পক্ষে, যদি উৎপাদন-ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হয়, তাহা হইলে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইতে থাকে।

উপরোক্ত উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া একচেটিয়া কারবারী এমন একটি দর স্থির করিবে, যেখানে তাহার প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue) প্রান্তিক ব্যয়ের (Marginal Cost) সমান হইবে। এই মূল্যেই একচেটিয়া কারবারীর লাভ সর্বাধিক হইবে। একটি অতিরিক্ত একক (Unit) বিক্রয় করিয়া সমগ্র আয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাই প্রান্তিক আয়। অপর পক্ষে, একটি অতিরিক্ত একক উৎপাদনের ফলে সমগ্র উৎপাদন ব্যয় যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহাই প্রান্তিক ব্যয়। প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় যতক্ষণ বেশী থাকে ততক্ষণ একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মোট লাভ বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ফলে উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু, এই বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রান্তিক আয় ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। কারণ, বেশী পরিমাণ বিক্রয় করিতে হইলে দ্রব্যের মূল্য ক্রমশঃ কমাইতে হয়। কিছুকাল পরে, ক্রম-হ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকরী হইবার ফলে, প্রান্তিক ব্যয় বাড়িতে থাকে। এইরূপে, উৎপাদন ও বিক্রয় বৃদ্ধি করিতে করিতে একচেটিয়া ব্যবসায়ী এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যখন তাহার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক ব্যয়ের সমান হয়। এই অবস্থায় তাহার মোট মুনাফা সর্বাধিক হওয়ায়, সে আর উৎপাদন বৃদ্ধি করিবে না। এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পরও যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয় তাহা হইলে প্রান্তিক ব্যয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় কম হইবে। ফলে, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর প্রতি অতিরিক্ত এককে লোকসান হইবে। সুতরাং, যখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয়, তখন, একচেটিয়া ব্যবসায়ীর মোট লাভ সর্বাধিক হওয়ার দরুণ এই পর্যায়ে একচেটিয়া ব্যবসায়ীর সামগ্রীর মূল্য নির্ধারিত হয়।

নিম্নলিখিত তালিকার সাহায্যে দেখান যায় যে, কিভাবে একচেটিয়া কারবারীর সামগ্রীর মূল্য নির্ধারিত হয়।

সমগ্র উৎপাদন (Total output)	উৎপাদনের বৃদ্ধি (Increase in production)	মূল্য (Price)	মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ (Total Revenue)	মোট ব্যয় (Total Cost)	প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue)	প্রান্তিক ব্যয় (Marginal Cost)
১০০	—	২০ নঃ পঃ	২০ টাকা	৮ টাকা	—	—
২০০	১০০	১৮ নঃ পঃ	৩৬ টাকা	১৪ টাকা	১৬ নঃ পঃ	৬ নঃ পঃ
৩০০	১০০	১৬ নঃ পঃ	৪৮ টাকা	২১ টাকা	১২ নঃ পঃ	৭ নঃ পঃ
৪০০	১০০	১৪ নঃ পঃ	৫৬ টাকা	২৯ টাকা	৮ নঃ পঃ	৮ নঃ পঃ
৫০০	১০০	১২ নঃ পঃ	৬০ টাকা	৩৮ টাকা	৪ নঃ পঃ	৯ নঃ পঃ

উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, একচেটিয়া কারবারীর উৎপাদন যখন ১০০ হইতে ২০০ হয়, তখন, তাহার মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ ৩৬৲ টাকা। অর্থাৎ, ১০০ একক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে বিক্রয়লব্ধ অর্থ পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়াছে ৩৬৲ − ২০৲ = ১৬৲ টাকা। ১০০ এককে ১৬৲ টাকা বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাড়িয়াছে, অতএব, অতিরিক্ত এক এককে আয় বৃদ্ধির পরিমাণ ১৬৲ টাকা ÷ ১০০ = ১৬ নঃ পঃ। ইহাই প্রান্তিক আয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ ২০ টাকা হইতে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়িতে বাড়িতে ৬০ টাকা হইয়াছে লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে প্রান্তিক আয় ১৬ নঃ পঃ হইতে হ্রাস পাইতে পাইতে ৪ নঃ পঃ হইয়াছে। বর্ধিত উৎপাদন বাজারে বিক্রয় করিতে যাইয়া মূল্য ২০ নঃ পঃ হইতে ক্রমাগত কমাইতে হইয়াছে বলিয়াই প্রান্তিক আয় কমিয়া আসিয়াছে। অপর পক্ষে, প্রান্তিক ব্যয়ের গতিপ্রকৃতিও লক্ষণীয়। উৎপাদন ১০০ হইতে বাড়াইয়া ২০০ করার ফলে মোট ব্যয় ১৪ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ, উৎপাদনের পরিমাণ পূর্বাপেক্ষা ১০০ বেশী হওয়ায় উৎপাদন ব্যয়ও পূর্বাপেক্ষা ১৪৲ − ৮ = ৬৲ টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ১০০ একক বৃদ্ধি করায় মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে ৬৲ টাকা; অতএব, ১ একক বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয় বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে ৬৲ টাকা ÷ ১০০ = ৬ নঃ পঃ। ইহাই প্রান্তিক ব্যয়। উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোট ব্যয় ৮৲ টাকা হইতে বাড়িতে বাড়িতে ৩৮৲ টাকা হইয়াছে। ইহার ফলে, প্রান্তিক ব্যয় ৬ নঃ পঃ হইতে বৃদ্ধি পাইতে পাইতে ৯ নঃ পঃ হইয়াছে। উপরোক্ত তালিকায় দেখা যায় যে, একচেটিয়া কারবারীর মোট উৎপাদন যখন ৪০০, তখন প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই ৮ নঃ পঃ। সুতরাং

১৪ নং পঃ মূল্যে প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক ব্যয় সমান হয় বলিয়া, ইহাই একচেটিয়া মূল্য।

একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ক্ষমতার সীমা (Limits to the power of a monopolist) ঃ

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, একচেটিয়া কারবারী তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য যাহা খুশী মূল্য স্থির করিতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে এইরূপ স্বেচ্ছাচারী নীতি গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নানা বিধিনিষেধের ফলে তাহার ক্ষমতা কার্যতঃ সঙ্কুচিত হয়।

প্রথমতঃ, পরিবর্ত দ্রব্যের ভয়ে একচেটিয়া কারবারী যথেচ্ছভাবে মূল্য বৃদ্ধি করিতে পারে না। এমন দ্রব্য দুর্লভ যাহার কোন না কোন পরিবর্ত (Substitute) নাই। বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্ত দ্রব্য কেরোসিন ল্যাম্প বা মোমবাতি। সুতরাং, যদিও আমরা বিদ্যুৎশক্তি পাইয়া থাকি কেবলমাত্র কলিকাতা বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান হইতে, তবুও, এই প্রতিষ্ঠান বিদ্যুতের জন্য যাহা খুশী মূল্য নির্ধারণ করিতে সাহস পায় না। কারণ, মূল্য অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাইলে বৈদ্যুতিক আলোর পরিবর্তে লোকে কেরোসিন ল্যাম্প ইত্যাদি পরিবর্ত সামগ্রী ব্যবহার করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারী ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধি করিতে থাকিলে নূতন ফার্ম লাভের আশায় ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতে উৎসাহ বোধ করিবে। ফলে, ভবিষ্যৎ প্রতিযোগিতার আশঙ্কায় একচেটিয়া কারবারী তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, বিরুদ্ধ জনমতের আশঙ্কায় একচেটিয়া কারবারী তাহার উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিশেষ বৃদ্ধি করিতে সাহস পায় না। মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণ আন্দোলন করিতে থাকিলে সরকার একচেটিয়া কারবারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়েও একচেটিয়া কারবারী যথেচ্ছ মূল্য বৃদ্ধি করিতে সাহস পায় না।

প্রশ্নাবলী

1. What is a monopoly ? How is monopoly price determined ?
(একচেটিয়া কারবার কাহাকে বলে? একচেটিয়া কারবারের ক্ষেত্রে বস্তুর বাজার দর স্থির হয় কিভাবে ?) (পৃঃ ৬৫-৬৯ দেখ)

2. Indicate the limits to the power of a monopolist.
(একচেটিয়া ব্যবসায়ীর ক্ষমতার সীমা নির্দেশ কর ।) (পৃঃ ৬৯ দেখ)

———

দ্বাদশ অধ্যায়

বণ্টনের সমস্যা ও খাজনা
(Problem of Distribution and Rent)

উৎপাদন কার্যে অংশ গ্রহণ করে চারিটি উপাদান—ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন। এই উপাদানগুলির সহযোগিতার মধ্য দিয়া বস্তুর উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ উপাদানগুলির মধ্যে স্ব স্ব কার্যের জন্য বণ্টিত হয়। ইহার যে অংশ ভূমির মালিককে দেওয়া হয় তাহাকে খাজনা (Rent) বলে; যে অংশ শ্রমিক পাইয়া থাকে তাহা মজুরী (Wages); যে অংশ মূলধন্ যোগানকারী পায় তাহাকে বলে সুদ (Interest) ; আর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা সংগঠকের (Entrepreneur) মুনাফা (Profit)। খাজনা, মজুরী ও সুদ পূর্ব হইতেই সুনির্দিষ্ট থাকে ; কিন্তু মুনাফা নির্দিষ্ট ও নিশ্চিত হয় না। সংগঠক বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে প্রথমে পূর্বচুক্তি অনুযায়ী খাজনা, মজুরী ও সুদ দিয়া থাকে। অবশিষ্টাংশ সংগঠকের মুনাফারূপে পরিগণিত হয়।

খাজনা (Rent) :

অর্থনীতিক পরিভাষায় 'খাজনা' শব্দটির একটি বিশেষ অর্থ আছে। সাধারণতঃ খাজনা বলিতে জমি কিংবা বাড়ীর ব্যবহারের জন্য প্রজা বা ভাড়াটিয়া মালিককে যে মূল্য দিয়া থাকে তাহাই বুঝায়। প্রচলিত অর্থে

খাজনা চুক্তিমূলক মূল্য (Contract Rent) হিসাবে পরিগণিত হয়। কিন্তু অর্থনীতি শাস্ত্রে খাজনা কথাটি চুক্তিমূলক খাজনা হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। ভূমি, স্বাভাবিক জলীয় শক্তি, বন, খনি প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু ব্যবহারের দাম হিসাবে যাহা পাওয়া যায় তাহাই অর্থনৈতিক খাজনা (Economic Rent)। চুক্তিমূলক খাজনার মধ্যে মূলধন ব্যবহার করিবার দাম অন্তর্ভুক্ত থাকিতে পারে। যেমন, বাড়ীর ভাড়ার মধ্যে বাড়ীটি নির্মাণ করিবার জন্য মূলধন ব্যবহারের সুদ ইত্যাদি থাকিতে পারে। কিন্তু এই অর্থনীতিক খাজনার মধ্যে সমস্ত উপাদানগুলি গণ্য করা হয় না। অর্থনৈতিক খাজনা কেবলমাত্র জমির স্বাভাবিক উর্বরা শক্তিটুকু ব্যবহার করিবার দাম।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent) :

খাজনা কিভাবে নির্ধারিত হয়, ইহার আলোচনার জন্য আমরা উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ইংরাজ অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর (David Ricardo) কাছে ঋণী। জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তির ব্যবহারের জন্য মালিককে উৎপাদনের জন্য যে অংশ প্রদান করা হয়, তাহাই রিকার্ডোর মতে খাজনা। সকল জমির উর্বরা শক্তি সমান নয়। কোন জমি অধিকতর উর্বরা হওয়ার দরুণ কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ের অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদন হইয়া থাকে ; আবার কোন জমি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হওয়ার দরুণ, কৃষকের উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ হয় মাত্র। যে সকল জমির উৎপাদন হইতে কেবলমাত্র উৎপাদন ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব হয় সে সকল জমি হইতে খাজনা বলিয়া কিছু আয় করা সম্ভব হয় না ; ইহাকে প্রান্তিক জমি (Marginal land) বলা হয়। অপেক্ষাকৃত উর্বর জমিতে চাষ করিয়া উৎপাদন যদি এমন হয় যে, ব্যয়নির্বাহ করিয়াও উদ্বৃত্ত উৎপাদন থাকে, তবে, জমির মালিক এক্ষেত্রে ঐ জমির কৃষকের নিকট হইতে খাজনা পাইয়া থাকে।

ধরা যাউক যে, কোন অঞ্চলে দুইখণ্ড জমি আছে ; এক খণ্ড উৎকৃষ্ট ও অপর খণ্ড অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট। প্রথমে উৎকৃষ্ট জমিতে স্বভাবতঃই চাষ হইবে। ঐ জমিতে পাঁচজন কৃষক চাষ করিয়া ২৫ মণ ধান উৎপাদন করে। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য শস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইল। এখন, শুধুমাত্র প্রথম খণ্ড জমিতে চাষ করিয়া বর্ধিত চাহিদা মিটান সম্ভব নয়। ফলে, দ্বিতীয় খণ্ড জমিটি চাষ করিবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। এই দ্বিতীয়

খণ্ড জমিটি অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া প্রথম খণ্ড জমির মত এখানে উৎপাদন সমপরিমাণ হইবে না। ধরা যাউক যে, ঐ দ্বিতীয় খণ্ড জমিতে পাঁচজন কৃষক চাষ করিয়া মোট ২০ মণ ধান উৎপাদন করে। উভয় জমির উৎপাদন ব্যয়ই ২০০৲ টাকা। বাজারে ধানের মূল্য প্রতিমণ ১০৲ টাকা। অতএব, প্রথম জমির আয় হইবে ২৫×১০৲=২৫০৲ টাকা ; এবং দ্বিতীয় জমির আয় হইবে, ২০×১০৲=২০০৲ টাকা। সুতরাং, দেখা যায় যে, দ্বিতীয় জমিতে ব্যয়নির্বাহ করিয়া আর কিছু উদ্বৃত্ত থাকে না ; কিন্তু প্রথম জমিতে ৫০৲ টাকা উদ্বৃত্ত থাকে। রিকার্ডোর মতে এই উদ্বৃত্ত ৫০৲ টাকাই প্রথম জমির খাজনা। দ্বিতীয় খণ্ড জমিটির কোন উদ্বৃত্ত থাকে না বলিয়া ইহা খাজনা-বিহীন জমি (No-Rent land)।

সমালোচনা (Criticism) :

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের কয়েকটি ত্রুটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, জমির আদি ও অবিনশ্বর শক্তি বলিয়া কিছুই নাই। ক্রমাগত চাষ করিতে করিতে কোন ভূমিখণ্ডের উর্বরতা হ্রাস পায়। দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো শুধুমাত্র কৃষিকার্যে জমির উর্বরতা শক্তির উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন ; কিন্তু, জমির অবস্থানও (situation) কৃষিকার্যে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়তঃ, রিকার্ডোর মতে খাজনা কৃষিজাত দ্রব্যমূল্যের অংশ নয়, কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদরা ইহা স্বীকার করেন না।

খাজনা ও মূল্য (Rent and Price) :

রিকার্ডোর মতের যুক্তি হইল : পূর্ণ প্রতিযোগিতায় কোন দ্রব্যের মূল্য সেই দ্রব্যের প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের সমান। প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের অর্থ প্রান্তিক জমির উৎপাদন ব্যয়। রিকার্ডোর মতে খাজনা উৎপাদনের উদ্বৃত্ত ও প্রান্তিক জমির কোন উদ্বৃত্ত থাকে না বলিয়া ইহাকে কোন খাজনা দিতে হয় না। অতএব, খাজনা প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয়ের অংশ নয়। ফলে, ইহা কৃষিজাত দ্রব্যমূল্যেরও অংশ নয়। অপর পক্ষে, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের দ্বারা খাজনা প্রভাবিত হয়। মূল্য বৃদ্ধি পাইলে উৎপাদনের উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনাও বৃদ্ধি পাইবে। আবার মূল্য হ্রাস পাইলে এই উদ্বৃত্ত অর্থাৎ খাজনাও হ্রাস পাইবে। রিকার্ডোর এই যুক্তি ত্রুটিপূর্ণ। যে কোন জমিখণ্ডের বিকল্প ব্যবহার হইয়া থাকে। যেমন, একখণ্ড জমিতে ধান বা পাট উৎপাদন করা যায়। অতএব,

ধান উৎপাদনকারীকে যদি এই জমিখণ্ড ব্যবহার করিতে হয় তাহা হইলে, পাট উৎপাদনকারী ঐ জমিখণ্ডের জন্য যে মূল্য দিতে চায় অন্ততঃপক্ষে সেই মূল্য তাহাকে দিতে হইবে। এই মূল্যকে জমির পরিবর্তন ব্যয় (Transfer Cost) বলা হয়। ইহা উৎপাদন ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। ফলে, কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্যের উপর ইহার (অর্থাৎ জমির খাজনার) প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

খাজনা-নির্ধারক উপাদানসমূহ (Factors governing Rent) :

নিম্নলিখিত উপাদানদ্বারা খাজনা নির্ধারিত হয়। প্রথমতঃ, ভূমির যোগান অস্থিতিস্থাপক (Inelastic Supply of Land)। সুতরাং ইহার পরিমাণ খুশীমত বাড়ান বা কমান যায় না। বিশেষতঃ, উৎকৃষ্ট জমির পরিমাণ নিতান্তই কম। ইহার ফলে, প্রান্তিক জমির তুলনায় অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট জমিগুলিতে উদ্বৃত্ত থাকে। ইহাই উৎকৃষ্ট জমিগুলির খাজনা। জমি যত উৎকৃষ্টতর হইবে, খাজনার পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের সূত্রদ্বারা খাজনা প্রভাবিত হয়। এই সূত্র সক্রিয় থাকিলে কোন নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপে উৎপাদনকারী এমন এক পর্যায়ে পৌছায় যখন তাহার প্রান্তিক ব্যয় (অর্থাৎ, শেষ এককের উৎপাদন ব্যয়) বাজার মূল্যের সমান হয়। এই অবস্থায় শেষ একক ব্যতীত পূর্ববর্তী অন্যান্য এককে উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্ত থাকে। প্রান্তিক ব্যয়ের উপর এই উদ্বৃত্তকে খাজনা বলে।

তৃতীয়তঃ, অর্থনৈতিক প্রগতি (Economic Progress) দ্বারাও খাজনা নিয়ন্ত্রিত হয়। নানাবিধ উদ্ভাবনের (যেমন, ট্রাক্টর, বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ ইত্যাদি) ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া উন্নত হয় এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পায়। এই অবস্থায় বাজার মূল্য পূর্বের মতই থাকিলে প্রান্তিক ব্যয়ের উপর উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়; ফলে খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থতঃ, মূল্যের দ্বারা খাজনা প্রভাবিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ধিত মূল্যের জন্য প্রান্তিক ব্যয়ের উপর উৎপাদনকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে খাজনার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চমতঃ, কোন ভূমিখণ্ডকে একাধিক কার্যে নিয়োগ করা যায় বলিয়া খাজনার উদ্ভব হয়। একখণ্ড ভূমিতে ধান, পাট ইত্যাদি উৎপাদন করা যায়, আবার গৃহও নির্মাণ করা যায়। এই ভূমিখণ্ডটিতে পাটের চাষ করিলে হয়ত উৎপাদনব্যয়ের উপর কোনই উদ্বৃত্ত পাওয়া যায় না, কিন্তু, যদি ধান চাষ করা যায় তাহা হইলে উৎপাদন ব্যয়ের উপর ৮৲ টাকা উদ্বৃত্ত পাওয়া যাইতে পারে। এক্ষেত্রে জমিটিতে স্বভাবতঃই ধান চাষ করা হইবে এবং পাট চাষীকে জমিটি পাইতে হইলে জমির মালিককে অন্ততঃপক্ষে ৮৲ টাকা দিতে হইবে। এই ৮৲ টাকা ভূমিখণ্ডটির খাজনা।

ষষ্ঠতঃ, ভূমিখণ্ডের অবস্থানের (situation) দ্বারাও খাজনা প্রভাবিত হইয়া থাকে। দুইটি জমির উৎপাদন ব্যয় একই হইতে পারে, কিন্তু বাজারের দূরত্ব বা নৈকট্যের জন্য জমি দুইটির সমগ্র ব্যয়ের পার্থক্য ঘটিতে পারে। মূল্য ও উৎপাদন-ব্যয়ের পার্থক্যের ফলেই খাজনার উদ্ভব হয়। সুতরাং বাজার হইতে অপেক্ষাকৃত দূরবর্তী জমির উৎপাদিত পণ্যের পরিবহন ব্যয় বেশী হইলে সেই জমির উৎপাদনকারীর মোট ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে; ফলে এই জমিটির খাজনা কম হইবে। অপরপক্ষে, অন্য একখণ্ড জমি যদি বাজারের কাছেই অবস্থিত হয়, তাহা হইলে সে জমির পণ্যের পরিবহন ব্যয় কম হইবে এবং উৎপাদনকারীর মোট ব্যয়ের পরিমাণও কম হইবে। সেক্ষেত্রে এই জমিটি পূর্ব জমিখণ্ডটি অপেক্ষা অধিক খাজনা দিবে।

প্রশ্নাবলী

1. What is 'economic rent'? How is it related to the producer's surplus?

('অর্থনৈতিক খাজনা' কাহাকে বলে? উৎপাদকের উদ্বৃত্ত ও খাজনার মধ্যে কি সম্পর্ক?) (পৃঃ ৭১ ও ৭২ দেখ)

2. Show how the scarcity of land gives rise to 'economic rent.'

(ভূমির সীমাবদ্ধতার দরুণ কিরূপে অর্থনৈতিক খাজনার উদ্ভব হয় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দাও।) (পৃঃ ৭১ ও ৭২ দেখ)

3. State the factors governing rent.

(খাজনা-নির্ধারক উপাদানসমূহ বিবৃত কর।) (পৃঃ ৭৩ ও ৭৪ দেখ)

4. State the relationship between rent and price.

(খাজনা ও মূল্যের সম্পর্ক নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৭২ ও ৭৩ দেখ)

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মজুরী (Wages)

শ্রমিক উৎপাদনকার্যে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তাহার শ্রমার্জিত উপার্জনকেই মজুরী বলা হয়। মজুরীকে দুইভাগে দেখা যাইতে পারে—অর্থ মজুরী ও প্রকৃত মজুরী (Money wages and Real wages)। কোন নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে অর্থ উপার্জন করে তাহাই তাহার অর্থমজুরী। শ্রমের বিনিময়ে শ্রমিক যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তাহার সমষ্টিকে প্রকৃত মজুরী বলে। প্রকৃত মজুরী কয়েকটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল : (১) অর্থমজুরীর পরিমাণ ; (২) অর্থমজুরী ছাড়াও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা, (৩) মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা।

প্রথমতঃ, মূল্যস্তর (Price Level) অপরিবর্তিত থাকিলে শ্রমিকের অর্থ-মজুরী বৃদ্ধি পাইলে প্রকৃত মজুরীও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক যদি অর্থ মজুরী ছাড়াও নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে তাহা হইলে তাহার প্রকৃত মজুরী বৃদ্ধি পায়। সুযোগ-সুবিধাগুলি নিম্নরূপ :—

(ক) বিনা খরচে ঔষধপত্রাদি, স্বল্পমূল্যে ভোগ্য সামগ্রী ইত্যাদি পাইলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী বেশী হয়।

(খ) কয়েকটি পেশায় অতিরিক্ত আয়ের সুবিধা আছে। অর্থ মজুরী কম হইলেও এই সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরী বেশী হয়। যেমন, শিক্ষকদের অর্থ মজুরী কম ; কিন্তু বই লিখিয়া, ছাত্র পড়াইয়াও তাঁহারা অতিরিক্ত উপার্জন করিতে পারেন।

(গ) চাকুরীর নিরাপত্তার উপরও প্রকৃত মজুরী নির্ভরশীল। অস্থায়ী চাকুরীতে অর্থ মজুরী বেশী হইলেও প্রকৃত মজুরী স্থায়ী চাকুরী অপেক্ষা কম। ধরা যাউক, একটি শ্রমিক তিন মাসের চুক্তিতে ২০০৲ টাকা মাসিক মজুরীতে কাজ করে ; অপরপক্ষে, কোন একজন স্থায়ী শ্রমিক ১২৫৲ টাকা মাসিক মজুরী পায়। এক্ষেত্রে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, দীর্ঘ সময়ের বিবেচনায় দ্বিতীয় শ্রমিক প্রথম শ্রমিক অপেক্ষা অধিক প্রকৃত মজুরী পাইবে।

(ঘ) শ্রমিক যে পরিবেশে কাজ করে তাহার উপর প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেশী মজুরীতে কাজ করিলেও শ্রমিকের প্রকৃত মজুরী কম হয়।

(ঙ) কোন কোন পেশায় অতিরিক্ত খরচের জন্য প্রকৃত মজুরী কম হয়। যেমন, উকিলকে বিশেষ পরিধানের জন্য অতিরিক্ত খরচ বহন করিতে হয়; কিন্তু কেরানীকে অনুরূপ কোন খরচ বহন করিতে হয় না। যদি উকিল ও কেরানীর অর্থ মজুরী এক হয়, তাহা হইলে কেরানীর প্রকৃত আয় উকিলের অপেক্ষা বেশী।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উপর প্রকৃত মজুরী নির্ভর করে। মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) ঘটিলে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়; ফলে প্রকৃত মজুরী হ্রাস পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৬১ সালে শ্রমিকের অর্থ মজুরী বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির দরুণ তাহার প্রকৃত মজুরী হ্রাস পাইয়াছে।

মজুরী নির্ধারণ (Determination of wages):

যে কোন বস্তুর মূল্য ইহার চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়। শ্রমের মূল্য অর্থাৎ মজুরীও অনুরূপভাবে শ্রমের চাহিদা ও যোগানের দ্বারা নির্ধারিত হয়।

প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory):

চাহিদার দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমের চাহিদার কারণ ইহার উৎপাদনশীলতা। প্রান্তিক উৎপাদন তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে শ্রমের মজুরী ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের (Marginal Product) সমান হয়। অন্যান্য উপাদানগুলির পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকিলে, উৎপাদনে একটি শ্রমিক নিয়োগের ফলে সমগ্র উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায় বা একটি শ্রমিককে ছাঁটাই করিলে সমগ্র উৎপাদন যে পরিমাণে হ্রাস পায়, তাহাই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ধরা যাউক, কোন উৎপাদনকারী ১০০ শ্রমিক নিয়োগ করিয়া ৪০০০৲ টাকার জিনিস উৎপাদন করে; উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য একটি শ্রমিক বেশী নিয়োগ করিয়া সে ৪০৩২৲ টাকার জিনিস উৎপাদন করে। এই ক্ষেত্রে ১০১তম শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন (৪,০৩২-৪০০০)=৩২৲ টাকা। অতএব শ্রমিকের মজুরীও ৩২৲ টাকা।

প্রান্তিক উৎপাদনের তত্ত্বটি শুধুমাত্র শ্রমের চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করে; শ্রমের যোগান বা যোগান মূল্যের দিকটি এই তত্ত্বে অবহেলিত হইয়া আছে। কিন্তু, মজুরী নির্ভর করে শ্রমের চাহিদা ও যোগান উভয়েরই উপর।

মজুরী ও জীবনযাত্রার মান (Wages and Standard of Living):

মজুরী নির্ধারণে জীবন যাত্রার মানের তত্ত্ব শ্রমের যোগানের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। শ্রমিকরা একটি নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মানে অভ্যস্ত থাকে। এই তত্ত্ব অনুসারে শ্রমিকের নির্দিষ্ট জীবনযাত্রার মান রক্ষার জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তাহাই তাহার মজুরী। জীবনযাত্রার ব্যয় অপেক্ষা মজুরী কম হইলে, প্রথমতঃ, শ্রমিক কাজ গ্রহণে অনিচ্ছুক হইবে। দ্বিতীয়তঃ, জন্মহার হ্রাস এবং ফলে জনসংখ্যাও হ্রাস পাইবে। এই দুইটি কারণে, শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে। ফলে, মজুরী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া জীবনযাত্রার ব্যয়ের সমান হইবে। অপরপক্ষে, মজুরীহার জীবন যাত্রার ব্যয় অপেক্ষা বেশী হইলে প্রথমতঃ বেশী সংখ্যক শ্রমিক কাজ গ্রহণে ইচ্ছুক হইবে এবং দ্বিতীয়তঃ, জন্মহার বৃদ্ধি পাইবে, ফলে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে। এই দুইটি কারণে, শ্রমিকের যোগান বাড়িয়া যাইবে। তাহার ফলে, মজুরী ক্রমশঃ কমিয়া জীবনযাত্রার ব্যয়ের সমান হইবে।

জীবনযাত্রার মানের তত্ত্বও ত্রুটিহীন নয়। প্রথমতঃ, ইহা শুধুমাত্র শ্রমের যোগানের উপরই গুরুত্ব আরোপ করে; চাহিদার দিকটি এই তত্ত্বে স্বীকৃতি পায় নাই।

দ্বিতীয়তঃ, মজুরীর সহিত জনসংখ্যার যে নিবিড় সম্পর্ক এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে, তাহাও সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। জীবনধারণের ব্যয় অপেক্ষা মজুরী বৃদ্ধি পাইলে জন্মের হার নাও বাড়িতে পারে। এই বর্ধিত মজুরীর দ্বারা শ্রমিক জীবনধারণের মান আরও উন্নত করিবার প্রয়াস পাইতে পারে।

উপসংহারঃ—আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌দের মতে মজুরী নির্ধারিত হয় শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের মাধ্যমে। চাহিদার দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন এবং যোগানের দৃষ্টিকোণ হইতে শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান মজুরী নির্ধারক উপাদান। উৎপাদনকারী প্রান্তিক

উৎপাদন অপেক্ষা অধিক মজুরী শ্রমিককে দিবার পক্ষপাতী নয়; আবার শ্রমিকও তাহার জীবনযাত্রার মানের ব্যয় অপেক্ষা কম গ্রহণ করিতে রাজী হয় না। ফলে, প্রান্তিক উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মানের ব্যয় এই দুই প্রান্তের মধ্যে শ্রমিকের মজুরীর হার নির্ধারিত হইয়া থাকে।

মজুরীর তারতম্য (Differences in wages):

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বত্র শ্রমিকের মজুরীর হার সমান হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে এই সমতা পরিলক্ষিত হয় না। বিভিন্ন শ্রমিক বিভিন্ন মজুরী পাইয়া থাকে। ইহার কারণ শ্রম সমজাতীয় (Homogeneous) নয়। এক একটি পেশার জন্য এক এক শ্রেণীর শ্রমিক প্রয়োজন হয়। অতএব, কাজের বিভিন্নতার জন্য মজুরীর তারতম্য ঘটে।

সাধারণতঃ, মজুরীর তারতম্য বলিতে বিভিন্ন পেশায় বিভিন্ন মজুরী বুঝান হয়। যেমন, ওকালতি, ডাক্তারী, ইত্যাদি বিভিন্ন পেশায় মজুরী বা আয়ের পার্থক্য দেখা যায়। মজুরীর এই তারতম্যের কারণগুলি নিম্নরূপ:

(১) শ্রমিকদের মধ্যে স্বাভাবিক গুণের তারতম্য চোখে পড়ে। যদি কোন শ্রমিকের স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা অন্য শ্রমিক অপেক্ষা বেশী হয়, তবে সে অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরী উপার্জন করে। অবশ্য, তাহার শুধুমাত্র কার্যক্ষমতা থাকিলেই চলিবে না; এই কার্যক্ষমতার চাহিদাও থাকিতে হইবে। জমির ক্ষেত্রে স্বাভাবিক উর্বরতা পার্থক্যের জন্য যেমন উৎকৃষ্ট জমির নিকৃষ্ট জমি অপেক্ষা বেশী খাজনা হয়, তেমনি উন্নত স্বাভাবিক কার্যক্ষমতাসম্পন্ন শ্রমিক সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা বেশী মজুরী উপার্জন করে।

(২) শিক্ষার তারতম্যের জন্যও মজুরীর তারতম্য ঘটিয়া থাকে। যদি কোন ব্যক্তি অনেকদিন ধরিয়া বহু অর্থব্যয় করিয়া বিশেষ পেশাগত ব্যুৎপত্তি অর্জন করে, তবে স্বভাবতঃই সে অধিক মজুরী পাইয়া থাকে। যেমন, একজন ইঞ্জিনিয়ার ব্যয়সাপেক্ষ ও দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষানবিশির শেষে সাধারণ শ্রমিক অপেক্ষা অধিক অর্থোপার্জন করিয়া থাকে।

(৩) সুযোগের পার্থক্যের জন্য মজুরীর পার্থক্য হইয়া থাকে। ভাল চাকুরী প্রাপ্তির ব্যাপারে সকলের সমান সুযোগ থাকে না। প্রভাবশালী ধনীর পুত্র সহজেই বেশী মজুরী পাইয়া থাকে।

(৪) কর্মের প্রকৃতির উপর মজুরীর তারতম্য নির্ভর করে। সাধারণতঃ,

অপ্রীতিকর কাজের জন্য শ্রমিককে বেশী মজুরী দিতে হয়। যেমন, শিক্ষকতার তুলনায় সওদাগরী অফিসে কেরানীর কাজ অপেক্ষাকৃত কম আনন্দদায়ক। সেইজন্য, শিক্ষক অপেক্ষা সাধারণতঃ কেরানী অধিক মজুরী পাইয়া থাকে।

(৫) নিয়োগের সর্তের দ্বারাও মজুরী প্রভাবিত হয়। অনিয়মিত ও অস্থায়ী কাজে নিযুক্ত শ্রমিক নিয়মিত ও স্থায়ী কাজে নিযুক্ত শ্রমিক অপেক্ষা অধিক মজুরী পাইয়া থাকে। ডক্ শ্রমিকদের কাজ অনিয়মিত ও অস্থায়ী। সুতরাং সমান ক্ষমতাসম্পন্ন অন্যান্য পেশার স্থায়ী শ্রমিক অপেক্ষা তাহারা বেশী মজুরী পায়।

(৬) উন্নতির সুযোগ-সুবিধার উপর মজুরীর তারতম্য নির্ভরশীল। কোন পেশায় ভবিষ্যৎ সাফল্যের সুযোগ অন্য পেশা অপেক্ষা বেশী থাকিতে পারে। কম মজুরীতেও ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় শ্রমিক এই পেশা গ্রহণ করিতে আগ্রহী হইবে।

(৭) কাজের আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধার উপরও মজুরীর পার্থক্য দেখা যায়। যে কাজে আনুষঙ্গিক সুবিধা (যেমন, অল্পভাড়ায় বাসগৃহ ব্যবহার করিবার সুযোগ, বিনামূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা ইত্যাদি) বেশী, সেকাজে মজুরী সাধারণতঃ কম হইয়া থাকে।

শ্রমের গতিশীলতার (Mobility of labour) অভাবের জন্যই প্রধানতঃ মজুরীর বিশেষ তারতম্য দেখা যায়। এই গতিশীলতা সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। সাধারণতঃ, ব্যক্তির পেশা জন্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই জন্মের ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন করিবার সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য দেখা যায়। সাধারণতঃ, চাষীর ছেলে চাষের কাজই করে ; ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হইবার তাহার সুযোগ-সুবিধা থাকে না। ধনীর পুত্রের বেশী বেতনের চাকুরী পছন্দ করিবার সুযোগ-সুবিধা থাকে। এইরূপ সামাজিক কাঠামোর নির্দিষ্টতা ও কাঠিন্যের জন্য শ্রমের গতিশীলতার একান্ত অভাব দেখা যায়। ফলে, মজুরীর বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Distinguish between money wages and real wages. What are the factors on which the net advantages of a job depend ?

(মুদ্রাগত মজুরী এবং আসল মজুরীর পার্থক্য নির্দেশ কর। মজুরীর পরিমাণ ছাড়া আর যে, সকল বিষয়ের উপর কাজের সুবিধা-অসুবিধা নির্ভর করে তাহাদের দৃষ্টান্ত দাও।) (পৃঃ ৭৫, ৭৬ দেখ)

2. Discuss the relation between wages, marginal productivity and the standard of living of the worker.

(শ্রমিকের মজুরী তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মানের সহিত কিভাবে সম্পৃক্ত তাহার আলোচনা কর।) (পৃঃ ৭৬-৭৮ দেখ)

3. Explain why the rates of wages for different kinds of work are different

(বিভিন্ন কাজে মজুরীর হারের তারতম্য হয় কেন ইহার কারণগুলি লইয়া আলোচনা কর।)

(পৃঃ ৭৮ ও ৭৯ দেখ)

চতুর্দশ অধ্যায়

সুদ (Interest)

উৎপাদন কার্যে মূলধনের ব্যবহারের জন্য যে দাম দিতে হয় তাহাকেই সুদ বলা হয়। যদিও মূলধন অর্থে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি উৎপাদনের উৎপাদিত সামগ্রী বুঝায়, তবে, সুদের আলোচনা করিতে গিয়া মূলধন বলিতে আমরা সাধারণতঃ টাকাকড়ির লেন-দেন বুঝি। কোন ব্যবসায়ী যদি ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ধার লয়, তাহা হইলে তাহাকে ঐ টাকার জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়। ইহাই ঐ টাকার সুদ।

মোট সুদ ও নীট সুদ (Gross Interest and Net Interest) :

সুদ দুই প্রকার—মোট সুদ ও নীট সুদ।

ঋণগ্রহণকারী ঋণদাতাকে টাকার ব্যবহারের জন্য যে অতিরিক্ত টাকা দিয়া থাকে তাহাকে বলা হয় মোট সুদ। মোট সুদে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি থাকে :

(ক) ঝুঁকি বহনের প্রতিদান :—ঋণগ্রহণকারী ঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ নাও করিতে পারে। এই অনিশ্চয়তার জন্য ঋণদাতা কিছুটা ঝুঁকি বহন করে। মোট সুদের মধ্যে ইহার জন্য কিছু দাম ধরিয়া দিতে হয়।

(খ) ঋণের আনুষঙ্গিক নানাবিধ কার্যের প্রতিদানঃ ঋণদাতাকে দেনা পাওনার হিসাব রাখিতে হয়, টাকা আদায়ের জন্য সময় নষ্ট করিতে হয়। এই সকল কার্যের প্রতিদান হিসাবে সে অতিরিক্ত কিছু দাবী করে।

ঝুঁকি বহনের প্রতিদান ও ঋণের আনুষঙ্গিক নানাবিধ কার্যের প্রতিদান মোট সুদ হইতে বাদ দিলে যাহা অতিরিক্ত থাকে তাহাই নীট সুদ। অর্থবিদ্যার আলোচনার বিষয়-বস্তু নীট সুদ।

সুদ নির্ধারণের তত্ত্ব (Determination of the Rate of Interest) :

অর্থনীতিতে সুদ নির্ধারণের তত্ত্বের আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ দুইটি : প্রথমতঃ, সুদ নির্ধারণের কারণ বিশ্লেষণ করা ও দ্বিতীয়তঃ, সুদের হারের তারতম্য বিশ্লেষণ করা।

অন্যান্য বস্তুর মূল্যের মতই মূলধনের মূল্য অর্থাৎ সুদ নির্ধারিত হয় মূলধনের চাহিদা ও মূলধনের যোগানের মাধ্যমে। অতএব, মূলধনের চাহিদা ও যোগানের কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে সুদ কিভাবে নির্ধারিত হয় তাহা বুঝা যায়।

প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর লোকের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মূলধনের চাহিদা দেখা যায় :

প্রথমতঃ, ব্যবসায়ীদের উৎপাদনকার্য চালাইবার জন্য মূলধনের প্রয়োজন হয়;

দ্বিতীয়তঃ, সরকার যুদ্ধ, উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ইত্যাদি চালাইবার জন্য মূলধন চাহিয়া থাকে ;

তৃতীয়তঃ, ভোগব্যবহারকারী ভোগ্য-পণ্য ক্রয়ের জন্যও ঋণের প্রয়োজন অনুভব করে।

মূলধনের চাহিদা প্রধানতঃ ব্যবসায়ীদের ও সরকারের প্রয়োজনের জন্যই উৎপাদন কার্যের উপাদান হিসাবে মূলধনের প্রয়োগের কারণ ইহার উৎপাদনশীলতা। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহার প্রয়োগের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ইহার চাহিদাও যথেষ্ট থাকে। কিন্তু, অন্যান্য উৎপাদকের পরিমাণ অপরিবর্তিত রাখিয়া মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ ক্রমশঃ বর্ধিত করিলে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের হার ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনের হার সুদের হার অপেক্ষা অধিক থাকিলে মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি

পাইবে, অপরপক্ষে, ইহার প্রান্তিক উৎপাদনের হার সুদের হার অপেক্ষা কম হইলে ইহার চাহিদা কমিয়া যাইবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, সুদের হার অন্ততঃ পক্ষে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন হারের সমান হইবে। অতএব সুদের হারের উপর মূলধনের মোট চাহিদা বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

মূলধনের যোগান নির্ভর করে জনসাধারণের সঞ্চয়ের পরিমাণের উপর ও সঞ্চয়ীর ঋণ দিবার ইচ্ছার উপর। আবার ব্যাঙ্কও ব্যবসায়ীদের মূলধনের যোগান দিয়া থাকে। সঞ্চয়ই মূলধনের ভিত্তি। সঞ্চয়ের হার নির্ভর করে লোকের আয়ের পরিমাণের উপর। আয় বেশী হইলে, সাধারণতঃ সঞ্চয়ও বেশী হয়। লোকে সঞ্চিত অর্থ ইচ্ছা করিলে নিজের কাছেই রাখিতে পারে, অথবা কিছু সুদের পরিবর্তে অপরকে ধার দিতে পারে। সঞ্চয়ী কি পরিমাণ অর্থ নিজের কাছে রাখিবে তাহা নির্ভর করে দুইটি বিষয়ের উপর: (ক) তাহার কি পরিমাণ অর্থ নিজের প্রয়োজনে লাগিবে তাহার উপর, এবং (খ) সুদের হারের উপর। সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে লোকে টাকাকড়ি নিজের হাতে না রাখিয়া অপরকে ধার দিতে চাহে। ফলে, বাজারে বিনিয়োগযোগ্য মূলধনের যোগান বৃদ্ধি পায়। সুতরাং অন্যান্য সামগ্রীর মতই মূলধনের যোগানও নির্ভর করে উহার মূল্যের অর্থাৎ সুদের হ্রাসবৃদ্ধির উপর।

বিভিন্ন সুদে মূলধনের চাহিদা ও যোগান কি পরিমাণ হইবে তাহার নিম্নরূপ তালিকা প্রস্তুত করা যায়:

শতকরা সুদের হার	মূলধনের চাহিদার পরিমাণ	মূলধনের যোগানের পরিমাণ
৬৲	২০,০০০৲	৬০,০০০৲
৫৲	২১,০০০৲	৫৫,০০০৲
৪৲	২৩,০০০৲	৪০,০০০৲
৩৲	৩৫,০০০৲	৩৫,০০০৲
২৲	৪৫,০০০৲	১৫,০০০৲

উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, সুদের হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের যোগানেরও পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু চাহিদার পরিমাণ হ্রাস

পাইয়াছে। অপরপক্ষে, সুদের হার কমিবার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু যোগানের পরিমাণ কমিয়াছে। এইরূপে যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক প্রভাবের মাধ্যমে শতকরা ৩৲ হারে স্থায়ী-ভাবে সুদ নির্ধারিত হইবে। এই হারে মূলধনের যোগান ও চাহিদার পরিমাণ সমান (৩৫,০০০৲) হইয়াছে।

সুদের হারের তারতম্য (Differences in Interest Rates) :

যেমন শ্রমের বিভিন্নতার জন্য শ্রমিকের মজুরীর হার বিভিন্ন হয়, ঠিক তেমনই, ঋণের প্রকৃতির বিভিন্নতার জন্য সুদের হারও বিভিন্ন হয়। সুদের হারের তারতম্যের কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত কারণগুলি নির্দেশ করা যায়ঃ

(১) দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীর ঋণ-প্রার্থীরা বিভিন্ন কার্যের জন্য ঋণ লইয়া থাকে। কৃষকেরা চাষের জন্য কৃষিঋণ চাহিয়া থাকে, ব্যবসায়ীরা উৎপাদনের জন্য ঋণ লইয়া থাকে। এইরূপে, ঋণের প্রকৃতি বিভিন্ন হওয়ার দরুন সুদের হারও বিভিন্ন হয়।

(২) একটি নির্দিষ্ট সময়ের (কয়েকদিন, মাস বা বৎসর) জন্য ঋণপ্রার্থী ঋণ লইয়া থাকে। ঋণের সময় যত দীর্ঘ হয়, সুদের হারও সাধারণতঃ ততই বেশী হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল ধরিয়া টাকাটি আবদ্ধ থাকে বলিয়া ঋণ-দাতা দীর্ঘ-মেয়াদী ঋণের বেলায় বেশী সুদ দাবী করিয়া থাকে।

(৩) ঋণের ব্যাপারে ঝুঁকি যত বেশী হয়, সুদের হারও ততই বাড়িয়া যায়। নিরাপদ জামিনের ব্যবস্থা থাকিলে ঋণদাতা ঋণগ্রহণকারীকে অল্প সুদে টাকা ধার দিয়া থাকে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে ঋণের টাকা ফিরিয়া পাইবার অনিশ্চয়তা আছে, সেখানে ঋণদাতা চড়া সুদে টাকা ধার দেয়। সরকারকে ঋণ দিলে টাকা ফেরৎ পাইবার কোন অনিশ্চয়তা থাকে না। সেইজন্য সরকারী ঋণের ক্ষেত্রে সুদের হার কম হয়। কিন্তু, মহাজন যখন দরিদ্র কৃষকদের টাকা ধার দেয়, তখন টাকা ফেরৎ পাইবার অনিশ্চয়তার জন্য চড়া সুদ ধার্য করে।

প্রশ্নাবলী

1. Account for the differences in interest rates.
(সুদের হারের তারতম্যের কারণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৮৩ দেখ)

2. Distinguish between gross interest and net interest. How is the rate of net interest determined ?

(মোট সুদ এবং নীট সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। নীট সুদের হার কিভাবে স্থিরীকৃত হয় তাহা বুঝাইয়া দাও।) (পৃঃ ৮০-৮১, ৮১-৮৩ দেখ)

পঞ্চদশ অধ্যায়

মুনাফা (Profit)

উৎপাদনের সংগঠকের আয়কে মুনাফা বলা হয়। আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠকের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সংগ্রহ, তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন এবং সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা সমস্তই সংগঠককে করিতে হয়। উৎপাদনে এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য সংগঠক যাহা আয় করিয়া থাকে তাহাই তাহার মুনাফা।

মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা (Gross Profit and Net Profit) :

মুনাফা দুই প্রকার : মোট মুনাফা ও নীট মুনাফা। উৎপাদনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে জমির খাজনা, মূলধনের সুদ ও শ্রমিকের মজুরী দিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকে তাহা উৎপাদকের মোট মুনাফা। এই মোট মুনাফার মধ্যে কয়েকটি উপাদান থাকিতে পারে ; যথা, সংগঠকের নিজস্ব শ্রমের মজুরী, তাহার নিজস্ব মূলধনের সুদ ও নিজস্ব জমির খাজনা ইত্যাদি। মোট মুনাফা হইতে এই উপাদানগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট মুনাফা।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Profit):

মুনাফার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায় : প্রথমতঃ, মুনাফা একেবারে নাও হইতে পারে। কিন্তু, খাজনা, সুদ ও মজুরী কখনও শূন্য হইতে পারে না। প্রতি বৎসর দেখা যায় কয়েকটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের লোকসান হয়, আর কিছু প্রতিষ্ঠান কোন রকমে উৎপাদন-ব্যয় বহন করিয়া টিকিয়া থাকে ; কয়েকটি সংগঠন মুনাফা অর্জন করে।

দ্বিতীয়তঃ, অন্য যে কোন আয় অপেক্ষা মুনাফার হ্রাসবৃদ্ধি বেশী হয়। মূল্য পরিবর্তনের ফলে খাজনা, মজুরী বা সুদের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতি (Inflation) ও মুদ্রা-সংকোচের (Deflation) ফলে মুনাফার পরিমাণের বিশেষ পরিবর্তন হয়।

তৃতীয়তঃ, মুনাফা অন্যান্য আয়ের মত চুক্তিবদ্ধ ও সুনিশ্চিত আয় নয়। ইহা এক প্রকারের অনিশ্চিত উদ্বৃত্ত। কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের মজুরী পূর্বনির্ধারিত ও সুনিশ্চিত ; কিন্তু তাহার মালিকের আয় বা মুনাফা অনিশ্চিত। আধুনিক অর্থনীতিক ব্যবস্থা বিশেষ জটিল। ইহার ভবিষ্যৎ গতিপথ খুবই অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তার জন্য মুনাফার পরিমাণও অন্যান্য আয়ের মত সুনির্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত হইতে পারে না।

মুনাফার উপাদান (Elements of Profit) :

মুনাফা কয়েকটি উপাদান লইয়া সংগঠিত : (ক) সংগঠনের প্রতিদান : সংগঠক উৎপাদন ব্যবস্থার যাবতীয় কার্যের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে। উৎপাদনের পরিমাণ ও পদ্ধতি নির্বাচন, উপাদানসমূহের সংগ্রহ ও ইহাদের মধ্যে সুসম সমন্বয় বিধান এবং উপাদানসমূহের মধ্যে বিক্রয়লব্ধ অর্থের সুষ্ঠু বণ্টন সমস্ত দায়িত্বই সংগঠককে লইতে হয়। অর্থাৎ, সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থার সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সুষ্ঠু পরিকল্পনার গুরুভার সংগঠককে বহন করিতে হয়। ইহার প্রতিদান হিসাবে সংগঠক মুনাফা অর্জন করে।

(খ) উৎপাদনের ঝুঁকি বহনের প্রতিদান : আধুনিক জটিল অর্থনীতি ব্যবস্থায় উৎপাদককে প্রচুর ঝুঁকি বহন করিতে হয়। বাজারের অনিশ্চয়তা, ক্রেতার রুচি পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে বাজার মূল্যের সুতীব্র হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহনের পুরস্কার হিসাবে সংগঠক মুনাফা পাইয়া থাকে।

(গ) একচেটিয়া ব্যবসায়ের মুনাফা : অনেক সময়ে ব্যবসায়ে একাধিপত্য দেখা যায়। উৎপাদনকারী যদি একচেটিয়া কারবারী হয় তাহা হইলে তাহার বাজারে প্রতিযোগিতার আশঙ্কা থাকে না। ফলে, পূর্ণপ্রতিযোগিতার বাজারে যে মুনাফা পাওয়া যায় তদপেক্ষা বেশী মুনাফা একচেটিয়া কারবারী পাইয়া থাকে।

(ঘ) আকস্মিক মুনাফা : বাজারের অনিশ্চয়তার জন্য মূল্যের আকস্মিক

হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। নানাবিধ আকস্মিক কারণে (হঠাৎ যুদ্ধ সুরু হইলে) কোন বস্তুর চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে ; ফলে, ইহার মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং এই বস্তুর উৎপাদনকারী ব্যবসায়ীর মুনাফাও হঠাৎ বাড়িয়া যাইবে।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) ঃ

মুনাফার অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও একথা বলা যায় যে, সংগঠক তাহার সংগঠন ক্ষমতার প্রতিদান হিসাবে যদি ন্যূনতম পুরস্কার না পায়, তাহা হইলে দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহার পক্ষে ব্যবসায় চালান সম্ভব হয় না। সুতরাং দীর্ঘকালের ব্যবধানে সংগঠক স্বাভাবিক মুনাফা অর্জন করে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ মার্শালের মতে, স্বাভাবিক মুনাফা হইল (ক) সংগঠনের প্রতিদান ও (খ) ঝুঁকি বহনের প্রতিদান এই দুইয়ের সমষ্টি। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই স্বাভাবিক মুনাফা সংগঠক নাও পাইতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালের ব্যবধানে ইহা অর্জন না করিতে পারিলে, তাহার পক্ষে ব্যবসায়ে টিকিয়া থাকা সম্ভব হয় না। সুতরাং স্বাভাবিক মুনাফা স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যয়ের অংশ।

প্রশ্নাবলী

. What are the chracteristics of profit as a factor income? Distinguish between gross profit, net profit and normal profit.

(উপাদানের আয় হিসাবে মুনাফার বৈশিষ্ট্য কোথায়? মোট মুনাফা, নীট মুনাফা ও স্বাভাবিক মুনাফার মধ্যে পার্থক্য কি?) (পৃঃ ৮৪-৮৬ দেখ)

2. What are the elements of profit?

(মুনাফার উপাদানগুলি কি কি?) (পৃঃ ৮৫-৮৬ দেখ)

———

ষোড়শ অধ্যায়

মুদ্রা (Money)

শ্রমবিভাগের ফলে এক একটি জিনিসের উৎপাদন এক এক শ্রেণীর লোক করিয়া থাকে। চাষী চাষ করে, তাঁতী কাপড় বোনে, মুচি জুতা প্রস্তুত করে ইত্যাদি। এইরূপ শ্রমবিভাগের জন্য বস্তু বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। চাষীর কাপড়ের প্রয়োজন আছে, তাঁতীর চালের প্রয়োজন আছে। অতএব, উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের সমস্যা দেখা দেয়। চাষী তাঁতীর নিকট হইতে চালের বিনিময়ে কাপড় কিনিবে ; আবার তাঁতী চাষীর নিকট হইতে কাপড়ের বিনিময়ে চাল কিনিবে। বস্তুর এইরূপ সরাসরি বিনিময়রীতিকে প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথা (Barter) বলে।

প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার কতকগুলি অসুবিধা আছে।

(ক) দুই পক্ষের প্রয়োজন পরিপূরক না হইলে বস্তুর প্রত্যক্ষ বিনিময় সম্ভব হয় না। যে তাঁতী কাপড়ের বিনিময়ে চাল পাইতে চায়, তাহাকে এমন একটি লোক খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে যাহার শুধু চাল থাকিলেই চলিবে না, চালের বিনিময়ে কাপড় গ্রহণ করিবার ইচ্ছাও তাহার থাকা চাই। এই অবস্থা, স্বভাবতঃই, বিশেষ অসুবিধাজনক।

(খ) বস্তুর অবিভাজ্যতার জন্য প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অনেক সময় একটি জিনিসকে ভাগ করিয়া বিনিময় করা অসম্ভব হয়। যেমন, ধরা যাক্, এক ব্যক্তির একটি ছাগল আছে। সে ঐ ছাগলের বিনিময়ে কাপড়, চিনি ও তেল পাইতে চায়। যদি, একই লোকের কাছে কাপড়, চিনি ও তেল পাওয়া যায় তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির ছাগলের বিনিময়ে এই জিনিসগুলি পাইতে হয়ত কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু, যদি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কাপড়, চিনি ও তেল পাইতে হয় তবে, পূর্বোক্ত ব্যক্তির এই জিনিসগুলি পাইবার কোন উপায় থাকে না। কারণ, ছাগলটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিনিময়ে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে কাপড়, চিনি ও তেল সংগ্রহ করা সম্ভব নয়।

(গ) মূল্য পরিমাপক কোন সর্বগ্রাহ্য মাধ্যমের অভাবে প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় একটি বস্তুর বিনিময়ে অন্য একটি বস্তু পাওয়া যায়। বিভিন্ন জিনিসের মূল্যবোধক কোন সাধারণ মাধ্যম এই ব্যবস্থায় থাকে না। তাহার ফলে, বিভিন্ন বস্তুর পৃথক পৃথক বিনিময় হার প্রচলিত থাকে। বস্তুর সংখ্যা বেশী হইলে বিনিময় হারের সংখ্যা ও জটিলতাও বৃদ্ধি পায়। কতটুকু চিনির বিনিময়ে কতটুকু তেল, লবণ, ডাল ইত্যাদি পাওয়া যায়, তাহা জানিতে হইলে চিনির সহিত প্রত্যেকটি বস্তুর পৃথক পৃথক বিনিময়হার জানা দরকার।

প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার উপরোক্ত অসুবিধাগুলি দূর করিবার জন্যই মুদ্রার প্রচলন হইয়াছে। যে কোনো বস্তু মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রয় করা সম্ভব এবং এই বিক্রয়লব্ধ অর্থের দ্বারা অন্য বস্তু ক্রয় করা যায়। মুদ্রার প্রচলনের ফলে সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির স্ব স্ব অভাব মিটাইবার কোন অসুবিধা হয় না। দুই ব্যক্তির অভাব পরিপূরক না হইলেও উহাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র অভাব সন্তুষ্ট করিবার কোন অসুবিধা হয় না। তাঁতীকে চাল পাইবার জন্য এখন আর চাল উৎপাদনকারী চাষীর শরণাপন্ন হইতে হয় না। সে তাহার কাপড় মুদ্রার বিনিময়ে কাহাকেও বিক্রয় করিয়া সেই টাকা দিয়া চাল ক্রয় করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রার বিভাজ্যতার জন্য প্রত্যক্ষ বিনিময় প্রথার দ্বিতীয় অসুবিধা দূর হইয়াছে। প্রত্যেক দেশেই বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা (যেমন, ১০০ টাকার নোট, দশ টাকার নোট প্রভৃতি) প্রচলিত থাকে। ইহার ফলে, এখন কাপড়, চিনি ও তেল ক্রয়েচ্ছু ছাগলের মালিকের পক্ষে মুদ্রার বিনিময়ে ছাগল বিক্রয় করিয়া বিক্রয়লব্ধ অর্থের অংশবিশেষের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্ন বিক্রেতার নিকট হইতে বস্তুগুলি কিনিতে কোন অসুবিধা হয় না।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা সর্বগ্রাহ্য মূল্যপরিমাপক মাধ্যম বলিয়া বিভিন্ন বস্তুর বিনিময়হার মুদ্রামূল্যের দ্বারা নির্ধারণ করিতে পারা যায়।

মুদ্রার সংজ্ঞা (Definition of Money) :

অন্য বস্তু হইতে মুদ্রার একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। মুদ্রার বৈশিষ্ট্য ইহার সর্বগ্রাহ্যতা (Liquidity)। এই সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতার জন্য মুদ্রা ব্যাপক বিনিময়ের পক্ষে অপরিহার্য। অন্য যে কোন বস্তু আমরা গ্রহণ করি

বস্তুটি সরাসরি ভোগ করিবার নিমিত্ত। কিন্তু মুদ্রার প্রয়োজন মুদ্রার জন্য নয়, মুদ্রার সাহায্যে যে সকল বস্তু ক্রয় করিতে পারি তাহাদের জন্য। যেমন, আমরা জামা কিনি পরিধান করিবার জন্য; কিন্তু, মুদ্রা এইভাবে প্রত্যক্ষ ভোগের কাজে লাগে না। এই প্রসঙ্গে কেয়ার্নক্রস (Cairncross)-এর সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য : "যাহা প্রথা বা আইনের মাধ্যমে বস্তু এবং কার্যের বিনিময়ে অথবা ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সাধারণতঃ বিনাদ্বিধায় গ্রাহ্য হয় তাহাই মুদ্রা" ("Money is, in fact, anything which, by custom or law, is generally acceptable without question in payment for goods and services or in final settlement of a debt")।

উৎকৃষ্ট মুদ্রার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of good money) :

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে চামড়া, মূল্যবান প্রস্তর, কড়ি ইত্যাদি মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। মুদ্রা কোন্ বস্তু-নির্মিত হইবে তাহা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বর্ণ নির্মিত, রৌপ্য নির্মিত বা কাগজী মুদ্রা যাহাই হউক না কেন, মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত হইতে হইলে বস্তুটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে ইহার সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা। মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত বস্তুর নিম্নলিখিত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত।

(১) মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত বস্তুটি সকল দেশে সকল লোকের কাছে গ্রহণযোগ্য হইলে ভাল হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যমুদ্রার এই বৈশিষ্ট্য থাকে।

(২) যে বস্তু মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে তাহা সহজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভাজ্য হইলে সুবিধা হয়। মুক্তা বা অন্য কোন মূল্যবান প্রস্তরকে খণ্ড খণ্ড করার অসুবিধা আছে এবং এইভাবে বিভাগ করিলে অংশগুলির মূল্য হ্রাস পাইতে পারে। স্বর্ণ বা রৌপ্যের ক্ষেত্রে এই অসুবিধা দেখা যায় না। ইহাদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ খণ্ডিত করিয়া মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিলে অংশগুলির মূল্য হ্রাস পায় না।

(৩) সঞ্চয়ের বাহন মুদ্রা। দুধ, চাল ইত্যাদি সঞ্চয় করা যায় না; কারণ ইহারা কিছুদিনের মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়; ফলে সম্পদকে সঞ্চিত করিতে হইলে এমন একটি বস্তুর প্রয়োজন হয় যাহার স্থায়িত্ব আছে। এদিক দিয়া, স্বর্ণ বা রৌপ্য দীর্ঘস্থায়ী বলিয়া সঞ্চয়ের যোগ্যতম বাহন।

(৪) সহজ-বহনযোগ্যতা উৎকৃষ্ট মুদ্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মুদ্রা হিসাবে

প্রচলিত বস্তুটি এমন হওয়া উচিত যাহাতে অক্লেশে উহাকে একস্থল হইতে অন্যস্থলে লইয়া যাওয়া যায়।

(৫) যে বস্তুটি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, তাহার মূল্য মোটামুটি স্থির থাকা উচিত। সাধারণতঃ উৎপাদনের তারতম্যের জন্য বিভিন্ন বস্তুর মূল্যের পরিবর্তন ঘটে। মুদ্রা হিসাবে প্রচলিত বস্তুর মূল্য এইরূপ পরিবর্তিত হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের অসুবিধা হয়। স্বর্ণ বা রৌপ্যকে মুদ্রা হিসাবে ব্যবহার করিলে এই অসুবিধাটি হয় না। কারণ, স্বর্ণ বা রৌপ্যের মূল্য মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে।

(৬) মুদ্রা-হিসাবে প্রচলিত বস্তুর সমধর্মিত্ব (Homogeneity) থাকা উচিত। স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বা গুণটি সব সময়ে অপরিবর্তিত থাকে। অন্য কোন বস্তুর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। ফলে, স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইলে গুণগত পার্থক্যের কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।

(৭) মুদ্রা-হিসাবে ব্যবহৃত বস্তুটি এমন হওয়া চাই, যেন সহজেই উহাকে চিনিয়া লওয়া যায়। সেইজন্য স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা-হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

মুদ্রার কার্যাবলী (Functions of Money) ঃ

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মুদ্রার বিবিধ কার্যাবলী পরিলক্ষিত হয় ঃ

প্রথমতঃ, মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম। প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় বস্তুর পরিবর্তে বস্তু পাওয়া যাইত। ইহার যথেষ্ট অসুবিধা আছে। মুদ্রার ব্যবহারে এই অসুবিধা দূর হইয়াছে। চাষী চালের পরিবর্তে বস্ত্রগ্রহণে অনিচ্ছুক হইলেও মুদ্রা গ্রহণে অনিচ্ছুক হইবে না। এইভাবে মুদ্রা দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়ের সহায়তা করে।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বস্তুর মূল্য পরিমাপ করা হয় মুদ্রার সাহায্যে। কোন একটি বস্তুর মূল্য বলিতে বুঝায় যে, সেই বস্তুর বিনিময়ে অন্য বস্তু কতখানি পাওয়া যায়। সুতরাং বস্তুর সংখ্যা যত হইবে বিনিময় হারেরও সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যক্ষ বিনিময় ব্যবস্থায় এই জটিলতা পরিলক্ষিত হইত। মুদ্রার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইয়াছে। এখন প্রত্যেকটি বস্তুর মূল্য একটি মাত্র মাধ্যম অর্থাৎ মুদ্রার সাহায্যেই পরিমাপ করা হয়।

তৃতীয়তঃ, সঞ্চয়ের বাহনরূপে মুদ্রার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। আয়ের সমস্ত অংশ আমরা সঙ্গে সঙ্গে ব্যয় করি না। ভবিষ্যতের জন্য ইহার কিছু অংশ সঞ্চয় করিয়া রাখি। ভবিষ্যতে কিছু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে, আকস্মিক কোন ব্যয় বহন করিবার প্রয়োজনে আমরা আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করি। এই সঞ্চয় কার্যে মুদ্রা সহায়তা করে। অন্যান্য বস্তু (দুধ, চাল ইত্যাদি) সঞ্চয় করিয়া রাখিলে নষ্ট হইয়া যাইবার আশঙ্কা থাকে; অথবা, ইহাদের প্রয়োজন ভবিষ্যতে নাও থাকিতে পারে। কিন্তু মুদ্রা সঞ্চয় করিলে এইরূপ কান অসুবিধা হয় না।

চতুর্থতঃ, ভবিষ্যতে ঋণ পরিশোধের বাহনরূপে মুদ্রার গুরুত্ব আছে। আমরা ঋণ গ্রহণ করি বর্তমানের প্রয়োজনে, কিন্তু ঋণ পরিশোধ করি ভবিষ্যতে। অন্যান্য বস্তুর মূল্য সাধারণতঃ পরিবর্তনশীল; বর্তমানে একটি বস্তুর যাহা মূল্য, ভবিষ্যতে সেই মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইতে পারে। সুতরাং ভবিষ্যতে পরিশোধনীয় ঋণের মান হিসাবে অন্যান্য বস্তুকে গ্রহণ করায় অসুবিধা আছে। মুদ্রার প্রচলনের ফলে এই অসুবিধা অনেকাংশে দূর হইয়াছে। মুদ্রার মূল্য সহজে পরিবর্তনশীল নয় বলিয়া ভবিষ্যতে পরিশোধযোগ্য ঋণের মান হিসাবে ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং, ঋণ-পরিমাপক মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলনের ফলে টাকাকড়ির লেনদেনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

পঞ্চমতঃ, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। মুদ্রার সাহায্যেই ব্যক্তির আয় ও ব্যয় পরিমাপ করা হয় কি পরিমাণ সঞ্চয় করা উচিত ইহা পরিকল্পনা করা সম্ভব হয় মুদ্রা ব্যবস্থার জন্যই। আবার, উৎপাদনকারী কি পরিমাণ উপাদান নিয়োগ করিবে—এই সমস্ত হিসাবনিকাশ করা হয় মুদ্রার মাধ্যমেই। পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা। সেইজন্য, ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতির হিসাব নিকাশের বাহন এমন হওয়া উচিত যাহার মূল্য ভবিষ্যতে মোটামুটি স্থির থাকে। মুদ্রার মূল্য মোটামুটি স্থির থাকে বলিয়া অর্থ নৈতিক পরিকল্পনায় ইহার ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

মূল্যস্তরের পরিবর্তন (Changes in price-level) :

সুপরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার জন্য মুদ্রামূল্যের স্থায়িত্ব একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু, মাঝে মাঝে মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন হওয়ার ফলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে।

মুদ্রামূল্য (Value of money) বলিতে বুঝায় মুদ্রার ক্রয়শক্তি। অর্থাৎ, ১ টাকায় যদি দুই সের চাল ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে টাকাটির মূল্য দুই সের চালের সমান। বিভিন্ন সময়ে দেখা যায় যে, মুদ্রার এই ক্রয়ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে ; অর্থাৎ. দ্রব্যের মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। কোন সময়ে জিনিসপত্রের মূল্য এক যোগে বৃদ্ধি পাইলে উহাকে মূল্যস্তরের সাধারণ বৃদ্ধি বলা হইয়া থাকে ; অর্থাৎ এই সময়ে মুদ্রামূল্য হ্রাস পাইয়া থাকে। অপরপক্ষে, যখন জিনিসপত্রের মূল্য হ্রাস পায়, তখন মূল্যস্তরের সাধারণ হ্রাস হইয়াছে বলা হয় ; এই অবস্থায় মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধির কারণ বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে অর্থনীতিবিদ্ ফিশারের (Fisher) তত্ত্বটিকে মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব (Quantity Theory of Money) বলা হয়। ফিশারের মতে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ, মুদ্রার মূল্য হ্রাস পায় ; অপরপক্ষে মুদ্রার পরিমাণ হ্রাস পাইলে মূল্যস্তর হ্রাস পায় ; অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সুতরাং, মুদ্রার পরিমাণ ও মূল্যস্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নির্ণয়ের তত্ত্বই মুদ্রার পরিমাণতত্ত্ব নামে অভিহিত।

মুদ্রার বৈশিষ্ট্য হইল যে, ইহার কোন নিজস্ব প্রয়োজন বা চাহিদা নাই। বিভিন্ন বস্তু ক্রয়বিক্রয়ের জন্যই ইহার চাহিদা দেখা যায়। স্বল্পকালে, বস্তুর পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। তেমনই স্বল্পকালে মুদ্রার প্রচলনগতি (অর্থাৎ, কোন নির্দিষ্ট সময়ে একটি মুদ্রা কতবার হস্তান্তরিত হয়) মোটামুটি নির্দিষ্ট থাকে। অতএব, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে বস্তুর চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। বস্তুর পরিমাণ যদি পূর্ববৎ স্থির থাকে এবং মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে, বস্তুর চাহিদা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ধিত চাহিদার জন্য বস্তুর মূল্যস্তরেরও বৃদ্ধি হইবে।

ফিশারের উপরোক্ত তত্ত্বের মূল বক্তব্য—মুদ্রার পরিমাণ ও বস্তুর মূল্যস্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ ও সরাসরি যোগাযোগ আছে। মুদ্রার পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধির উপর বস্তুর মূল্যস্তরের হ্রাসবৃদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু আধুনিক অর্থনীতিবিদরা ফিশারের এই তত্ত্ব সমর্থন করেন না। মুদ্রার পরিমাণ ও মূল্যস্তরের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ কার্যকারণ সম্পর্ক নাই। কোন কোন সময়ে দেখা যায় যে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় না। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে সুদের হার হ্রাস পায়। কিন্তু যদি কোন কারণে

ব্যবসায়ীরা এই কম সুদেও ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত বোধ না করে তাহা হইলে জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি পাইবে না। আয় বৃদ্ধি না পাইলে জনসাধারণের ব্যয়ও বাড়িবে না ; ফলে, দ্রব্য সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না এবং মূল্যস্তরও বৃদ্ধি পাইবে না।

সুতরাং, উপরোক্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে মূল্যস্তরের সহিত প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আয়ের,—মুদ্রার পরিমাণের নয়। আয় বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্য সামগ্রীর মোট চাহিদা (Effective Demand) বৃদ্ধি পায়। আধুনিক লেখকদের মতে মূল্যস্তর পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ কারণ আয়ের পরিবর্তন।

মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রাসঙ্কোচ (Inflation and Deflation) :

সাধারণতঃ মনে করা হয় যে, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায় ; এই মূল্যবৃদ্ধিই মুদ্রাস্ফীতি। কিন্তু আধুনিক অর্থ নৈতিক আলোচনায় মুদ্রাস্ফীতির একটি বিশেষ অর্থ আছে। কোন দেশ উৎপাদনের উপাদানসমূহের পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment of the Factors of Production) না হওয়া পর্যন্ত, মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা সত্ত্বেও, মুদ্রাস্ফাতি ঘটে না। মুদ্রাস্ফীতি তখনই দেখা যায় যখন পূর্ণ কর্মসংস্থানের পরেও মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে অতিরিক্ত আয়ের সৃষ্টি হয়।

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের উপাদানসমূহের সুষ্ঠু নিয়োগের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি উৎপাদনও সমানুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমতা থাকে। ফলে, দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য-স্তরের বৃদ্ধি ঘটে না। কিন্তু, এইরূপে আয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে পাইতে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হয়, যে সমগ্র উৎপাদনের উপাদানের পূর্ণ নিয়োগ ঘটে, এবং ফলে, অব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদান আর পাওয়া সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় যদি মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না, অথচ আয় বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। এই বর্ধিত আয়জনিত ব্যয়ের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব হয়।

ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশগুলিতে অব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদান থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। সাংগঠনিক অব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক

কারণে (যেমন ভারতবর্ষের কৃষিব্যবস্থা বহুলাংশে মৌসুমী বায়ুর উপর নির্ভরশীল) মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমানুপাতিক হারে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। ফলে, আয় বৃদ্ধি পাইলেও দ্রব্যসামগ্রীর যোগান সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। এই কারণে ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশগুলিতে অব্যবহৃত উৎপাদনের উপাদান থাকা সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির মত অবস্থার সৃষ্টি হয়। মুদ্রাস্ফীতির এই অবস্থাকে আংশিক মুদ্রাস্ফীতি (semi-inflation) বলা হইয়া থাকে।

মুদ্রাস্ফীতির বিপরীত অবস্থাকে অর্থনীতিতে মুদ্রাসঙ্কোচ বলা হয়। মুদ্রাসঙ্কোচকালে আয়, মূল্য ও উৎপাদন হ্রাস পাইয়া থাকে। মুদ্রার পরিমাণ কমিয়া যাওয়ার দরুণ আয় কমিয়া যায়। ফলে দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণও কমিয়া যায়। কিন্তু দেখা যায় যে, উৎপাদনের পরিমাণ যে হারে কমিতে থাকে আয়ের পরিমাণ তদপেক্ষা বেশী হারে কমিয়া যায়। ফলে, দ্রব্য সামগ্রীর সাধারণ মূল্যস্তর হ্রাস পায়। এই অর্থনৈতিক অবস্থাকে মুদ্রা-সঙ্কোচ বলা হয়।

মুদ্রাস্তর পরিবর্তনের প্রভাব (Effects of changes in Price-level) :

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল :

(১) বণ্টন ব্যবস্থায় প্রভাব : মূল্যস্তরের পরিবর্তন হইলে জাতীয় আয়েরও পরিবর্তন ঘটে। মুদ্রাস্ফীতিকালে জাতীয় আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত আয় বিভিন্ন শ্রেণীর উপার্জনকারীর মধ্যে নানাভাবে বণ্টিত হয়। কোন কোন শ্রেণীর আয় চুক্তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট ; আবার, কোন কোন শ্রেণীর আয় অনির্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল।

(ক) শ্রমিকের মজুরী পূর্বনির্দিষ্ট এবং ইহার পরিবর্তন সময় সাপেক্ষ। মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি পায় না। শ্রমিক সংঘের (Trade Union) চাপে ধীরে ধীরে মজুরী বৃদ্ধি পায়। ফলে, মজুরী বৃদ্ধির হার মূল্যবৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হয়। সুতরাং মুদ্রা-মজুরী বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের প্রকৃত মজুরী হ্রাস পায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আয়ও পূর্ব-চুক্তির দ্বারা স্থির থাকে বলিয়া তাহারাও মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঠিক এই কারণে পেন্সনভোগীদের প্রকৃত আয় হ্রাস পায়।

(খ) সুদের হার পূর্বচুক্তি অনুসারে নির্দিষ্ট। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের মূল্য হ্রাস পায়। এইজন্য, এই অবস্থায় ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঋণদাতা ঋণ-গ্রহণকারীর নিকট হইতে সমপরিমাণ অর্থ পায়, কিন্তু এই অর্থের সমপরিমাণ ক্রয়শক্তি পায় না। ফলে তাহার প্রকৃত আয় হ্রাস পায়।

(গ) বাড়ীওয়ালা প্রভৃতি খাজনাভোগীদের আয় পূর্বচুক্তিদ্বারা নির্ধারিত থাকে। ফলে, মুদ্রাস্ফীতিকালে তাহাদের আয় বিশেষ বৃদ্ধি পায় না, অথচ জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ প্রকৃত আয় কমিয়া যায়।

(ঘ) মুদ্রাস্ফীতিকালে সর্বাপেক্ষা লাভবান হয় ব্যবসায়ীরা। ইহাদের মুনাফা চুক্তিদ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট থাকে না। অতএব, মূল্যবৃদ্ধি পাইলে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। বস্তুর মূল্য যে হারে বৃদ্ধি পায় উৎপাদন ব্যয় সে হারে বৃদ্ধি পায় না। ফলে, ব্যবসায়ীগণ অতিরিক্ত মুনাফা উপার্জন করে। উপরন্তু, ঋণ-গ্রহণকারী হিসাবে ইহারা লাভবান হয়। তাহারা যে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রাঋণ গ্রহণ করিয়াছে, তাহা স্বল্প পরিমাণ বস্তু বিক্রয় করিয়া পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়।

(২) উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব : উৎপাদন কার্য মুনাফার প্রত্যাশায় পরিচালিত হয়। মুদ্রাস্ফীতিকালে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এই সময় উৎপাদন-কারীরা উৎপাদনকার্য সম্প্রসারণ করিতে উৎসাহ বোধ করে ; ফলে, কর্মসংস্থান ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। তবে, যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের উপাদানগুলির পূর্ণনিয়োগ না ঘটে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উপাদানগুলির পূর্ণনিয়োগ ঘটিলে উৎপাদন আর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

মুদ্রাসঙ্কোচের ফলাফল

(১) বণ্টন ব্যবস্থায় প্রভাব : মুদ্রাসঙ্কোচকালে শ্রমিক সম্প্রদায়ের সুবিধা ও অসুবিধা দুইই হইয়া থাকে। যাহারা কর্মে নিযুক্ত থাকে তাহাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়, ফলে ইহাদের সুবিধা হয়। কিন্তু মুদ্রাসঙ্কোচকালে অনেক শ্রমিক কর্মহীনও হয় বলিয়া শ্রমিক সম্প্রদায়ের দুর্গতিও হইয়া থাকে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য। পেন্সনভোগীরা এবং নির্দিষ্ট হারে খাজনাভোগীরা মুদ্রাসঙ্কোচকালে লাভবান হয়। মুদ্রা আয় সুনির্দিষ্ট থাকে বলিয়া তাহাদের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়। সুদের হার পূর্বনির্দিষ্ট থাকে বলিয়া

ঋণদাতাও লাভবান হয়। তাহারা যে অর্থ ঋণ হিসাবে দেয় সেই পরিমাণ অর্থ ফিরিয়া পাওয়ায়, তাহারা অধিক পরিমাণ সামগ্রী ক্রয় করিতে পারে। ঠিক একই কারণে ঋণগ্রহণকারী মুদ্রাসঙ্কোচকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মুনাফা হ্রাস পায়; অল্প মূল্যে মজুতমাল বিক্রয় করিতে হয় বলিয়া ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়।

(২) উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রভাব: মুদ্রাসঙ্কোচকালে মূল্য হ্রাস পাওয়ায় ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হয়। ফলে, কলকারখানা বন্ধ হইয়া যায় ও উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এইজন্য, অনেক শ্রমিক বেকার হইয়া পড়ে এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What are the difficulties of barter? How are these difficulties overcome by the introduction of money?

(প্রত্যক্ষ বিনিময়ের অসুবিধা কি? মুদ্রা ব্যবহারের ফলে এই সকল অসুবিধা দূর হয় কিরূপে?) (পৃঃ ৮৭-৮৮ দেখ)

2. What are the functions of money? How does money facilitate production and distribution?

(মুদ্রার কার্যাবলী বর্ণনা কর। উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যাপারে মুদ্রা কিভাবে সহায়তা করে?) (পৃঃ ৯০-৯১ দেখ)

3. What are the qualities of good money?

(উৎকৃষ্ট মুদ্রার মধ্যে কি কি গুণ থাকা আবশ্যক?) (পৃঃ ৮৯-৯০ দেখ)

4. Describe the effects of a rise or fall in the value of money on the different classes of people in society.

(সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের উপর মুদ্রামূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাব বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৯৪-৯৬ দেখ)

5. What exactly do you mean by inflation? What are the effects of inflation in a country?

(মুদ্রাস্ফীতি বলিতে প্রকৃতপক্ষে কি বুঝ? দেশে মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা কর।) (পৃঃ ৯৩-৯৪, ৯৪-৯৫ দেখ)

6. Explain the Quantity Theory of Money. What are the shortcomings of this theory?

(মুদ্রার পরিমাণতত্ত্বটি ব্যাখ্যা কর ও এই তত্ত্বের অসম্পূর্ণতা নির্দেশ কর।) (পৃঃ ৯২-৯৩ দেখ)

সপ্তদশ অধ্যায়

ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা (Banking System)

ব্যাঙ্ক ঃ

ব্যাঙ্ক এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহার প্রধান কাজ ধারের লেনদেন করা। ইহাকে আর্থিক ব্যাপারে মধ্যস্থ মনে করা যাইতে পারে। সঞ্চয় সংগ্রহ করা এবং এই সংগৃহীত অর্থ ধার দেওয়া—ইহাই ব্যাঙ্কের বৈশিষ্ট্য। ব্যাঙ্ক শেয়ার-হোল্ডারদের (share holders) কাছ হইতে মূলধন সংগ্রহ করে। কোন ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ সরকারকে ধার দেয়, কোন ব্যাঙ্ক ধার দেয় প্রধানতঃ শিল্প-ব্যবসায়ীদের। কেহ অল্প সময়ের জন্য লেনদেন করে, আবার কেহ সুদীর্ঘ সময়ের জন্য লেনদেন করে।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (Functions of Banks) ঃ

ধারের লেনদেন করাই ব্যাঙ্কের প্রধান কাজ। জনসাধারণের মধ্যে যাহারা সঞ্চয় করে তাহাদের নিকট হইতে সুদসহ পরিশোধের অঙ্গীকারে ব্যাঙ্ক টাকা ধার লয়। মূলধন হিসাবে যাহারা অর্থ বিনিয়োগ করিতে চায় নির্দিষ্ট সুদে ব্যাঙ্ক ঐ সংগৃহীত টাকা তাহাদের ধার দেয়।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলীকে নিম্নলিখিতভাবে আলোচনা করা যায় ঃ

(ক) আমানত গ্রহণ (Deposit) ঃ অনেকে আয়ের কিছু অংশ সঞ্চয় করিয়া থাকে। এই সঞ্চয়কে নিরাপদে ব্যাঙ্কের হেপাজতে রাখা যায়। ইহাতে সঞ্চিত অর্থ নিরাপদ থাকে এবং ইহার উপর কিছু সুদও পাওয়া যায়। যে অর্থ জনসাধারণের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক ধার লয় তাহাকে ব্যাঙ্কের আমানত (Deposit) বলে। আমানত দুই প্রকারের,—চলতি আমানত (Current Deposit) ও স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit)। যে গচ্ছিত অর্থ আমানতকারী ব্যাঙ্ক হইতে ইচ্ছামত যে কোন সময়ে উঠাইতে পারে তাহাকে চলতি আমানত বলে। স্থায়ী আমানত এরূপ ইচ্ছামত উঠান যায় না। এইরূপ গচ্ছিত অর্থ উঠাইতে হইলে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে পূর্ব হইতে ব্যাঙ্ক

কর্তৃপক্ষকে জানাইতে হয়। চলতি আমানত অপেক্ষা সাধারণতঃ স্থায়ী আমানতের উপর ব্যাঙ্ক উচ্চহারে সুদ দিয়া থাকে। ইহা ছাড়াও আর এক শ্রেণীর আমানত আছে। ইহাকে বলা হয় সঞ্চয় আমানত (Savings Deposit)। এইরূপ গচ্ছিত অর্থ হইতে সাধারণতঃ সপ্তাহে একবারের বেশী টাকা তোলা যায় না। সমস্ত গচ্ছিত অর্থ উঠাইতে হইলে পূর্ব হইতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিতে হয়। সঞ্চয় আমানতের উপর সুদের হার সাধারণতঃ চলতি আমানতের উপর হার অপেক্ষা বেশী ও স্থায়ী আমানতের উপর হার অপেক্ষা কম হয়।

(খ) ঋণদান (Lending): সঞ্চয়কারী ব্যাঙ্ক হইতে তাহার গচ্ছিত অর্থ সাধারণতঃ সমস্তই উঠায় না। অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিতে পারে যে প্রতিবৎসর শতকরা কত টাকা আমানতকারীরা তুলিয়া থাকে। আমানতের বাকী অংশ শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ ধার দিয়া থাকে। ঋণ-গ্রহণকারীর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক মূল্যবান সামগ্রী বন্ধক (Security) (যেমন, স্বর্ণ, সরকারী কাগজ ইত্যাদি) রাখিয়া ঋণ দিয়া থাকে। এইরূপ অর্থ ধার দিয়া ব্যাঙ্ক নির্দিষ্টহারে সুদ পায়। ইহাই ব্যাঙ্কের আয়।

(গ) মুদ্রা সৃষ্টি (Creation of Money):

ব্যাঙ্ক মুদ্রাসৃষ্টির কার্যেও সাহায্য করে। ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে হইলে চেকের সাহায্যে তুলিতে হয়। যেমন, এক ব্যক্তির ব্যাঙ্কে ৫০,০০০ টাকা আছে। কর্পোরেশনকে ট্যাক্স দিতে গিয়া সে নগদ টাকাও দিতে পারে অথবা চেকের সাহায্যেও দিতে পারে। যদি সেই ব্যক্তি চেকের সাহায্যে ট্যাক্স দেয়, তাহা হইলে এক্ষেত্রে চেক্ মুদ্রার কাজ করিল।

(ঘ) ডিসকাউন্ট (Discount): একটি ভবিষ্যতে আদায়যোগ্য বিলের (Bill) পরিবর্তে উহার বর্তমান মূল্য দেওয়াকে ডিসকাউন্ট্ বলা হয়। যেমন, একটি ৫০০০৲ টাকার বিলের টাকা আদায় হইবে ৪ মাস পরে। ব্যাঙ্ক শতকরা বার্ষিক ৩৲ টাকা সুদে ঐ বিল ডিসকাউন্ট করিতে স্বীকৃত হইলে, ইহার অর্থ হইল যে, বর্তমানে ব্যাঙ্ক ঐ বিলের মূল্য ৫০০০৲ টাকা হইতে ৩৲ টাকা হারে ৪ মাসের সুদ কাটিয়া লইয়া বাকীটা বিলের মালিককে দিতে রাজী

আছে। ৩৲ টাকা হারে ৫০০০৲ টাকার সুদ ৪ মাসে ৫০৲। অতএব, ব্যাঙ্ক বিলের মালিককে দিবে (৫০০০৲ – ৫০৲) অর্থাৎ ৪৯৫০৲ টাকা। চার মাস পরে বিল হইতে ব্যাঙ্ক ৫০০০৲ টাকা আদায় করিয়া লইবে। এক্ষেত্রে ৫০৲ টাকা ব্যাঙ্কের আয়।

(ঙ) অন্যান্য কার্যাবলী (Miscellaneous functions):

উপরোক্ত কার্যাবলী ছাড়াও ব্যাঙ্ক আরও অনেক কাজ করিয়া থাকে। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে দেশের মধ্যে একস্থান হইতে স্থানান্তরে টাকাকড়ি পাঠান সম্ভব। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক দেশের টাকার সহিত অন্য দেশের টাকার বিনিময় ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ব্যাঙ্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্য করে। ইহা ছাড়া ব্যাঙ্ক গ্রাহকদের স্বার্থে নানাবিধ কাজ করে—সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ, আয়ব্যয়ের হিসাব রাখা, শেয়ার ক্রয়বিক্রয় ইত্যাদি।

উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুবিধা (Advantages of a good Banking System):

উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা আর্থিক জীবনের সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। সরকারী ও ব্যবসায়ীর মধ্যে সংযোগ-সেতুর কাজ করে ব্যাঙ্ক।

(১) সঞ্চয়কারী তাহার সঞ্চিত অর্থ মূলধন সৃষ্টির কার্যে নিয়োগ নাও করিতে পারে। আবার, মূলধনের ব্যবহারে যাহারা আগ্রহী তাহাদের নিজেদের সঞ্চয় নাও থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক সঞ্চয়কারীর অব্যবহৃত অর্থ ব্যবসায়ীকে ধার দিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত কল্যাণ করে।

(২) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নত হইলে জনসাধারণের সঞ্চয়ের ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়। ইহার কারণ, প্রথমতঃ, টাকা গচ্ছিত রাখার নিরাপদ প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্ক; দ্বিতীয়তঃ, গচ্ছিত অর্থের উপর ব্যাঙ্ক সুদ দেয়। এইজন্য উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা থাকিলে দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

(৩) দেশের আর্থিক উন্নতি সুষ্ঠু ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। সঞ্চয় হইতেই মূলধনের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের মধ্যে সঞ্চয় করিবার উৎসাহ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের যোগান বৃদ্ধি করে। ইহার ফলে, দেশে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

অনগ্রসর দেশে উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভাবে অর্থনৈতিক অগ্রগতি

ব্যাহত হয়। জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে মূলধন বিনিয়োগের সহায়ক উৎকৃষ্ট ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার অভাব অনগ্রসর দেশগুলিতে পরিলক্ষিত হয়। দূর গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঘটিলে গ্রামবাসীদের সঞ্চয়ের স্পৃহা দেখা যাইতে পারে ; এবং এই সঞ্চয় উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ করা সম্ভব হইবে। গ্রামবাসীদের সঞ্চয় সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যেই ভারতের রাষ্ট্র-ব্যাঙ্ক (State Bank of India) গ্রামাঞ্চলে বহু নূতন নূতন শাখা প্রতিষ্ঠান খুলিয়াছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (Central Bank) :

একটি দেশের বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। ইহাদের মধ্যে সহযোগিতা থাকিলে আর্থিক ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা সম্ভব হয়। এইজন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করার জন্য প্রতি দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক থাকে। ইহা সাধারণতঃ রাষ্ট্র কর্তৃক পরিচালিত হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী নিম্নরূপ :

(ক) প্রত্যেক দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই নোট ছাপাইবার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে। ইহার ফলে মুদ্রাব্যবস্থার উপর কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যৌথ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্করূপে কাজ করে। যৌথ-ব্যাঙ্কগুলিতে আমানতকারীদের গচ্ছিত অর্থের কিছু অংশ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিতে হয়। কি পরিমাণ অর্থ জমা রাখিতে হইবে তাহা বিভিন্ন দেশে আইনের মাধ্যমে স্থির করা হয়। ইহার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলি প্রয়োজন মত টাকা ধার লইতে পারে। যখন ব্যাঙ্কের ঋণের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, অথচ, ইহা সংগ্রহ করিতে বিশেষ অসুবিধা হয়, তখন, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কই মূল্যবান সামগ্রী বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণ দিয়া থাকে।

ব্যাঙ্ক প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালন কার্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত আমানতের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতাকে সঙ্কুচিত করিতে পারে ; আবার, এই গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্কগুলির ঋণদানের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করিতে পারে। যৌথ ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণদানের নীতি নির্ধারণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব।

(গ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারের ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করে। ইহা সরকারী টাকাকড়ির হিসাব রক্ষক। সরকারকে স্বল্প মেয়াদী ঋণও এই ব্যাঙ্ক দিয়া থাকে। ইহার অন্যতম কাজ সরকারী ঋণের (Public debt) পরিচালনা করা।

(ঘ) দেশের মুদ্রার সহিত বিদেশের মুদ্রার বিনিময় হার রক্ষা করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম দায়িত্ব। বিদেশের সহিত দেশের দেনা-পাওনা মিটাইবার কাজে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(ঙ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, ইহা ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ কাজ করে। অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণে সরকারকে উপদেশ দেওয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অন্যতম দায়িত্ব। ইহার গবেষণা-বিভাগ দেশের বিভিন্ন আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া থাকে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন-মূলক বিভিন্ন কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সম্পাদন করে। যেমন, ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দীর্ঘমেয়াদী কৃষিঋণের ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. What is a bank? What are the functions of a bank?
(ব্যাঙ্ক কাহাকে বলে? ব্যাঙ্কের কাজ কি?) (পৃঃ ৯৭-৯৯ দেখ)
2. What are the functions of the central bank in a country?
(দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ কি?) (পৃঃ ১০০-১০১ দেখ)

অষ্টাদশ অধ্যায়

সরকারী অর্থসংস্থান ও ব্যয়বিধি

(Taxation and Expenditure)

আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণের জন্য ব্যাপক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ব্যক্তির আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রাষ্ট্র নানাবিধ কার্যের মাধ্যমে অর্থনৈতিক

জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। জনকল্যাণকর কার্য সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রের অর্থের প্রয়োজন হয়। এই অর্থসংস্থানের উৎস দুই প্রকারের—করলব্ধ অর্থ ও করব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে সংগৃহীত অর্থ।

(১) **কর** (Tax) : রাষ্ট্রের সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসাধারণকে প্রতিদানস্বরূপ কোনো নির্দিষ্ট উপকারের আশ্বাস না দিয়া সরকার বাধ্যতামূলকভাবে যে অর্থ সংগ্রহ করে, তাহাকেই কর বলা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনসাধারণ অর্থের প্রতিদানে সরকারের নিকট হইতে নির্দিষ্ট সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকে ; যেমন, ট্রেনের টিকিট কিনিতে আমরা যে অর্থ সরকারকে দিই, তাহার বিনিময়ে ট্রেণে ভ্রমণের নির্দিষ্ট সুবিধা আমরা ভোগ করি। কিন্তু, যদি আয়কর (Income tax) দিতে হয়, তবে, ইহার বিনিময়ে নির্দিষ্ট কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না।

(২) **সরকারী আয়ের অন্যান্য উৎস :**

(ক) সরকারী সম্পত্তি : সরকারের নিজস্ব কিছু কিছু সম্পত্তি থাকে ; যেমন, অরণ্য, খাসজমি ইত্যাদি। এই সমস্ত হইতে প্রতিবৎসর সরকারের আয় হইয়া থাকে।

(খ) সরকার পরিচালিত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান :

পোস্ট আফিস, রেল ব্যবস্থা ইত্যাদি। সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রতিবৎসর সরকারের যথেষ্ট আয় হয়।

(গ) ফী (Fee) :

কোন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সুবিধাদানের বিনিময়ে সরকার তাহার নিকট হইতে যে অর্থ পাইয়া থাকে তাহাকে ফী বলে। যেমন, আদালতে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে কোন ব্যক্তিকে কোর্ট ফী দিতে হয়।

(ঘ) জরিমানা (Fines and Penalties) :

কোন অপরাধের জন্য সরকার অপরাধীর নিকট হইতে যে জরিমানা আদায় করে তাহাও সরকারী আয়ের উৎস।

করনীতির সূত্র (Canons of Taxation) :

করনীতির ভালমন্দ বিবেচনা করিবার জন্য প্রাচীন ইংরাজ অর্থনীতিবিদ্

অ্যাডাম্ স্মিথ্ (Adam Smith) কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করিয়াছিলেন। এগুলিকে অ্যাডাম্ স্মিথের করনীতির সূত্র বলা হয়। সূত্রগুলি নিম্নরূপ :

(ক) সাম্যের সূত্র (Canon of Equity) :

প্রত্যেক নাগরিকের নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী কর ধার্য করা উচিত। নাগরিকের ক্ষমতা বলিতে তাহার আয়কে বুঝায়। অতএব, এই সূত্র অনুসারে, নাগরিকের আয়ের সমানুপাতিক কর ধার্য হওয়া উচিত।

(খ) নিশ্চয়তার সূত্র (Canon of Capacity) :

করপ্রথা এমন হওয়া উচিত যে, করদাতা যেন নিশ্চিতরূপে জানিতে পারে কি পরিমাণে এবং কোন্ নির্দিষ্ট সময়ে কর দিতে হইবে। যে করব্যবস্থায় কোন নিশ্চয়তা থাকে না, বা করের পরিমাণ প্রায়ই পরিবর্তিত হয় সেই ব্যবস্থাকে অভিপ্রেত করব্যবস্থা বলা যায় না। ভবিষ্যতে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে তাহা জানা সম্ভব না হইলে জনসাধারণের পক্ষে আয়ব্যয়ের সামঞ্জস্য করা কষ্টকর হইয়া পড়ে।

(গ) সুবিধার সূত্র (Canon of Convenience) :

করদাতার সুবিধার দিকে দৃষ্টি দিয়া কর ধার্য করা উচিত। অর্থাৎ, যেভাবে কর দিলে করদাতার অসুবিধা হয় না এবং যে সময় করদাতার পক্ষে কর প্রদান করা অসুবিধাজনক নয় সেইভাবে ও সেই সময়ে তাহার নিকট হইতে কর আদায় করা উচিত। যেমন, কৃষকদের নিকট হইতে কর আদায় করার উপযুক্ত সময় ঠিক ফসল উঠিবার পর।

(ঘ) ব্যয় সংক্ষেপের সূত্র (Canon of Economy) :

কর এমনভাবে ধার্য করা উচিত যে, করদাতাদের নিকট হইতে কর আদায়ের জন্য যে ব্যয় হয় তাহার পরিমাণ যেন খুব কম হয়। করদাতার নিকট যে অর্থ সংগৃহীত হয় তাহার একটি বৃহৎ অংশ যদি কর আদায় করিবার জন্য ব্যয়িত হয় তাহা হইলে করলব্ধ সরকারী আয় খুবই অল্প হয়।

(ঙ) স্থিতিস্থাপকতার সূত্র (Canon of Elasticity) :

অ্যাডাম্ স্মিথ্ নির্দেশিত উপরোক্ত সূত্রগুলি ছাড়াও আধুনিক অর্থনীতিবিদ্‌রা আরও দুটি নূতন সূত্রের উল্লেখ করেন। একটি হইল স্থিতিস্থাপকতার

সূত্র। প্রয়োজনানুসারে যে করের হার সহজেই পরিবর্তিত করা যায় তাহা উৎকৃষ্ট কর।

(চ) উৎপাদনশীলতার সূত্র (Canon of Productivity) :

কর এমন হওয়া উচিত যে, ইহার দ্বারা সরকারের প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় অথচ ব্যবসা বাণিজ্যের কোন ক্ষতি না হয়। ব্যবসা বাণিজ্যের উপরই জনসাধারণের আয় নির্ভরশীল। কর যদি এমন হয় যে, ইহাতে ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের আয় এই করের ফলে কমিয়া যাইবে। ফলে, সরকারী করলব্ধ আয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইবে।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর (Direct and Indirect taxes) :

প্রচলিত করগুলিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

যাহার উপর কর ধার্য করা হয় তাহাকেই যদি করভার বহন করিতে হয় তাহা হইলে ধার্য করটিকে প্রত্যক্ষ কর বলা হয়। এক্ষেত্রে করদাতার পক্ষে করের বোঝা অপর কাহারও উপর চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না। আয়কর এই প্রত্যক্ষ করের উদাহরণ। যাহার উপর আয়কর ধার্য করা হয় সে ব্যক্তিকেই করভার বহন করিতে হয় ; অন্য কাহারও স্কন্ধে তাহা চাপাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় না।

অপরপক্ষে, কর যদি এমন হয় যে, করদাতা করভার অপর কাহারও উপর চাপাইয়া দিতে পারে তবে এই করকে পরোক্ষ কর বলা হয়। বিক্রয় কর (Sales tax) এই ধরণের একটি পরোক্ষ কর। সরকার জুতার উপর কর ধার্য করিলে জুতা-ব্যবসায়ী ক্রেতাদের নিকট হইতে ঐ কর আদায় করিয়া লয়। জুতা-ব্যবসায়ী এক্ষেত্রে সরকারকে কর প্রদান করিবে বটে ; কিন্তু, করভার নিজে বহন না করিয়া সে ক্রেতাদের স্কন্ধে চাপাইয়া দিবে। অর্থাৎ, পরোক্ষভাবে ক্রেতারাই সরকারকে কর প্রদান করিবে। সাধারণতঃ ক্রেতারা পরোক্ষ কর সম্পর্কে সচেতন থাকে না ; ক্রীত বস্তুর মূল্যের অংশ হিসাবেই ক্রেতারা পরোক্ষ করকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

সুবিধা ও অসুবিধা (Merits and demerits) :

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি এইরূপ :

প্রত্যক্ষ করের সুবিধা ঃ

(১) প্রত্যক্ষ করের সুবিধা এই যে, যে ব্যক্তিকে এই কর দিতে হয় তাহাকেই করভার গ্রহণ করিতে হয় বলিয়া, তাহার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে জানিয়া শুনিয়া, নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়া কর প্রদান করা সম্ভব।

(২) প্রত্যক্ষ করের বেলায় করদাতার কর প্রদান করার ক্ষমতা অনুযায়ী করের হার হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। যেমন, আয় করের ক্ষেত্রে যাহার আয় বেশী তাহার উপর উচ্চহারে এবং যাহার আয় কম তাহার উপর নিম্নহারে কর বসান যায়।

(৩) প্রত্যক্ষ কর আদায় করিতে সাধারণতঃ ব্যয়ের পরিমাণ কম হয়। ফলে, ব্যয় সংক্ষেপের সূত্রটি প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়।

(৪) সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ কর পরোক্ষ কর অপেক্ষা অধিক স্থিতিস্থাপক। প্রত্যক্ষ করের হার স্বল্প বৃদ্ধি করিয়া রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(৫) প্রত্যক্ষ কর করদাতাদের সমাজ-সচেতন করে। যে ব্যক্তিকে কর দিতে হয়, তাহাকেই করভার বহন করিতে হয় বলিয়া, স্বভাবতঃই সেই ব্যক্তি জানিতে চাহে কেন কর আদায় করা হইতেছে, কি উদ্দেশ্যে করলব্ধ অর্থ ব্যয় হইবে ইত্যাদি। ফলে, প্রত্যক্ষ কর ব্যক্তিকে সুনাগরিক করিয়া তোলে।

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা ঃ

(১) প্রত্যক্ষ করের একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, করদাতাকেই করভার বহন করিতে হয় বলিয়া এই ধরণের কর করদাতার কাছে নিতান্তই অপ্রিয়।

(২) করদাতাদের কর ফাঁকি দিবার অপপ্রচেষ্টা প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে বেশী দেখা যায়। নিজের আয়ের একটি অংশ সচেতনভাবে সরকারকে দিতে হয় বলিয়া করদাতারা বিভিন্ন দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া কর ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে।

(৩) সকল শ্রেণীর জনসাধারণের নিকট হইতে প্রত্যক্ষ কর গ্রহণ করা যায় না। কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় ধনিকের উপরই সাধারণতঃ ইহা ধার্য করা হয়।

(৪) অনেক সময় প্রত্যক্ষ কর করদাতার কর্মস্পৃহাকে নিরুৎসাহিত করে।

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রত্যক্ষ করের হারও বৃদ্ধি পায়, তবে করদাতাদের আয় বৃদ্ধির ইচ্ছা হ্রাস পায়।

পরোক্ষ করের সুবিধা ঃ

(১) পরোক্ষ করের প্রধান বৈশিষ্ট্য, ইহা ধনীদরিদ্র নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর লোকের উপর প্রযোজ্য হয়। বই-এর উপর যে কর ধার্য করা হয় তাহা ধনীদরিদ্র সকল শ্রেণীর পুস্তক-ক্রেতাকেই দিতে হয়।

(২) পরোক্ষ করকে ক্রীত সামগ্রীর মূল্যের একটি অংশ হিসাবেই ক্রেতারা দেখিয়া থাকে ; ফলে এ ধরণের কর জনসাধারণকে বিশেষ নিরুৎসাহিত করে না। প্রকৃতপক্ষে, পৃথক কোন কর দিতে হইতেছে বলিয়া ক্রেতারা অনেক সময় জানিতেও পারে না।

(৩) পরোক্ষ করের হার সাধারণতঃ স্বল্প হয়। সেইজন্য, প্রত্যক্ষ কর অপেক্ষা অধিক সহজে জনসাধারণ এই ধরণের করকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

(৪) অবাঞ্ছনীয় বস্তুর ব্যবহার পরোক্ষ করের মাধ্যমে হ্রাস করা সম্ভব। যেমন, মদের উপর উচ্চহারে কর বসাইলে সমাজে মদ্যপান কমিয়া যাইবে আশা করা যায়। এইরূপে সমাজকল্যাণকর কার্যে পরোক্ষ কর সাহায্য করিতে পারে।

পরোক্ষ করের অসুবিধা ঃ

(১) পরোক্ষ করের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, ইহার দ্বারা কর ব্যবস্থার সাম্য ও ন্যায়বিচারের সূত্র লঙ্ঘিত হয়। জুতা কিনিতে গিয়া ধনীও যে হারে কর দেয়, দরিদ্রও সেই হারে কর দেয়। সুতরাং আয়ের অনুপাতে পরোক্ষ করের ভার দরিদ্রের উপর বেশী পড়ে।

(২) পরোক্ষ কর সুনাগরিকতার পরিপন্থী। কারণ, এ জাতীয় করের কোন প্রভাব জনসাধারণের উপর সাধারণতঃ সঞ্চারিত হয় না। দ্রব্যের মূল্যের অংশ হিসাবেই পরোক্ষ করকে গ্রহণ করা হয় বলিয়া জনসাধারণ করনীতি সম্বন্ধে জানিতে বা বুঝিতে বিশেষ ঔৎসুক্য প্রকাশ করে না।

(৩) পরোক্ষ কর আদায় করিতে সাধারণতঃ ব্যয় বেশী হয়। অর্থাৎ, ব্যয় সংক্ষেপের সূত্রটি এক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না।

(৪) পরোক্ষ করের আর একটি অসুবিধা হইল যে ইহার ফলে সমাজের মোট ভোগব্যয় হ্রাস পাইবার আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। কর ধার্য করার

ফলে যদি দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায়, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণও কমিয়া যাইতে পারে (কারণ উৎপাদনের পরিমাণ প্রধানতঃ চাহিদার উপর নির্ভরশীল) এবং ফলে, কর্মসংস্থানের অবনতি ঘটিতে পারে।

অর্থনৈতিক সাম্য ও ন্যায় বিচারের দৃষ্টিকোণ হইতে প্রত্যক্ষ করই কাম্য। কিন্তু, পুলিসী রাষ্ট্রের রূপান্তর ঘটায় এবং কল্যাণকর রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়ায় জনহিতকর সরকারী কার্যাবলী বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং, এই সমস্ত কার্যের সুষ্ঠ সম্পাদনের জন্য সরকারী ব্যয়ও বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় প্রকার কর ধার্য করিয়া এই বিপুল ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব।

করভার বণ্টনের সমস্যা (Problem of distribution of the burden of taxation) :

কর ব্যবস্থার অন্যতম মৌলিক সমস্যা হইল যে কিভাবে জনসাধারণের মধ্যে করভার বণ্টন করা অভিপ্রেত। এই প্রসঙ্গে দুইটি নীতির উল্লেখ করা যায়ঃ আনুপাতিক করনীতি ও প্রগতিশীল করনীতি (Principles of Proportional and Progressive taxation)।

অ্যাডাম্ স্মিথের সাম্যের সূত্র অনুযায়ী প্রত্যেকে তাহার ক্ষমতার অনুপাতে কর দিবে। এখানে 'ক্ষমতার অনুপাত' কথাটি অস্পষ্ট। কোন কোন অর্থনীতিবিদ্ ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আয়ের আনুপাতিক কর হওয়া উচিত। অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তির আয়ের উপর করের একটি নির্দিষ্ট শতকরা হার থাকিবে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যদি প্রত্যেককে আয়ের শতকরা ৮% হারে কর দিতে হয়, তাহা হইলে যাহার ১০০৲ টাকা আয় সে ৮৲ টাকা কর দিবে এবং যাহার ৫০০৲ টাকা আয় সে ৪০৲ টাকা কর দিবে। এইরূপ করনীতিকে আনুপাতিক করনীতি বলা হয়।

অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ্ উপরোক্ত মতের সমর্থন করেন না। তাঁহাদের মতে আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির করভার বহন করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ, করের শতকরা হার নির্দিষ্ট থাকা উচিত নয়; আয় যত বাড়িবে ততই করের হারও বৃদ্ধি করা উচিত। যে ব্যক্তির আয় ১০০৲ টাকা তাহাকে যদি ৮% হারে কর দিতে হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তির আয় ৫০০৲ টাকা তাহাকে বেশী হারে (যেমন ১০% বা ১২% হারে) কর দেওয়া উচিত।

আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ক্রমশঃ করের হারও বাড়িয়া যায়, তখন তাহাকে বলা হয় প্রগতিশীল কর।

আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রগতিশীল করনীতিই অধিক সমর্থিত হয়। কারণ, প্রথমতঃ, আর্থিক অসাম্য হ্রাস করিবার জন্য প্রগতিশীল কর অপরিহার্য। এই নীতির মাধ্যমে ধনীদের অধিক করভার বহন করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আয়ের প্রান্তিক উপযোগিতা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। অর্থাৎ, ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি পাইলে বাড়তি আয়ের প্রয়োজনীয়তা সাধারণতঃ তাহার নিকট কমিয়া যায়। অতএব, এই বাড়তি আয়ের এক মোটা অংশ কর হিসাবে গ্রহণ করিলে করদাতার উপর অবিচার করা হয় না।

তৃতীয়তঃ, ধনীদের ভোগপ্রবণতা কম বলিয়া তাহাদের আয়ের উপর বর্ধিত হারে কর বসাইয়া যদি এই করলব্ধ অর্থ জনহিতকর কার্যে দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে সমাজের মোট ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু, কর যদি খুব প্রগতিশীল হয় তাহা হইলে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইতে পারে। ব্যবসায়ীদের আয়ের একটি মোটা অংশ যদি সরকার কর রূপে গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহারা ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিতে নিরুৎসাহ বোধ করিতে পারে।

আধুনিক রাষ্ট্রের সকল করই প্রগতিশীল নীতি অনুসরণ করে না। সাধারণতঃ, আয়কর প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নীতি কার্যকরী হয় না। যেমন, কোন জিনিসের উপর নির্দিষ্ট বিক্রয় কর ধার্য করিলে, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলকেই এক হারে কর দিতে হয়।

রাষ্ট্রীয় ব্যয় (Public Expenditure) :

আধুনিককালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমতঃ, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের উদ্ভবের ফলে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী এবং সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ব্যয় বাড়িয়া গিয়াছে। এখন দেশরক্ষাই শুধুমাত্র সরকারের কার্য নয়। রাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নতিবিধান সরকারের দায়িত্ব। ফলে, কৃষি উন্নয়নের

জন্য নানাবিধ কার্য, জনস্বাস্থ্য, জনশিক্ষা ও শিল্পোন্নয়ন কার্য ইত্যাদির জন্য সরকারকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী কার্যাবলী বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সরকারী কর্মচারীর সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে, প্রশাসনিক ব্যয়ও বিশেষভাবে বাড়িয়া গিয়াছে।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক আবহাওয়া উত্তেজনাপূর্ণ, অবিশ্বাস ও বিরোধপূর্ণ হওয়ায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই দেশরক্ষামূলক ব্যয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চতুর্থতঃ, সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য বিশেষতঃ পূর্ণ নিয়োগ ব্যবস্থা সম্পাদনের জন্য সরকারকে প্রচুর ব্যয় বহন করিতে হয়। অনগ্রসর দেশগুলিতে দ্রুত অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের জন্য সরকারী ব্যয় স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সমস্ত সরকারী ব্যয়কে উৎপাদনশীল (productive) ও অনুৎপাদনশীল (unproductive) এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দেশের মোট উৎপাদন যে ব্যয়ের দ্বারা বর্ধিত হইয়া থাকে তাহাকে উৎপাদনশীল ব্যয় বলা যায়। যেমন, অধিকতর জলসেচ ব্যবস্থার সুবিধারই জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাহা উৎপাদনশীল। পক্ষান্তরে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারের যাহা ব্যয় হয় তাহা সাধারণতঃ দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করে না। অতএব, এই জাতীয় ব্যয় অনুৎপাদনশীল। আধুনিক রাষ্ট্রের ব্যয়নীতি এমন হওয়া উচিত যেন দেশে পূর্ণ কর্মসংস্থান সম্ভব হয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণ (Public Debt) :

সরকারী কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য সরকার সাধারণতঃ করলব্ধ রাজস্বের উপর নির্ভরশীল থাকে। কিন্তু, অনেক সময় রাষ্ট্রীয় ব্যয় এত বৃদ্ধি পায় যে, সরকারের পক্ষে চলতি রাজস্বের মাধ্যমে এই ব্যয় বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে, ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারকে অনেক সময় দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে বা বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য ভারত সরকারকে ঋণের উপর যথেষ্ট নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য দেশের জনসাধারণ হইতে ও বিদেশ হইতে সরকারকে যে অর্থ ধার করিতে হয় তাহাকে রাষ্ট্রীয় ঋণ বলা হয়।

রাষ্ট্রীয় ঋণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of public debt) :

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রীয় ঋণ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। সরকার যে ঋণ দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে সংগ্রহ করে তাহা আভ্যন্তরীণ ঋণ। অপর পক্ষে, যে ঋণ সরকার বিদেশ হইতে সংগ্রহ করে তাহা বাহ্যিক ঋণ। বাহ্যিক ঋণের ক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের একটি অংশ সুদ হিসাবে বিদেশে চলিয়া যায়। কিন্তু, আভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ইহা ঘটিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী ঋণ স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই হইতে পারে। এই শ্রেণীবিভাগ ঋণ পরিশোধ করিবার সময়ের ব্যবধানের উপর নির্ভর করে। যে ঋণ স্বল্পকালের মধ্যে পরিশোধ করিতে হয়, তাহা স্বল্পমেয়াদী ঋণ। অপর পক্ষে, যাহা দীর্ঘকাল পরে পরিশোধ করিতে হয়, তাহা দীর্ঘমেয়াদী ঋণ।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ঋণকে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল এই দুইটি শ্রেণীতেও বিভক্ত করা যায়। যদি, ঋণের টাকাকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয় যে, সরকারী আয় বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে এই ঋণ উৎপাদনশীল। যেমন, ভারতসরকার বিদেশী ঋণের সাহায্যে রুরকেল্লায় যে ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতেছে তাহা দ্বারা সরকারের আয় বৃদ্ধি পাইবে। অতএব, এক্ষেত্রে নিয়োজিত ঋণের টাকা উৎপাদনশীল। অপরপক্ষে, কোন যুদ্ধ পরিচালনার জন্য সরকারকে যে ঋণ গ্রহণ করিতে হয় তাহা দ্বারা সরকারী আয় বৃদ্ধি পায় না। অতএব এই জাতীয় ঋণ অনুৎপাদনশীল।

ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থা (Methods of debt-repayment) :

ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সরকার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকে।

(১) পরিশোধ তহবিল (Sinking Fund) : পরিশোধ তহবিল সৃষ্টির মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ করার পদ্ধতি সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশে অবলম্বন করা হয়। প্রতিবৎসর সরকারী রাজস্বের একটি অংশ এই তহবিলে জমা করা হয়। এই তহবিল হইতে পরে সরকার ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে।

(২) পরিবর্তন (Conversion) : উচ্চসুদের ঋণকে স্বল্পসুদের ঋণে পরিবর্তন সরকারী ঋণ পরিশোধের অন্যতম পদ্ধতি। যেমন, যুদ্ধের সময় সরকার চড়া-সুদে ঋণ সংগ্রহ করিয়া থাকে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলে মূলধনের প্রয়োজন কমিয়া যায় ; ফলে, সুদের হারও হ্রাস পায়। সরকারী ঋণ-পত্রের

মালিকদের তখন বলা হয় যে, এই অবস্থায় পুরাতন ঋণকে স্বল্প সুদের ঋণে পরিবর্তন করিতে হইবে। ইহার ফলে, সরকারকে ঋণের উপর যে সুদ দিতে হয় তাহার পরিমাণ হ্রাস পায়।

(৩) মূলধন কর (Capital levy): ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার অনেক ক্ষেত্রে মূলধন বা সম্পত্তির উপর প্রগতিশীল হারে কর ধার্য করে। এই ব্যবস্থার ফলে, বেশী পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় এবং শীঘ্রই ঋণ পরিশোধ করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে সরকারের দেখা উচিত যে, মূলধনের উপর এইরূপ কর ধার্য করিবার ফলে যেন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন ক্ষতি না হয়।

প্রশ্নাবলী

1. What is a tax? What is the difference between a tax and a fee?

(কর কাহাকে বলে? কর এবং ফি'য়ের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।) (পৃঃ ১০২ দেখ)

2. State and explain the canons of taxation.

(কর নির্ধারণের সূত্রসমূহ ব্যাখ্যা কর।) (পৃঃ ১০২-১০৪ দেখ)

3. Distinguish between proportional and progressive taxation. Explain the argument generally used to justify progressive taxation.

(আনুপাতিক ও প্রগতিশীল করের প্রভেদ নির্দেশ কর। প্রগতিশীল করের সমর্থনে সাধারণত কি যুক্তি দেওয়া হয়।) (পৃঃ ১০৭-১০৮ দেখ)

4. Consider the merits and defects of direct and indirect taxes.

(প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ করের সুবিধা ও অসুবিধা লইয়া আলোচনা কর।) (পৃঃ ১০৪-১০৭ দেখ)

5. Discuss the nature of public expenditure.

(রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি আলোচনা কর।) (পৃঃ ১০৮-১০৯ দেখ)

6. Define and classify public debt. What are the methods of debt repayment?

(রাষ্ট্রীয় ঋণের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ বিবৃত কর। ঋণ পরিশোধের উপায়সমূহ কি?)

(পৃঃ ১০৯-১১১ দেখ)

উনবিংশ অধ্যায়

সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ
(Economic Functions of Government)

উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ব্যক্তির উদ্যোগ ও কর্ম-পরিধি সুবিস্তৃত করা এবং রাষ্ট্রের কার্য সঙ্কুচিত করা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদের মূল লক্ষ্য। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যেও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে এই মতবাদ। আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও বিদেশী আক্রমণ হইতে স্ব-রাষ্ট্রকে রক্ষা করা হইবে সরকারের একমাত্র কার্য। ব্যক্তিস্বাধীনতার সংরক্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, তেমন ব্যবসায়ীরা তাহাদের বাণিজ্যিক স্বার্থের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের প্রবল বিরোধী ছিলেন। শিল্পগত ধনতন্ত্রের (Industrial Capitalism) প্রসারে এই মতবাদ এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ ধনতন্ত্রের ত্রুটিসমূহ সুগভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছে। নানাবিধ অর্থনৈতিক সঙ্কট ও আর্থিক অসাম্যজনিত রাষ্ট্র-নৈতিক উত্তেজনা ও বিরোধ ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ত্রুটিগুলি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। এই ত্রুটিগুলি অপসারণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার (Economic Planning) ছায়াপাত দেখা যায়।

উৎপাদন ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র :

উৎপাদন ব্যবস্থায় একচেটিয়া কারবারীর উদ্ভব, কর্মসংস্থানের পূর্ণ সুযোগের অভাব এবং সুবিশাল আর্থিক অসাম্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। একচেটিয়া কারবারীদের কার্যের ফলে উৎপাদন-ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাজার হইতে প্রতিযোগীদের অপসারিত করিবার জন্য নানাবিধ কলাকৌশল গ্রহণ, যোগানের উপর নিয়ন্ত্রণের সুযোগ লইয়া ভোগ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি

ত্রুটি একচেটিয়া কারবারে পরিলক্ষিত হয়। এই সব ত্রুটি দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দেশেই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়। আইনের মাধ্যমে একচেটিয়া কারবারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করা হয়।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত নয়। কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদন-কেন্দ্রগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ না থাকায় বাজারে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণ অনেক সময় অধিক হইয়া পড়ে। ফলে মূল্য ও মুনাফা হ্রাস পায়। অনেক কলকারখানা বন্ধ হয় এবং বহু লোক বেকার হইয়া পড়ে। রাষ্ট্র কর্তৃক পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এইরূপ অর্থনৈতিক সংকট সৃষ্টির সম্ভাবনা নিতান্তই কম। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন বাজার সম্পর্কিত তথ্যের ভিত্তিতে সমগ্র উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা সুসংগঠিত হয়। উপরন্তু, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলে জাতীয় কল্যাণের দিক হইতে সম্পদের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্ভব হয়।

বেকার সমস্যা ও রাষ্ট্র :

পূর্ণ কর্মসংস্থানের অভাব বা বেকার সমস্যা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান ত্রুটি। ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বেকার সমস্যা গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ইহা শুধুমাত্র উৎপাদন ক্ষমতারই অপচয় নয়; সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহের পথ বন্ধ করিয়া দিয়া ইহা ব্যক্তির আত্মসম্মানও নষ্ট করিয়া দেয়। বেকার সমস্যা প্রবল হইলে সমাজ-ব্যবস্থায় বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়। তাই এই বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা আধুনিক সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। বিভিন্ন উপায়ে এই সমস্যা দূর করিবার চেষ্টা করা হয়। কর্মবিনিময় কেন্দ্র (Employment Exchange) স্থাপন করিয়া শ্রমিক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। সরকারী বিনিয়োগের (যেমন পথঘাট নির্মাণ ইত্যাদি) মাধ্যমে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। উপরন্তু, আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে বেকার বীমা (Unemployment Insurance) ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে দেখা যায়।

আয়-বৈষম্য ও রাষ্ট্র :

আয়-বৈষম্য ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই আয়-বৈষম্য দূর করিয়া অর্থনৈতিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাকল্পে আধুনিক সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা

গ্রহণ করে। প্রগতিশীল করনীতি গ্রহণ করিয়া ধনীব্যক্তিদের আয়ের এক বিরাট অংশ কররূপে সরকার কর্তৃক সংগৃহীত হয়। এই করলব্ধ অর্থ দরিদ্র জনসাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ব্যয় করা হইয়া থাকে।

প্রায় প্রত্যেক দেশেই সরকারকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে দেখা যায়। সাধারণতঃ এই পরিকল্পনার দুইটি উদ্দেশ্য থাকে: (১) উৎপাদন ব্যবস্থাকে সুশৃঙ্খলিত ও সুসংগঠিত করিয়া উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা, প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার অপচয় হ্রাস করা এবং পূর্ণ কর্মনিয়োগের ব্যবস্থা করা; এবং (২) আয়বৈষম্য দূর করা। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য সমগ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনীতিতে এই নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে মূল ও ভারী শিল্পগুলির (Key and heavy Industries) রাষ্ট্রীয়করণ (Nationalisation) পরিলক্ষিত হয়।

বিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের নীতি বর্জন করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেশে 'কল্যাণ রাষ্ট্র' (welfare state) প্রবর্তিত হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র 'পুলিশী রাষ্ট্র' নয়; আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করাই ইহার একমাত্র দায়িত্ব নয়। জনসাধারণের জীবনের সামগ্রিক উন্নতির জন্য রাষ্ট্র দায়ী থাকে। ফলে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ আসিয়া পড়িয়াছে। ইহাতে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে সরকারের অর্থনৈতিক কার্যের পরিধি আরও বিস্তৃত। সংগঠনক্ষমতা ও শিল্পোদ্যোগের অভাব ও শিল্পগত মূলধনের অপ্রাচুর্য দ্রুত শিল্পায়নের প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করে। অথচ, দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধি না ঘটিলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব নয়। তাই, অনগ্রসর দেশসমূহে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সরকারকে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতে দেখা যায়।

প্রশ্নাবলী

1. Narrate the economic functions of a modern government.
(আধুনিক সরকারের অর্থনৈতিক কার্যাবলী বিবৃত কর।) (পৃঃ ১১২-১১৪ দেখ।)

দ্বিতীয় খণ্ড

ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যা
ও
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যসূচীর অন্যতম বিষয়বস্তু ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। ভারতীয় অর্থনীতির সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান ও অনগ্রসর অর্থনীতির দ্রুত রূপান্তর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মূল উদ্দেশ্য। সুতরাং সমস্যাগুলির উপর আলোকসম্পাত না করিলে পরিকল্পনার গতিপথ ও রূপবিন্যাস অনুধাবন করা সম্ভব হইবে না। এই দৃষ্টিকোণ হইতেই ভারতীয় অর্থনীতির মূল সমস্যাগুলি এই খণ্ডে আলোচিত হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

কৃষি ও আনুষঙ্গিক সমস্যাবলী

(Agriculture and allied problems)

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষিব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৫১ সালের আদমসুমারী (census) অনুসারে ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ কৃষিব্যবস্থার সহিত জড়িত আছে। মোট জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক কৃষিকার্য হইতে উপার্জিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষিব্যবস্থার অবদান সুবিদিত। ১৯৪৭ হইতে ১৯৫২ সাল অবধি ভারতবর্ষকে বিদেশ হইতে প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হইয়াছে। ইহার ফলে, মূল্যবান বিদেশী মুদ্রা খাদ্যশস্য ক্রয়ের জন্যই ব্যয়িত হইয়াছে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির উপরই খাদ্যসমস্যার সমাধান নির্ভরশীল।

তৃতীয়তঃ, আভ্যন্তরীণ শিল্পগুলির জন্য কাঁচামালের সরবরাহ কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল।

চতুর্থতঃ, কৃষিজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী করিয়া ভারতবর্ষ বিদেশী মুদ্রা আয় করিয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন কারণে দেখা যায় যে, ভারতীয় কৃষির ভূমিকা ভারতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কৃষিব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of agriculture) :

ভারতবর্ষের অর্থনীতিতে ও জাতীয় জীবনে কৃষির গুরুত্ব সম্পর্কে ফিস্‌ক্যাল কমিশনের (Fiscal Commission) মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। ইহাদের মতে ভারতবর্ষে কৃষি শুধুমাত্র জীবিকা নয়, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। জাতীয় জীবনে কৃষির এত গুরুত্ব সত্ত্বেও ইহার অনগ্রসরতা সর্বজনবিদিত। সমপরিমাণ জমিতে বিভিন্ন দেশে কি পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়—তাহা হইতেই কৃষির উন্নতি বা অবনতি নির্ধারণ করা যায়। ভারতবর্ষে প্রতি একর জমিতে ৮৫৪ পাউণ্ড চাউল উৎপন্ন হয়; অপর পক্ষে, এই সমপরিমাণ জমি হইতেই জাপানে চাউল উৎপাদনের হার ২,১২৪ পাউণ্ড এবং ইটালীতে

২,৭৯৭ পাউণ্ড। অন্যান্য ফসলের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। ভারতীয় কৃষির এই অনগ্রসরতার কারণ বিশ্লেষণ করিতে হইলে কৃষি উৎপাদনের উপাদানগুলির সমস্যাবলী জানিতে হইবে। যে কোন উৎপাদনের মতই কৃষি উৎপাদনও জমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন—এই উপাদানগুলির উপর নির্ভরশীল। ভারতীয় কৃষির সমস্যা বা ত্রুটি বলিতে ইহার উপাদানগুলির সমস্যা বা ত্রুটিকেই বুঝায়।

(ক) **জমি (Land) :** মুখ্যতঃ বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য ভারতে কৃষি উৎপাদনে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। জমিতে জল সরবরাহের সুবন্দোবস্ত না থাকায় কৃষিকার্যের জন্য মৌসুমীবায়ুর দাক্ষিণ্যের প্রত্যাশায় থাকিতে হয়। অনাবৃষ্টির প্রতিষেধক হিসাবে পর্যাপ্ত জলসেচ ব্যবস্থা নাই ; আবার অতিবৃষ্টির প্রতিবিধানের জন্য জল নিষ্কাষণ ব্যবস্থা তেমন ভাল নয়। তাই, ভারতীয় কৃষি এক অর্থে প্রকৃতির ক্রীড়া-পুত্তলিকা। দ্বিতীয়তঃ, জমির বিভক্ততা ও অসম্বদ্ধতা কৃষির উন্নতির অন্যতম অন্তরায় হইয়া আছে। ভূমিখণ্ডগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত এবং চাষীর জমি একইস্থানে একত্রিত না থাকিয়া বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্তভাবে থাকে। ইহার ফলে, কৃষির উন্নতির জন্য উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না। তৃতীয়তঃ, জমির উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার ইত্যাদি প্রয়োগের কোন প্রচলন নাই। উপরন্তু, কৃষকেরা গোময় ইত্যাদি সহজলভ্য চিরাচরিত সারগুলিকে জমিতে প্রয়োগ না করিয়া অনুৎপাদক কাজে ব্যবহার করিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, চাষের যথাযোগ্য ব্যবস্থার অভাবে বিস্তৃত অনাবাদী কৃষিযোগ্য ভূখণ্ড পতিত রহিয়া গিয়াছে।

(খ) **শ্রমিক (Labour) :** কৃষি শ্রমিক অর্থাৎ কৃষকদের নানাবিধ ত্রুটির জন্য ভারতীয় কৃষি অনুন্নত অবস্থায় আছে। শিক্ষাবিস্তারের সুবন্দোবস্ত না থাকায় কৃষকদের নিরক্ষরতা ও রক্ষণশীলতা কৃষি সংস্কারের পথে বিরাট বাধা হইয়া আছে। উন্নততর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃষিপ্রণালী ভারতের দূরতম গ্রামে পৌছায় না ; আর পৌছাইলেও, চিরাচরিত কৃষিপদ্ধতিকে বিসর্জন দিয়া প্রগতিশীল নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করিবার মত মানসিক উদারতা কৃষকদের মধ্যে দেখা যায় না। উপরন্তু, কৃষি হইতে আয়ের পরিমাণ নানা কারণে অনিশ্চিত থাকায় ও মহাজনের ঋণজালে আবদ্ধ থাকায় ভারতীয় কৃষক দারিদ্র্যপীড়িত। জীর্ণস্বাস্থ্য, অক্ষম কৃষক তাই স্বাস্থ্যকর বাসস্থান বা খাদ্যের

অভাবে অদৃষ্টকে দোষারোপ করিয়া কোন ক্রমে টিকিয়া থাকে। কৃষকের এই দুরবস্থার জন্য কৃষি স্বভাবতঃই ত্রুটিপূর্ণ।

(গ) **মূলধন** (Capital): ভারতীয় কৃষকের মূলধন বলিতে বুঝায় তাহার চিরাচরিত লাঙল ও শীর্ণবলদ। চাষের জন্য বীজের সংস্থান সকলের নাই। বীজ, বলদ বা লাঙল ক্রয় করিতে হইলে কৃষককে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়। ফলে, উন্নয়নমূলক কোন পরিকল্পনা করা তাহার পক্ষে একরকম অসম্ভব। ট্র্যাক্টর প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করা কৃষকের স্বপ্নেরও বাহিরে। আয় কম হওয়ার দরুন নিজস্ব সঞ্চয় বিশেষ না হওয়ায় কৃষকের পক্ষে চল্‌তি মূলধন পাওয়া দুষ্কর। গ্রামাঞ্চলে ন্যায্য সুদে মূলধন যোগান দিবার বন্দোবস্ত নাই বলিলেই হয়।

(ঘ) **সংগঠন** (Organisation): সংগঠন বা ব্যবস্থাপনার ত্রুটিও কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। ভারতীয় কৃষি উৎপাদন সাধারণতঃ ব্যক্তিভিত্তিক। চিরাচরিত প্রথায় একখণ্ড জমিতে কোন প্রকারে চাষ করিয়া জীবনধারণের মত ফসল ফলাইতে পারিলেই কৃষকেরা সন্তুষ্ট। জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের মাধ্যমে উন্নততর কৃষি-পদ্ধতির বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। সারা বৎসরের মধ্যে কয়েকমাস মাত্র কৃষিকার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া অন্যান্য সময় কৃষকেরা বেকার থাকে। শুধু উৎপাদন ক্ষেত্রে নয়, বিক্রয় ব্যবস্থায়ও কোন সুবন্দোবস্ত না থাকার জন্য ফড়িয়া বা দালালদের মারফৎ কৃষকেরা ফসল বেচিয়া থাকে। ফলে, উৎপন্ন ফসল ন্যায্য মূল্যে বিক্রয় করিয়া আয় বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা তাহাদের থাকে না।

প্রতিকার (Remedies):

কৃষিব্যবস্থার ত্রুটির মূলে রহিয়াছে উৎপাদনের উপাদানগুলির সমস্যাবলী। সুতরাং ত্রুটিগুলিকে দূরীভূত করিতে হইলে আনুষঙ্গিক উপাদানগুলির সমস্যাবলীর সমাধান প্রয়োজন।

(ক) **জমি**: জমি সম্পর্কিত সমস্যাগুলির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন জমিতে জলসরবরাহের ব্যাপক সুবন্দোবস্ত করা। মৌসুমী বায়ুর অনিশ্চিত কারুণ্যের হাত হইতে জমিগুলিকে মুক্ত করা দরকার। জলসেচ ও জলনিষ্কাষণের যথাযোগ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে জমিতে প্রয়োজনমত জলসরবরাহ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। উপযুক্ত আইনের মাধ্যমে ও সমবায় প্রথায় চাষের মধ্য দিয়া

খণ্ডীকরণ ও জমির অসম্বদ্ধতার প্রতিকার করিতে হইবে। রাসায়নিক সার ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে হইবে। চাযযোগ্য জমিতে অনাবাদী কৃষির বন্দোবস্ত করিয়াও জমির ও ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(খ) **শ্রম**ঃ সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থা কৃষিসমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। পরিবর্তন-বিদ্বেষী কৃষককে ঐতিহ্যের আসক্তি হইতে মুক্ত করিয়া প্রগতিশীল করিতে হইলে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় তাহাদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে এ সম্পর্কে কৃষককে সচেতন করিতে হইবে। স্বাস্থ্যোন্নয়নের জন্য গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া জীর্ণস্বাস্থ্য কৃষকের শারীরিক সামর্থ্য সৃষ্টি করা প্রয়োজন। নিরক্ষরতা, রক্ষণশীলতা ও ভগ্নস্বাস্থ্যের মূল কারণ দারিদ্র্য। তাই, কৃষিপণ্য হইতে কৃষক যাহাতে ন্যায্য আয় পায় এবং সমবায় সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে যাহাতে প্রয়োজনীয় ঋণগ্রহণ করিয়া কৃষি উন্নয়ন করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(গ) **মূলধন**ঃ কৃষককে চলতি পুঁজি ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়নমূলক ঋণদানের ব্যবস্থা করা দরকার। সমবায় সমিতি ইত্যাদির মাধ্যমে স্বল্পসুদে ঋণসরবরাহ করিতে না পারিলে চিরাচরিত গ্রাম্য মহাজন কৃষককে শোষণ করিয়া চলিবে। শুধু ঋণের সরবরাহই নয়, কৃষকের স্বল্প-সঞ্চয়কে জমা রাখিবার জন্য গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। ইহাতে কৃষক ক্রমে ক্রমে সঞ্চয়মুখী হইবে আশা করা যায়। উন্নতধরণের কৃষিপদ্ধতির সহিত কৃষককে পরিচিত করা দরকার। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, উৎকৃষ্ট সার ও বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করিবার যথাযোগ্য ব্যবস্থা সুদূর গ্রামাঞ্চলেও করা প্রয়োজন।

(ঘ) **সংগঠন**ঃ সাংগঠনিক ত্রুটির সংশোধন করিতে না পারিলে কৃষির সর্বাঙ্গীণ সুষ্ঠু উন্নয়ন সম্ভব হয় না। উন্নতধরণের ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদন ও বিক্রয় পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করিতে হইবে। সমবায় যৌথ চাষ পদ্ধতির মাধ্যমে বিস্তৃত জমিতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে চাষের প্রবর্তন করা প্রয়োজন। এইরূপে কৃষিকে বৃহদায়তন উৎপাদনে রূপান্তরিত করিলে ও শ্রমবিভাগ ঘটিলে কৃষকের কর্মদক্ষতা এবং উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। ন্যায্য মূল্যে যাহাতে ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষকের আয় বৃদ্ধি পায়

তাহার জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকা দরকার। শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম, ভাল পথঘাট, কৃষি শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদি কৃষি উন্নয়নের জন্য বিশেষ প্রয়োজন। উপরন্তু, কৃষকদের প্রচ্ছন্নবেকার ও অর্ধবেকার অবস্থার প্রতিকারের জন্য কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা দরকার।

কৃষি সমস্যার সমাধানের জন্য সাময়িক ও বিক্ষিপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে চলিবে না। কৃষি উৎপাদনের উপাদানগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে সংস্কার করা সম্ভব নয়। কৃষি ভারতীয় কৃষকের শুধু জীবিকাই নয়, জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেইজন্য, কৃষি-উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন, পল্লী জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি।

জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা (Subdivision and fragmentation of Holdings)ঃ

ভারতবর্ষে কৃষি-উৎপাদন ব্যক্তিভিত্তিক। চাষীর ব্যক্তিগত কৃষিজোতের আয়তন নিতান্ত ক্ষুদ্র। অধিকাংশ চাষীর দুই একরের বেশী জমি নাই, তাহাও আবার একটি স্থানে একত্রিত অবস্থায় নাই। আমাদের দেশের উত্তরাধিকার আইনের ফলে, জমির মালিকের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে জমি সমভাবে বণ্টিত হয়। এইরূপে, কৃষিজোত ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে ; ইহাকে জমির খণ্ডীকরণ বলা হয়। জোতগুলি অসংলগ্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকায় অসম্বদ্ধতার সৃষ্টি হয়। মালিকের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারীরা স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট জমিতে দখল পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উপযুক্ত পরিমাণ উৎকৃষ্ট জমি না পাইলে তাহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অসংলগ্ন, উৎকৃষ্ট জমি দখল লইয়া থাকে। ইহাতে জমি একস্থানে সুসম্বদ্ধ অবস্থায় থাকে না।

কারণসমূহ (Causes)ঃ জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার কারণগুলি নিম্নরূপঃ

প্রথমতঃ, একান্নবর্তী পরিবার প্রথার লোপ জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার অন্যতম প্রধান কারণ। একান্নবর্তী পরিবারে পরিবারভুক্ত সকলের সম্পত্তি যৌথভাবে থাকিত। নানাবিধ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কারণে এবং উগ্র

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধের ফলে এই প্রথার বিলোপের দরুণ কৃষিজোত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তনে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের দেশের উত্তরাধিকার আইনের ফলে উত্তরাধিকারী-দের মধ্যে জমি বণ্টিত হওয়ায়, স্বভাবতঃই, খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়তঃ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ফলে সীমায়িত কৃষিজমির উপর অধিক সংখ্যক লোকের নির্ভরশীলতাও অন্যতম কারণ।

চতুর্থতঃ, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ব্যবস্থা না থাকায় জমির উপর নির্ভর-শীলতা আরও বেশী বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সহায়ক শিল্পের বন্দোবস্ত থাকিলে জমি হইতে শিল্পে শ্রম-স্থানান্তর সম্ভব হয়। কিন্তু এরূপ বন্দোবস্ত না থাকায় জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে এবং উত্তরাধিকার আইনের ফলে খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা চরম হইয়া উঠিয়াছে।

অসুবিধা (Defects):

ভারতবর্ষে কৃষির অনগ্রসরতার অন্যতম প্রধান কারণ জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা। কৃষির উন্নয়নমূলক কোন ব্যবস্থাই ইহার ফলে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হইতেছে যে, বৃহদায়তন কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার ইহা সম্পূর্ণ পরিপন্থী। শ্রমবিভাগ ও যন্ত্রের প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদনবৃদ্ধি ও উৎপাদনব্যয় হ্রাসের কোন ব্যবস্থা বর্তমান অবস্থায় গ্রহণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিক্ষিপ্ত জমিতে কৃষককে ঘুরিয়া ঘুরিয়া চাষ করিতে হয় বলিয়া অর্থ, শ্রম ও সময়ের অযথা অপচয় ঘটে। তৃতীয়তঃ, প্রতিটি খণ্ডজমির সীমানা রক্ষার জন্য আইল বা বেড়া দিতে হয় বলিয়া জমি ও অর্থ উভয়েরই অপচয় ঘটিয়া থাকে। চতুর্থতঃ, খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার দরুণ দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ক্ষুদ্র জমিতে অধিক ব্যয়ে উন্নয়ন ব্যবস্থা অর্থহীন, কারণ ব্যয়ের অনুপাতে আয় এক্ষেত্রে না পাওয়াই স্বাভাবিক।

প্রতিকার (Remedies):

ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ প্রয়োজন। জমির অধিকার ও উৎপাদনের মধ্যে বৈষম্যটিকে দূর করাই প্রতিকারের উপায়। জমির মালিকানা পৃথক রাখিয়াও উৎপাদনকে যৌথ করা সম্ভব। জমির

মালিকেরা নিজস্ব খণ্ড খণ্ড জমি সহযোগিতার মাধ্যমে একত্রিত করিয়া চাষ করিতে পারে। এইরূপে জমির একত্রীকরণের দুইটি উপায় আছে: যৌথ খামার প্রথা (collective farming) ও সমবায় চাষ প্রথা (co-operative farming)। যৌথ খামার প্রথায় রাষ্ট্রের হাতে জমির মালিকানা থাকে। ব্যক্তিগত অধিকারের অবলুপ্তি ঘটে বলিয়া এই প্রথায় চাষীর উদ্যম হ্রাস ও রাষ্ট্রের অযথা নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। অপর পক্ষে, সমবায় চাষ প্রথায় জমির উপর অধিকার রক্ষা করিয়াও কৃষকেরা স্বেচ্ছায় সহযোগিতার মাধ্যমে জমি একত্রিত করিয়া চাষ করিতে পারে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় অনুরূপ সমবায় প্রথায় চাষের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন। কৃষিজমির ভবিষ্যৎ খণ্ডীকরণ নিরোধ, জোতগুলির একত্রীকরণ, সমবায় চাষপ্রথা অবলম্বন ও সমবায় গ্রাম ব্যবস্থা প্রবর্তন—এই ব্যবস্থাগুলির দিকে পরিকল্পনা কমিশন দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা দূরীকরণের সমস্যাটির সহিত মাথা পিছু জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করার সমস্যাটিও জড়িত। প্রত্যেক চাষীর জমির পরিমাণ এমন হওয়া উচিত যে, জমির ফসল হইতে চাষী ন্যায়সঙ্গত জীবনযাত্রার মান রক্ষা করিতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জমির খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতার বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবিধানমূলক ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। উত্তর প্রদেশ, মধ্যভারত, রাজস্থান, হায়দ্রাবাদ ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্যে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জমির ন্যূনতম আয়তন নির্ধারণ করা হইয়াছে; অর্থাৎ, এই আয়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর অংশে জমির খণ্ডীকরণ আইন-বিরুদ্ধ। অপর পক্ষে, বোম্বাই, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি কয়েকটি রাজ্যে জমির সংহতি সাধনের জন্য পারস্পরিক হস্তান্তরের দ্বারা খণ্ডিত জমিগুলিকে একত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে।

কৃষিঋণ (Agricultural Indebtedness):

ভারতবর্ষের চাষী জন্ম হইতেই পিতৃপুরুষের ঋণে আবদ্ধ হয়, এই ঋণের বোঝা টানিয়াই সে জীবনধারণ করে এবং অভিশপ্ত ঋণভার বংশধরদের হাতে সমর্পণ করিয়া শেষনিশ্বাস ত্যাগ করে। কৃষিঋণের আধিক্য ভারতীয় কৃষির একটি গুরুতর সমস্যা। অর্থনীতিবিদ্ পি. জে. টমাসের (P. J. Thomas) মতে কৃষিঋণের মোট পরিমাণ ১,২০০ কোটি টাকারও অধিক। পরিমাণ

ছাড়াও ঋণের প্রকৃতি নিতান্তই বিপজ্জনক। এই ঋণের অধিকাংশই অনুৎপাদক (unproductive), অর্থাৎ সরাসরি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্রহণ করা হয় না। ফলে, উৎপাদন বৃদ্ধির কোন আশা না থাকায় ঋণ অপরিশোধ্য থাকিয়া যায়।

কারণসমূহ (Causes):

স্বভাবতঃই কৃষকের ঋণগ্রস্ততার কারণ তাহার দারিদ্র্য। আয়ের পরিমাণ স্বল্প ও অনিশ্চিত হওয়ায় আয় হইতে ব্যয় সঙ্কুলান করা অসম্ভব হয়। ফলে, ঋণ গ্রহণ করা ছাড়া কৃষকের আর কোন উপায় থাকে না। কৃষক কৃষির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, অথচ, কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির এবং কৃষিপণ্য ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়ের বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। উপরন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সীমায়িত জমিতে অধিকতর লোকের অংশগ্রহণের ফলে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের সূত্র কার্যকরী হইতে থাকে। তাই, কৃষিকার্য হইতে আয় বৃদ্ধির পথ প্রায় অবরুদ্ধ হইয়া যায়। অপরদিকে, গ্রামাঞ্চলে কৃষি ব্যতীত অন্য কোন কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্পের ব্যবস্থা না থাকায় পার্শ্বজীবিকারও বিশেষ সুবিধা নাই। সুতরাং, সর্বদিক হইতেই কৃষকের আয়স্বল্পতা দেখা দেয়। ইহার অবধারিত ফল ঋণগ্রস্ততা।

দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহ্যের প্রতি আসক্তির ফলে বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি নানাবিধ সামাজিক আচার বিচারে কৃষকেরা অহেতুক অর্থব্যয় করিয়া থাকে। জমির দখলীস্বত্ব লইয়া মামলা-মোকদ্দমা লাগিয়াই থাকে। ইহা ছাড়া আছে পূর্বপুরুষের ঋণের বোঝা। আবার, হালবলদ ক্রয় করিবার প্রয়োজনও কখনও কখনও হইয়া থাকে। ফলে, নানাবিধ কারণে কৃষকের ব্যয়বাহুল্য দেখা দেয়। আয়ের স্বল্পতার জন্য বাধ্য হইয়া কৃষককে মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয়।

তৃতীয়তঃ, ঋণের চাহিদা মিটাইবার জন্য বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে নাই। স্বল্পসুদে ঋণ-প্রাপ্তির কোন ব্যবস্থা না থাকায় কৃষকেরা বাধ্য হইয়া চড়া সুদে গ্রাম্য মহাজনের নিকট হইতে ঋণ লইয়া থাকে। ১৯৫৪ সালের সর্বভারতীয় গ্রাম্যঋণ অনুসন্ধান কমিটির (All India Rural Credit Survey Committee) বিবরণী হইতে জানা যায় যে, কৃষকেরা তাহাদের ঋণের প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ পাইয়া থাকে পেশাদার ও কৃষিজীবী

মহাজনের নিকট হইতে। অশিক্ষিত কৃষককে নানা উপায়ে ঠকাইয়া গ্রাম্য মহাজন তাহাকে এরূপভাবে ঋণজালে আবদ্ধ করিয়া ফেলে যে, তাহার পক্ষে ঋণ-পরিশোধ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

প্রতিকার (Remedies) ঃ

কৃষিঋণের বিরুদ্ধে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা উচিত। ঋণগ্রস্ততার প্রতিকারের দুইটি পথ আছে ঃ (ক) কৃষিকে উন্নত করিয়া কৃষকের আয়বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা এবং (খ) পুরাতন ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বন্দোবস্ত করা।

(ক) কৃষকের আয়বৃদ্ধি না পাইলে ঋণগ্রহণ হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হয় না। অথচ আয় বৃদ্ধির সমস্যাটি কৃষি-উৎপাদন ও উৎপাদন-দ্রব্য বিক্রয় ব্যবস্থার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত। কৃষির উন্নতির জন্য অবলম্বিত ব্যবস্থাগুলি সঠিকভাবে গ্রহণ করিলে তবেই কৃষকের যথেষ্ট আয়ের সংস্থান হইতে পারে। জমির সংহতি সাধন, সুষ্ঠু জলসেচ ব্যবস্থা, উন্নত যন্ত্রপাতি ও উৎকৃষ্ট বীজের সরবরাহ, সুসংগঠিত বিক্রয় ব্যবস্থা, স্বাস্থ্যোন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা ইত্যাদি কৃষির উন্নতির জন্য প্রয়োজন এবং স্বভাবতঃই, কৃষকের আয়বৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য।

(খ) কৃষকের পুরাতন ঋণের বোঝা লাঘবের জন্য সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। ঋণগ্রহণকারী ও ঋণদাতার মধ্যে আপোষ ব্যবস্থার মাধ্যমে পুরাতন ঋণের পরিমাণ হ্রাস করিতে হইবে এবং ঋণের অবশিষ্টাংশ সহজ কিস্তিতে মিটাইয়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। অপরপক্ষে, ঋণ সরবরাহের সহজ ব্যবস্থা থাকা দরকার। কারণ, কৃষিকার্যের প্রয়োজনে ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি স্থাপন করিতে হইবে। তাহা না হইলে মহাজনের ঋণের বেড়াজাল হইতে কৃষককে মুক্ত করা কখনও সম্ভব হইবে না। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে, গ্রাম্য মহাজনকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করাও সমীচীন নয়। কারণ, গ্রামাঞ্চলে ঋণের সরবরাহের অন্য কোন বিকল্প প্রতিষ্ঠান নাই বলিলেই হয়। সুতরাং, যথাযোগ্য ব্যবস্থা দ্বারা চেষ্টা করা উচিত যেন মহাজনেরা অজ্ঞ কৃষককে প্রতারিত না করিতে পারে। এইজন্য তাহাদের যথাযথ হিসাব রাখিতে বাধ্য করা যাইতে পারে ও নির্দিষ্ট হারে ঋণ দিতে বাধ্য করা যাইতে পারে। মহাজনকে উচ্ছেদ না করিয়া নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থাই যুক্তিসংগত।

সরকার কর্তৃক অবলম্বিত ব্যবস্থা (Measures taken by Government) :

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষিঋণের সমস্যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে, সমস্যার গুরুত্ব অনুপাতে সমাধানের ব্যবস্থা তেমন ব্যাপক হয় নাই। সরকারী ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে ঋণদানের সুবিধা ও পুরাতন ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করার চেষ্টা করা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, ঋণ সরবরাহের জন্য টাকাভি আইন (Takkavi Acts) প্রবর্তন করা হইয়াছে। এই আইনগুলির সর্তাবলী সুবিধাজনক না হওয়ায় ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই ঋণের বন্দোবস্ত করায় এই ঋণ ব্যবস্থা বিশেষ জনপ্রিয় হয় নাই। টাকাভি আইন ছাড়া আইনের মাধ্যমে সমবায় ঋণদান সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। তবে, কৃষকদের ঋণের প্রয়োজনের তুলনায় এই সমিতিগুলির প্রদত্ত ঋণের পরিমাণ নিতান্তই সামান্য। কৃষিকার্যে ঋণের সরবরাহ যে একান্ত প্রয়োজন ইহা উপলব্ধি করিয়া গোরওয়ালা কমিটির (Gorwala Committee) সুপারিশ অনুযায়ী সরকার ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ করিয়া নবগঠিত স্টেট ব্যাঙ্ককে গ্রামাঞ্চলে ঋণ সরবরাহের নির্দেশ দিয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, পুরাতন ঋণ পরিশোধের জন্য মহাজনের হাত হইতে কৃষককে নিষ্কৃতি দিবার জন্য সরকার কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে ঋণ সালিশী আইনের (Debt Conciliation Acts) মাধ্যমে ঋণ-দাতা ও ঋণগ্রহণকারীর মধ্যে ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে আপোষ মীমাংসার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের মধ্যে ঋণ সংক্রান্ত বিবাদের সহজ নিষ্পত্তির জন্য বিভিন্ন রাজ্যে ঋণ সালিশী বোর্ডও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অপর পক্ষে, গ্রাম্য মহাজনকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যও কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাবের ভূমি হস্তান্তর আইন (Punjab Land Alienation Act of 1901) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষকের হাত হইতে মহাজনের হাতে জমি হস্তান্তর বন্ধ করা এই আইনের উদ্দেশ্য। অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে মহাজনী আইন (Money Lenders Act) পাশের মাধ্যমে মহাজনের সুদের হার নিয়ন্ত্রণ ও হিসাব পরীক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।

কৃষিঋণ সমস্যাটির পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করিয়া গোরওয়ালা কমিটি যে

মন্তব্য করেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই কমিটির মতে কৃষিঋণের মাত্র শতকরা ৩·১ ভাগ সমবায় সমিতিগুলি হইতে ও শতকরা ৩ ভাগের কিছু বেশী সরকারী বিভাগসমূহ হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। অর্থাৎ কৃষিঋণের প্রায় শতকরা ৯০ ভাগেরও অধিক যোগান দিয়া থাকে মহাজন ইত্যাদি গ্রাম্য উৎসগুলি। কৃষিঋণের প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়া কমিটি সুপারিশ করেন ঃ

(১) গ্রাম্য-ঋণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন ;

(২) ঋণের সমস্যার সহিত পণ্য বিক্রয় ইত্যাদি অন্যান্য কার্যাবলীর সংহতি রক্ষা করা দরকার ; এবং

(৩) সুষ্ঠু সরকারী পরিকল্পনার মাধ্যমে কর্মকুশল ও শিক্ষিত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া কৃষকের প্রয়োজন বুঝিয়া ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক।

কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা (Marketing organisation of agricultural products) ঃ

কৃষি সমস্যার দুইটি দিক আছে ঃ উৎপাদনের দিক ও বিক্রয়ের দিক। কৃষির উন্নতির জন্য যেমন উৎপাদন ব্যবস্থাকে উন্নত করা দরকার, তেমনই বিক্রয় ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা প্রয়োজন। উৎপাদন ব্যবস্থার মত কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থাও ভারতবর্ষে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ।

প্রথমতঃ, ভারতীয় কৃষক, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, মহাজনের ঋণজালে আবদ্ধ থাকে বলিয়া কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য নিরূপণে মহাজনের কর্তৃত্ব পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের মাধ্যমেই কৃষকেরা সাধারণতঃ ঋণ পরিশোধ করিয়া থাকে। ফলে, মহাজনের নির্ধারিত মূল্যেই ফসল দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান না থাকার দরুণ ফড়িয়ারা অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞ কৃষককে প্রতারিত করিয়া থাকে। অধিক ওজনের পাল্লার সাহায্যে কৃষিপণ্য ক্রয় করিয়া ব্যবসায়ীরা কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্ত করে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা কৃষকের নিকট হইতে ফসল কিনিয়া লইয়া ন্যায্য লাভ হইতে কৃষকদের বঞ্চিত করে। দেখা গিয়াছে যে, উৎপাদিত ফসল শেষ অবধি ভোগব্যবহারকারীরা যে মূল্যে ক্রয় করে তাহার শতকরা ৫০ ভাগেরও কম কৃষকেরা পাইয়া থাকে। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা অবশিষ্ট অংশ আত্মসাৎ করে।

চতুর্থতঃ, ভারতের গ্রামাঞ্চলে পরিবহন ব্যবস্থা তেমন উন্নত না হওয়ায়

দূরবর্তী বাজারে ফসল বিক্রয় করিয়া আয় বৃদ্ধি করার বিশেষ সুযোগ নাই। নিকটবর্তী বাজারেই যে কোন মূল্যে ফসল বিক্রয় করিয়া দিতে হয় বলিয়া কৃষকেরা কম দাম পাইয়া থাকে।

পঞ্চমতঃ, দাম পড়িয়া গেলে ফসল বিক্রয় না করিয়া গুদামজাত করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ফসলের ন্যায্যমূল্য পাওয়া যাইতে পারে। এইজন্য ফসল ধরিয়া রাখার মত গুদামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, এরূপ কোন সুবিধা না থাকার জন্য কৃষকেরা ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই বাজারে বিক্রয় করিয়া থাকে। ফলে, উৎপাদিত ফসলের উপযুক্ত মূল্য তাহারা পায় না।

প্রতিকার (Remedies) :

কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থার ক্রটিগুলি দূর করিতে হইলে কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।

প্রথমতঃ, মহাজনের ঋণজাল হইতে কৃষককে মুক্ত করার জন্য কৃষিঋণের সরবরাহ প্রয়োজন ও মহাজনকে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার।

দ্বিতীয়তঃ, ওজন ও মাপের নির্ধারিত মান থাকা দরকার। দশমিক প্রথার প্রবর্তনের মাধ্যমে, আশা করা যায় যে, এই অবস্থার কিছুটা প্রতিকার হইবে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা যাহাতে লাভের অধিকাংশই আত্মসাৎ করিতে না পারে তাহার জন্য সমবায় বিক্রয় সমিতি (Co-operative Marketing Societies) গঠন করা উচিত। এইরূপ সমিতির মাধ্যমে সরাসরি চূড়ান্ত ভোগব্যবহারকারীর নিকট ফসল বিক্রয় করিলে মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীদের পক্ষে কৃষকদের প্রতারিত করার অবকাশ থাকে না। উপযুক্ত মূল্যে ফসল বিক্রয় হইলে কৃষকদের আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইবে।

চতুর্থতঃ, ভারতের গ্রামাঞ্চলে পথঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি-সাধন করা উচিত। ভাল বাজার পাইলে ফসল বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা ভাল দাম পাইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত গুদামঘর (Warehouse) একান্ত প্রয়োজন। কৃষকেরা ভবিষ্যতে ভাল দাম পাইবার জন্য উৎপাদিত ফসল সঙ্গে সঙ্গে বিক্রয় না করিয়া এইরূপ গুদামে ধরিয়া রাখিতে পারে।

কৃষিজাত দ্রব্যের ক্রটিপূর্ণ বিক্রয় ব্যবস্থার কথা পরিকল্পনা কমিশন উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহও এই সমস্যা সম্পর্কে সচেতন। সরকারী উদ্যোগে ও সহযোগিতায় বোম্বাই,

উত্তর প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে সমবায় বিক্রয় আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যের বিক্রয় ব্যবস্থা অধিকাংশ রাজ্যেই সরকার নিযুক্ত বিপণন আধিকারিক (Marketing officer) দ্বারা পরিচালিত হয়। ব্যবসায়ী ও উৎপাদনকারীদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত সঙ্ঘের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বাজার (regulated market) পরিচালনার জন্য মহীশূর, বোম্বাই, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। ১৯৩৭ সালে একটি উল্লেখযোগ্য আইন প্রণয়ন করা হয় [Agricultural Produce (Grading and Marketing) Act]। ইহার মাধ্যমে কৃষিজাত দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ করার ও উৎকর্ষের প্রমাণ হিসাবে AGMARK চিহ্ন দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। গ্রাম্যঋণ অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গুদামঘর প্রস্তুতের জন্য ১৯৫৬ সালে একটি আইন করা হয় [Agricultural Produce (Development & Warehousing) Act]। এই আইন অনুসারে একটি কেন্দ্রীয় গুদামঘর প্রতিষ্ঠান (Central Warehousing Corporation) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যেও অনুরূপ গুদামঘর স্থাপন করা হইয়াছে।

জলসেচ ব্যবস্থা (Irrigation System) :

গুরুত্ব (Importance) : ভারতের কৃষিব্যবস্থাকে মৌসুমীবায়ুঘটিত বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তা হইতে মুক্ত করিতে হইলে ব্যাপক জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য এবং কৃষকের আয়বৃদ্ধি ও কৃষির উপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থা উন্নত হওয়া দরকার। প্রকৃতপক্ষে, ভারতের অর্থনৈতিক জীবনে কৃষির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য কৃষিব্যবস্থার সংস্কার প্রয়োজন এবং সংস্কারমূলক বিভিন্ন পন্থার মধ্যে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ অন্যতম।

দ্বিতীয়তঃ, সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত হইলে পতিত জমি কর্ষণযোগ্য করা সম্ভব হইবে এবং যে সকল অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয় না বলিলেই হয় সে সমস্ত অঞ্চলেও কৃষিকার্য করা যাইতে পারিবে।

তৃতীয়তঃ, সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে কৃষিজাত কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি পাইলে একদিকে যেমন বিদেশে রপ্তানী বৃদ্ধি করা যাইবে, অপরদিকে

তেমনই দেশী শিল্পে কাঁচামালের প্রয়োজন মিটান সম্ভব হইবে। ইহার ফলে পরিকল্পনাকালীন অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করা যাইবে।

চতুর্থতঃ, বিভিন্ন ধরণের সেচ পরিকল্পনার মাধ্যমে অল্পমূলধনে বেশী শ্রমিক নিয়োগ করিয়া সেচ-ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করিলে বেকার সমস্যারও কিছুটা সমাধান সম্ভব।

পঞ্চমতঃ, সেচব্যবস্থার উন্নতির ফলে খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে ও খাদ্য সমস্যার সমাধান হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী বন্ধ করিয়া প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা ব্যয় বন্ধ করা যায়। উপরন্তু দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করিবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বিদেশ হইতে আমদানী করা সম্ভব হয়।

বিভিন্ন প্রকারের সেচব্যবস্থা (Types of Irrigation Works): প্রধানতঃ তিন প্রকার সেচব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত: (১) কূপ ও নলকূপের (Wells and Tubewells) সাহায্যে (২) পুষ্করিণীর (Tanks) সাহায্যে ও (৩) খালের (Canals) সাহায্যে।

(১) **কূপ ও নলকূপ**: ভারতবর্ষে মোট জলসিঞ্চিত জমির শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ জমিতে জলসেচ হয় কূপ ও নলকূপের সাহায্যে। দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে অল্পব্যয়ে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এই ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা কার্যকরী। পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বিহার, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে এই সেচব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(২) **পুষ্করিণী**: ভারতবর্ষে মোট জলসিঞ্চিত জমির শতকরা ২১·৬ ভাগে পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচ হইয়া থাকে। মাদ্রাজ, বিহার, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যাতে এইরূপ সেচব্যবস্থা প্রচলিত আছে।

(৩) **খাল**: খালের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার ভূমিকা ভারতে গুরুত্বপূর্ণ। মোট জলসিঞ্চিত জমির শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগে জলসেচ হয় খালের সাহায্যে। তিন প্রকারের সেচখাল আছে: (ক) নিত্যবহ খাল (Perennial Canals), (খ) প্লাবন খাল (Inundation Canals) এবং (গ) সঞ্চয় খাল (Storage Canals)। নদী হইতে এমনভাবে নিত্যবহ খালগুলি কাটা হয় যে এগুলিতে সারা বৎসর জল থাকে। প্লাবন খালগুলি বর্ষায় স্ফীত নদীর জলপ্রবেশের ফলে কেবলমাত্র বর্ষাকালেই কার্যকরী হয়। সাধারণতঃ উপত্যকায় আড়া-আড়ি ভাবে বাঁধ দিয়া সঞ্চয় খাল সৃষ্টি করা হয়। বিভিন্ন ছোট ছোট খালের সাহায্যে এই সঞ্চিত জল পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রবাহিত করা হয়।

বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা (Multipurpose River Valley Projects) :

প্রয়োজনের তুলনায় ভারতে জলসেচ ব্যবস্থার তেমন সম্প্রসারণ হয় নাই। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, মোট কৃষি জমির পরিমাণ ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ একর। ইহার মধ্যে ৫ কোটি একরের কম জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা আছে ; অর্থাৎ মোট কৃষি জমির শতকরা ১৮ ভাগ মাত্র জলসেচের সুবিধা পাইতেছে। পরিকল্পনা কমিশন এই অবস্থার কথা বিবেচনা করিয়া সেচব্যবস্থা সম্প্রসারণের দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। শুধু সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণই নয়, প্রাচীন অর্থনীতিকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য কমিশন সুসম্বদ্ধ বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সেচকার্য ছাড়াও ভূমির ক্ষয় নিবারণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, মৎস্য চাষ, পানীয় জল সরবরাহ, নৌ-চলাচল ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হয়।

এই সকল বহুমুখী নদা উপত্যকা পরিকল্পনার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা (Damodar Valley Project) :

এই পরিকল্পনার দায়িত্ব ও ক্ষমতা একটি সংস্থার (Damodar Valley Corporation) উপর ন্যস্ত আছে। মাইথন, পাঞ্চেৎ, তিলাইয়া ও কোনার পাহাড়ে বাঁধ দিয়া এই পরিকল্পনা অনুযায়ী জল সঞ্চয় করা হইতেছে। ইহা ছাড়া, এই বাঁধগুলির সহিত জলবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে এবং বোকারোতে তাপজ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দুর্গাপুরে সেচবাঁধ (Barrage) তৈয়ারী করিয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। দুর্গাপুর হইতে কলিকাতার নিকট অবধি নৌ-চলাচল ব্যবস্থাও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১১'৫ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা এই পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

(২) ভাক্‌রা নাঙ্গাল পরিকল্পনা (Bhakra Nangal Project) :

রাজস্থান ও পাঞ্জাবে এই পরিকল্পনার কাজ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। অন্যান্য উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রায় ৩৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ ও ১ লক্ষ ৪৪ হাজার কিলোওয়াট জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। শতদ্রু

নদীতে ভাক্‌রা বাঁধ নির্মাণ, নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন এবং দুইটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন, ভাক্‌রায় সেচ-খাল খনন—এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

(৩) **হীরাকুদ বাঁধ পরিকল্পনা (Hirakud Dam Project) :** উড়িষ্যায় মহানদী উপত্যকার উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। বন্যানিয়ন্ত্রণ, ১৯ লক্ষ একর জমিতে জলসেচ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হইতে প্রায় ২ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন এই পরিকল্পনার কার্যসূচী।

(৪) **ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা (Maurakshi Project) :** এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলায় জলসেচ ব্যবস্থা ও প্রায় চার হাজার কিলোওয়াট্‌ বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা।

উপরোক্ত পরিকল্পনাগুলি ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেকগুলি অনুরূপ নদী উপত্যকা পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। উত্তর প্রদেশের রিহান্দ বাঁধ, অন্ধ্র মহীশূর হায়দ্রাবাদে তুঙ্গভদ্রা বাঁধ, বিহারের কোশী পরিকল্পনা, মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানে চম্বল পরিকল্পনা ইত্যাদি পরিকল্পনাগুলিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই সমস্ত নদী-উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তি খাতে মোট ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫৬১ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ৯১৩ কোটি টাকা। ভারতের অর্থনীতিতে কৃষির অপরিসীম গুরুত্বের কথা বিবেচনা করিয়া পরিকল্পনা কমিশন এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন।

ভূমি সংস্কার (Land Reforms) :

কৃষি সমস্যার সমাধানের জন্য ভূমি সংস্কার প্রয়োজন। পরিকল্পনা কমিশনের মতে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্য দুইটি : প্রথমতঃ কৃষি কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হইতে উদ্ভূত উৎপাদনের অন্তরায়গুলির প্রতিকার এবং দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ দক্ষতা-সম্পন্ন ও উৎপাদনশীল কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তনের উপযোগী অবস্থা সৃষ্টি। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিয়া প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভূমিসংস্কারমূলক যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় তাহার উদ্দেশ্য ছিল :

(ক) জমি হইতে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীদের অধিকারের বিলোপসাধন,

(খ) জমির মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ,

(গ) খাজনার হারের হ্রাস সাধন,

(ঘ) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ড একত্র করিয়া বৃহদায়তন কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন, ও

(ঙ) সমবায় প্রথায় কৃষি উৎপাদন।

উপরোক্ত কার্যসূচীর মধ্যে একমাত্র মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপসাধন ছাড়া অন্যান্য লক্ষ্যগুলি সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জমিসংস্কারমূলক নূতন নীতি গৃহীত হয়। প্রথম পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি দিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য নূতন কর্মসূচীতে নির্দেশ দেওয়া হয়,

(ক) জমির পুনর্বণ্টন ও জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বোচ্চ সীমানা নির্ধারণ,

(খ) ভূমিস্বত্বের সংস্কার সাধন ও রাষ্ট্রের সহিত কৃষকের সরাসরি সম্পর্ক স্থাপন,

(গ) জমির সংগঠন ও ব্যবহার পদ্ধতির উন্নয়ন, ও

(ঘ) সমবায় গ্রাম্য সংগঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন।

(ক) মধ্যস্বত্বভোগীদের বিলোপ সাধনের সঙ্গে সঙ্গে জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার পরিমাণ নির্ধারণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হইল যে, কাহারও হাতে অত্যধিক পরিমাণ জমি যেন কেন্দ্রীভূত না হয় ও জমিহীন কৃষকদের মধ্যে জমি যেন বণ্টন করিয়া দেওয়া যায়। অবশ্য, এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করার জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থাদি এখনও গৃহীত হয় নাই।

(খ) জমিতে প্রজাস্বত্বের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্য প্রজাস্বত্বের নিরাপত্তা, খাজনার হারের হ্রাস সাধন ও জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে প্রজার অধিকার। জমির মালিকানা থাকিবে ব্যক্তিগত চাষের জন্য। তবে, ব্যক্তিগত চাষের অজুহাতে যাহাতে মালিকেরা কৃষককে জমি হইতে অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করিতে না পারে সেইজন্য বিভিন্ন রাজ্যে যথোপযুক্ত আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে অন্ধ্র, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, আসাম ও জম্মু-কাশ্মীর রাজ্যের নাম উল্লেখযোগ্য। পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী খাজনার হার সাধারণতঃ ফসলের এক-চতুর্থাংশ বা এক-পঞ্চমাংশের অধিক যেন না হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রাজ্যে ভূমিরাজস্ব সংক্রান্ত আইনের সংস্কার করা হইতেছে।

উপরন্তু, পাঞ্জাব, মহীশূর প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে যে, জমি ক্রয় করিয়া প্রজারা বা ভাগ চাষীরা যেন জমির মালিকানা পাইতে পারে। এই প্রসঙ্গে ভূদান আন্দোলনেরও উল্লেখ করা যায়। এই আন্দোলনের মাধ্যমেও জমিহীন কৃষকদের জমি দিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

(গ) কৃষিজমির উন্নততর ব্যবহারের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুপারিশ করা হইয়াছে। ভাল সার ও বীজের সরবরাহ, জলসেচ ব্যবস্থা, পতিত জমি পুনরুদ্ধার ইত্যাদি ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষিকার্যের মান নির্ধারণ করার কথা পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হইয়াছে।

(ঘ) পরিকল্পনা কমিশনের মতে, ভূমিসংস্কারমূলক ব্যবস্থার লক্ষ্য হইবে ধীরে ধীরে সমবায় গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার প্রবর্তন। পরিবারকে কেন্দ্র করিয়াই বর্তমানে অর্থনৈতিক কার্যাদি বিবেচনা করা হয়। সমবায় গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইবে গ্রামাঞ্চলের সামগ্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কার্যাবলী সমবায় ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালনা। বর্তমান পরিবারভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে গ্রামভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই সমবায় গ্রাম সংগঠন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। গ্রামীণ অর্থনীতির ভবিষ্যৎ রূপায়ণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা চিন্তা না করিয়া সতর্কতা ও বিবেচনাশীলতার পরিচয় দিয়াছেন। ধীর অথচ নিশ্চিত গতিতে ক্রমে ক্রমে এই নূতন সমবায় ব্যবস্থার দিকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে লইয়া যাওয়াই কমিশনের কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে ভূমিসংস্কার আন্দোলনের গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহার সাফল্যের উপর ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। তবে, কেবলমাত্র সরকারী ব্যবস্থার মাধ্যমে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন সাধন সম্ভব ও বাঞ্ছনীয় নয়। ভূমিসংস্কার আন্দোলনের সহিত গ্রামবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। এই সহযোগিতার দ্বারাই ভবিষ্যৎ সাফল্যের সোপান রচিত হইতে পারে।

খাদ্য সমস্যা (Food problem) : স্বরূপ ও কারণ (Nature and Causes) : ভারতীয় অর্থনীতির একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য খাদ্য সমস্যা। একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও অপরদিকে কৃষি উৎপাদনের

অনুন্নত অবস্থা এই বৈপরীত্যের ফলে খাদ্য সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে পরিকল্পনা কমিশন স্থির করিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষের বাৎসরিক খাদ্যোৎপাদন ৭৬ লক্ষ টন বাড়াইতে পারিলে বিদেশ হইতে আর খাদ্য আমদানী করিতে হইবে না ; উপরন্তু, খাদ্য গ্রহণের ব্যক্তিগত হার বৃদ্ধি পাইবে। বৃষ্টিপাত ভাল হওয়ায় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে ১৯৫৩-৫৪ সালে খাদ্যোৎপাদন অপ্রত্যাশিতরূপে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পিত বৃদ্ধি অপেক্ষাও প্রায় ৪০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য বেশী উৎপাদিত হয়। ইহার ফলে খাদ্য আমদানীর পরিমাণ যথেষ্ট কমিয়া যায় এবং খাদ্যদ্রব্যের মূল্যও বিশেষ হ্রাস পায়। এই উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা রচিত হয়। এই পরিকল্পনায় স্থির হয় যে, খাদ্যোৎপাদনের পরিমাণ পাঁচ বৎসরে ৬৫০ লক্ষ টন হইতে ৭৫০ লক্ষ টন করিতে হইবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, নানাবিধ কারণে খাদ্যোৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি পাইল না। ফলে, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং ঘাটতি পূরণের জন্য ১৯৫৫ সালের পর আমদানীর পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে হয়। ১৯৫৭ সালে শ্রীঅশোক মেহতার সভাপতিত্বে ভারত সরকার একটি খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি (Foodgrains Enquiry Committee) নিয়োগ করেন। এই কমিটির মতে খাদ্যসমস্যার কারণগুলি নিম্নরূপ :

(ক) দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিতেছে।

(খ) বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার দরুণ কৃষি উৎপাদন অনিশ্চিত।

(গ) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ফলে জনসাধারণের হাতে বাড়তি টাকা আসার ফলে খাদ্যশস্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতেছে।

(ঘ) মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা ফসল ধরিয়া রাখিয়া কৃত্রিম খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করিতেছে।

(ঙ) গ্রামীণ কৃষকের ব্যক্তিগত ভোগব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ বাজারে খাদ্যশস্য আমদানীর পরিমাণ হ্রাস পাইয়াছে।

গুরুত্ব (Importance) :

ক্রমবর্ধমান চাহিদার পশ্চাতে খাদ্য উৎপাদন পড়িয়া থাকায় ভারতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করা যায় :

প্রথমতঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে এখন ভারতীয় অর্থনীতিকে

সঞ্জীবিত করিয়া তোলার প্রচেষ্টা চলিতেছে। এই পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। বর্ধিত আয়ের ফলে যে বর্ধিত চাহিদার সৃষ্টি হইতেছে সেই অনুপাতে খাদ্যোৎ-পাদন না বৃদ্ধি পাইলে মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইবে। ইহা পরিকল্পনা অর্থনীতির পক্ষে বিপজ্জনক পরিস্থিতি।

দ্বিতীয়তঃ, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি প্রয়োজন। স্বল্পমূল্যে জনসাধারণ খাদ্য সরবরাহ না পাইলে তাহাদের স্বাস্থ্য ও কর্মোদ্যোগ নষ্ট হইবে। ইহার ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা দক্ষতা ও সামর্থ্যের অভাবে বিঘ্নিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ক্রমাগত কম হওয়ায় ঘাটতি পূরণের জন্য বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী হইতেছে। ইহার ফলে অতিপ্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইতেছে। বৈদেশিক মুদ্রা-সংকট হইতে মুক্ত হইবার জন্য খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের ফলে সমাজ জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। শিল্প বিপ্লবের অবধারিত ফল শহরের প্রসার ও শহরবাসীর ব্যাপক সংখ্যা বৃদ্ধি। শহরাঞ্চলের বর্ধিত চাহিদা মিটাইতে হইলে গ্রামাঞ্চলে শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই চলিবে না, উৎপাদনের পরিমাণ এমন হওয়া চাই যে গ্রামাঞ্চলের চাহিদা মিটাইবার পরও শহরাঞ্চলে পাঠাইবার মত উদ্বৃত্ত পড়িয়া থাকে।

উপরোক্ত কারণগুলির জন্য খাদ্যসমস্যার দ্রুত সমাধান প্রয়োজন। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যসমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য ব্যবস্থাগুলি আলোচনা করা যায়ঃ

(ক) **খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধিঃ** স্বভাবতঃই, খাদ্যসমস্যার সমাধানের প্রধান উপায় খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধি। অর্থাৎ সমগ্র সমস্যাটি কৃষিব্যবস্থার উন্নতির সমস্যাটির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পরিকল্পনা কমিশন এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া কতকগুলি ব্যবস্থা কার্যকরী করেন ; সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা, জলসেচ ব্যবস্থার প্রসার, আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মাধ্যমে বা বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া রাসায়নিক সারের সরবরাহ, উৎকৃষ্ট বীজের সরবরাহ ও ভূমি সংস্কার এবং সমবায় প্রথায় কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটিও অনুরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা বলেন। তবে, কমিটির মতে

অবলম্বিত ব্যবস্থা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ও ত্রুটিপূর্ণ। সেচ শক্তির পরিপূর্ণ ব্যবহারের দিকে কমিটি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(খ) **জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ** : খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য একদিকে যেমন খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আছে, অপরদিকে তেমনই খাদ্যের চাহিদা নিয়ন্ত্রণের জন্য জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা আছে। এই জন্য জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ব্যাপক জনশিক্ষার প্রসার দরকার। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটিও অনুরূপ মত প্রকাশ করেন।

(গ) **খাদ্যশস্যের উপর নিয়ন্ত্রণ** : মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা অনেক ক্ষেত্রে কৃত্রিম খাদ্যসমস্যার সৃষ্টি করে। অধিক লাভের আশায় তাহারা খাদ্যশস্য ধরিয়া রাখে। এই অসন্তোষজনক অবস্থার প্রতিকারের জন্য খাদ্যশস্যের মূল্য ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কিছুটা সরকারী নিয়ন্ত্রণ আবশ্যক। বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্য মজুত করিয়া ঘাটতি এলাকাগুলিতে খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি যাহাতে ব্যবসায়ীদের খাদ্য মজুত রাখার জন্য অধিক ঋণ দিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বর্তমানে ঋণ নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে। খাদ্যশস্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য (State Trading) নীতিও ভারত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন। খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটি এই প্রসঙ্গে সুপারিশ করেন যে, সাধারণ মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি মূল্য স্থিতিকরণ সংস্থা (Price Stabilisation Board) ও খাদ্যশস্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি খাদ্যশস্য স্থিতিকরণ সংগঠন (Foodgrains Stabilisation Organisation) স্থাপন করা উচিত।

(ঘ) **খাদ্যশস্য আমদানী** : খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির মতে বর্তমানে খাদ্য সমস্যার সাময়িক সমাধানের জন্য বিদেশ হইতে প্রতিবৎসর ২০ হইতে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য আমদানী করিতে হইবে। আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ যতদিন পর্যন্ত চাহিদা মিটাইবার মত পর্যাপ্ত না হয় ততদিন খাদ্যশস্য আমদানী নীতি গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। এই উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি দেশের সহিত ভারত সরকার চুক্তি করিয়াছেন।

উপসংহারে বলা যায় যে, খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য ভবিষ্যৎ উৎপাদনের কোন পরিমাণ নির্দেশ করা যায় না। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদার

পরিবর্তন অনুপাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে হইবে। খাদ্যসমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের কোন অলৌকিক উপায় নাই। কৃষিব্যবস্থার সামগ্রিক উন্নতির মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

প্রশ্নাবলী

1. What are the defects of Indian agriculture ? Suggest some measures for its improvement.

(ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার ত্রুটিগুলি কি কি ? কৃষি-উন্নয়নের কয়েকটি ব্যবস্থার নির্দেশ দাও।)

(পৃঃ ১১৭-১২১ দেখ)

2. "One of the principal handicaps of Indian agriculture is the endless subdivision and fragmentation of land." Elucidate.

("ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার অন্যতম প্রধান ত্রুটি জমির সীমাহীন খণ্ডীকরণ ও অসম্বদ্ধতা"— বিশ্লেষণ কর।)

(পৃঃ ১২১-১২৩ দেখ)

3. Discuss the causes of agricultural indebtedness in India. What measures have been adopted for tackling the problem ?

(ভারতে কৃষিঋণগ্রস্ততার কারণগুলি আলোচনা কর। এই সমস্যার সমাধানের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে ?)

পৃঃ ১২৪-১২৬ দেখ)

4. Discuss the various types of irrigation works in India and indicate their economic importance.

(ভারতের বিভিন্নপ্রকার সেচ-ব্যবস্থার আলোচনা কর এবং তাহাদের অর্থনৈতিক গুরুত্ব নির্দেশ কর।)

(পৃঃ ১২৯-১৩০ দেখ)

5. Briefly discuss the various multipurpose river valley projects recently undertaken in India.

(ভারতের সাম্প্রতিক বিভিন্ন বহুমুখী নদী উপত্যকা পরিকল্পনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।)

পৃঃ ১৩১-১৩২ দেখ)

6. Discuss the nature and importance of recent land reforms in India.

(ভারতের সাম্প্রতিক ভূমিসংস্কারের প্রকৃতি ও গুরুত্ব আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৩২-১৩৪ দেখ)

7. Indicate the nature and causes of our food-problem.

(আমাদের খাদ্যসমস্যার প্রকৃতি ও কারণগুলি নির্দেশ কর।) (পৃঃ ১৩৪-১৩৫ দেখ)

8. Discuss the importance of increasing the food production in India.

(ভারতে খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির গুরুত্ব আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৩৫-১৩৬ দেখ)

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমবায় (Co-operation)

পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সাধারণ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উৎপাদনকারী বা ভোগব্যবহারকারীদের সঙ্ঘবদ্ধতাকেই সমবায় বলা হয়। একজন ব্যক্তির পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব নাও হইতে পারে; কিন্তু কয়েকজন ঐক্যবদ্ধ হইয়া সেই কাজটি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারে। অর্থনৈতিক কার্যাদিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টাই সমবায়ের মূলকথা।

নীতিসমূহ (Principles): সমবায়ের উপরোক্ত সংজ্ঞা হইতেই মূলনীতিগুলি বুঝা যায়।

প্রথমতঃ, অংশগ্রহণকারী সভ্যদের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি সমবায়ের প্রধান নীতি। সমষ্টিগত স্বার্থের দিকে দৃষ্টি দিয়া এই ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেকেরই সমান মর্যাদা থাকা চাই। বৈষম্য দূর করিয়া সাম্য প্রতিষ্ঠাই যখন সমবায়ের উদ্দেশ্য, তখন সদস্যদের মধ্যে উচ্চনীচ কোন ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়।

তৃতীয়তঃ, সমবায় প্রথার অন্যতম মূলনীতি সভ্যদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ। কোন বাধ্যবাধকতা স্বীকার করা হয় না বলিয়াই সদস্যদের স্বাধীনতা এই ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

চতুর্থতঃ, অল্প আয়ের লোকেদের জন্যই সমবায় ব্যবস্থার উদ্ভব বলিয়া লক্ষ্য রাখা উচিত যেন এই ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য না দেখা দেয়। ব্যয়সংক্ষেপ সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি।

পঞ্চমতঃ, সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় থাকা প্রয়োজন। এইজন্য সমবায় ব্যবস্থায় অংশগ্রহণকারীরা কোন একটি নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দা হইবে। ইহাকে সান্নিধ্যের নীতি আখ্যা দেওয়া হয়।

ভারতে সমবায়ের ইতিহাস (**History of Co-operative Movement in India**):

সমবায় প্রথা জার্মানী, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ইত্যাদি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন স্থানে

বিশেষ কার্যকরী হইয়াছে। হের রাইফাইসেন জার্মানীতে স্বল্প আয়ের কৃষকদের উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম এই প্রথার প্রবর্তন করেন। ভারতবর্ষে রাইফাইসেনের অনুকরণে কৃষকদের সাহায্যের জন্য সমবায় সমিতি স্থাপনের সুপারিশ করেন সর্বপ্রথম ফ্রেডারিক নিকল্সন্ নামে মাদ্রাজের একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী। তদনুযায়ী ১৯০৪ সালে কৃষিঋণের জন্য সমবায় ঋণদান সমিতি আইন প্রণয়ন করা হয়। সমবায় ঋণদান সমিতি বিভিন্ন স্থানে শীঘ্রই জনপ্রিয় হইয়া পড়ে। ক্রমে কৃষিঋণ ছাড়াও অন্যান্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রেও সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯১২ সালে আর একটি আইন প্রণীত হয়। এই আইনের মাধ্যমে সমবায় আন্দোলনের বিশেষ প্রসার ঘটে। গ্রাম্য সমবায় সমিতিগুলিকে অর্থসাহায্যের জন্য ক্রমে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সমবায় সরবরাহ সমিতি, বিক্রয় সমিতি ইত্যাদি স্থাপিত হয় এবং সমবায় আন্দোলনের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতেই জাতীয় সরকার সমবায় আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সমবায় ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। গ্রাম্যঋণ অনুসন্ধান কমিটি সমবায় আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করেন। কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সমবায় ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস করার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতবর্ষে সমবায় সমিতিগুলির অধিকাংশই কৃষকদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ২ লক্ষ ৪৫ হাজার সমবায় সমিতির মধ্যে ২ লক্ষের কিছু অধিক ছিল কৃষিসংক্রান্ত ও প্রায় ৩৮ হাজার ছিল অকৃষি-সংক্রান্ত সমবায় সমিতি। আবার কৃষিসংক্রান্ত সমবায় সমিতির মধ্যে কৃষিঋণ সমিতির সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৬১ হাজার। ঋণ ছাড়া অন্য সংক্রান্ত সমবায় সমিতির প্রসার ভারতবর্ষে বিশেষ হয় নাই। এইরূপ সাধারণ সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গৃহ নির্মাণ সমিতি, বীমা সমিতি, স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতি ইত্যাদি।

গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতি (Rural Co-operative Credit Societies) :

কৃষি সংক্রান্ত সমুদয় সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ প্রাথমিক

ঋণদান সমিতি। সমবায়ের পূর্বোক্ত মূলনীতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া একই গ্রামের দশ বা ততোধিক ব্যক্তি সমিতি গঠন করে। সমিতির সভ্যদের দায়িত্ব সীমাহীন ; অর্থাৎ সমিতির ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে সভ্যদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিও ক্রোক করা যাইতে পারে। সভ্যদের মধ্য হইতে একটি পরিচালক সমিতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। সভ্য বা সম্পাদক বিনা মাহিনায় কাজ করেন। সমিতিগুলির মূলধনের উৎস ঃ

(ক) সভ্যদের প্রবেশমূল্য,

(খ) শেয়ার বিক্রয়ের টাকা,

(গ) আমানত (Deposits) ও

(ঘ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক হইতে প্রাপ্ত ঋণ। শুধুমাত্র সভ্যদের মধ্যে সমিতির টাকা ঋণ দেওয়া হয়। অপর দুইজন সভ্যকে ঋণগ্রহণ করিবার সময় জামিন রাখিতে হয়। সহজ কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয় এবং আদায়ীকৃত মূলধনের উপর লভ্যাংশ (Dividend) দেওয়া হয়। সমবায় সমিতিগুলির নিয়ন্ত্রণের জন্য ও হিসাব পরীক্ষার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একজন করিয়া সমবায় সমিতিনিয়ামক (Registrar of Co-operative Societies) থাকেন। সমিতিগুলিকে আয়কর ও স্ট্যাম্প ডিউটি দিতে হয় না।

সমবায় ও কৃষি (Co-operation and Agriculture) ঃ

ভারতের কৃষিব্যবস্থায় সমবায়ের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ঋণদান সমিতি ছাড়াও আরও অন্যান্য প্রকার সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়া কৃষকের বিভিন্ন অভাব দূর করার চেষ্টা করা হইতেছে। সমবায় ক্রয় সমিতির মাধ্যমে সভ্যদের ভাল বীজ, সার ও কৃষি সংক্রান্ত অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়। সভ্যদের ফসল ন্যায্য মূল্যে বাজারে বিক্রয়ের জন্য উত্তর প্রদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি রাজ্যে সমবায় বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। বলদ ক্রয়ের সুবিধার জন্য পশুবীমা সমিতিও উল্লেখযোগ্য। কৃষকদের ব্যক্তিগত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূখণ্ড একত্রিত করিয়া সমবায় প্রথায় চাষের জন্য সমবায় কৃষি সমিতির ব্যবস্থা পাঞ্জাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া, জমিতে জলসেচের জন্য সমবায় জলসেচ সমিতি, পল্লী উন্নয়নের জন্য সমবায় গ্রামোন্নয়ন সমিতি ইত্যাদি গঠনের দ্বারা কৃষি সংক্রান্ত নানাবিধ কার্য সমবায় সমিতির মাধ্যমে সম্পন্ন করার চেষ্টা হইতেছে।

অ-কৃষি সংক্রান্ত সমবায় সমিতি (Non-Agricultural Co-operative Societies) :

অল্পসঙ্গতিসম্পন্ন লোকেরা স্বেচ্ছায় সমবায় সমিতি গঠন করিয়া থাকে। সুতরাং, কৃষিসংক্রান্ত কার্যাদি ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারেও সমবায় সমিতি গঠন করা যায়। শহর ও গ্রামাঞ্চলে এইরূপ অকৃষিসংক্রান্ত সমিতি স্থাপন করা হইয়াছে। শহরাঞ্চলে স্বল্প আয়ের ব্যক্তিদের জন্য সমবায় গৃহ নির্মাণ সমিতি, সমবায় ভাণ্ডার, সমবায় ঋণদান সমিতি ইত্যাদি করা হইয়াছে। কুটির শিল্প সম্পর্কিত নানাবিধ কার্যের সুবিধার জন্যও সমবায় সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের তন্তুবায় সমিতির কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সমালোচনা (Criticism) :

ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সমবায় প্রথার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। তথাপি, প্রয়োজনের তুলনায় সমবায় আন্দোলনের প্রসার সন্তোষজনক হয় নাই। এতাবৎকাল প্রধানতঃ কৃষিঋণ সরবরাহের ক্ষেত্রেই সমবায় সমিতির কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ বর্তমানে সমবায় আন্দোলনের সহিত জড়িত। কিন্তু, এই আন্দোলনের প্রসার যে কত সীমায়িত ও ত্রুটিপূর্ণ এদিকে সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করেন গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটি। এই কমিটির মতে মোট কৃষিঋণের মাত্র ৩ শতাংশ সরবরাহ হইয়া থাকে সমবায় সমিতিগুলি হইতে। প্রায় ৯৩ শতাংশ এখনও পর্যন্ত সরবরাহ হইয়া থাকে চিরাচরিত গ্রাম্য মহাজনদের দ্বারা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রয়োজনের তুলনায় সমবায় আন্দোলন কত পিছাইয়া আছে।

ভারতে সমবায় আন্দোলনের মূলনীতিগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হইয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে, সমবায় সমিতির সভ্যরা এই নীতি সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত নয়। সমিতিগুলির ঋণের হার অত্যন্ত বেশী। ইহা ছাড়া, আত্মীয় তোষণ ও অন্যায়ভাবে ঋণগ্রহণেরও প্রচুর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক ও প্রাথমিক সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির পরিচালনাও বহুলাংশে বিশেষ ত্রুটিপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দরিদ্র কৃষকের পরিবর্তে ঋণের সুবিধা পাইয়া থাকে অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ব্যক্তিরা।

প্রতিকার (Remedies) :

সমবায় সমিতিগুলির অসংখ্য ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইহাদের অবলুপ্তি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে বিপজ্জনক হইবে। সমবায় আন্দোলনকে সঞ্জীবিত করিবার জন্য ও ব্যাপকভাবে প্রচার করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক। গ্রাম্য ঋণ অনুসন্ধান কমিটি এই প্রসঙ্গে সুপারিশ করেন যে, সমবায় সমিতিগুলির সহিত সরকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা প্রয়োজন। বহুমুখী প্রাথমিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও কমিটি উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত সরকার মোটামুটি এই কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুযায়ী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে সমবায় সমিতির মাধ্যমে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রায় ১০৫০০ হাজার প্রাথমিক সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। কেবলমাত্র ঋণদানের ব্যাপারেই নয়, ফসল বিক্রয়ের জন্যও সমবায় সমিতি কার্যকরী করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব সত্ত্বেও ইহাকে কখনই সরকারী ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করা উচিত নয়। সমবায়ের মূলভিত্তি জনসাধারণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত, স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। প্রথমাবস্থায় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু পুরাপুরি সরকারী হস্তক্ষেপ সমবায় ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the importance of the co-operative movement in India.
(ভারতে সমবায় আন্দোলনের গুরুত্ব আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৪১ দেখ)

2. Discuss the organisation and functions of the rural cooperative credit societies.
(গ্রাম্য সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির সংগঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর।)
(পৃঃ ১৪০-১৪১ দেখ)

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা
(Community Development Project and National Extension Service)

লক্ষ্য (Objectives):

১৯৫২ সালে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই পরিকল্পনার লক্ষ্য গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নতি। গ্রামাঞ্চলের সমস্যাগুলি নানারূপ। কৃষি, পথঘাট, কুটিরশিল্প ইত্যাদি সমস্যাগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে সমাধান করার কিছু কিছু প্রচেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু গ্রামের সমস্যাগুলি প্রকৃতপক্ষে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অতএব, গ্রামীণ অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে এক একটি সমস্যাকে নির্বাচন করিয়া সমাধান করিলে চলিবে না; সামগ্রিক সমাজোন্নয়নের দৃষ্টিকোণ হইতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই উদ্দেশ্যেই সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

সংগঠন (Organisation): এই উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্গত এক একটি অঞ্চল ৫০০ বর্গমাইল জমি, ৩০০ গ্রাম ও ২ লক্ষ অধিবাসী লইয়া গঠিত। প্রত্যেকটি পরিকল্পনা অঞ্চল তিনটি করিয়া উন্নয়ন ব্লক লইয়া গঠিত। এইরূপ প্রত্যেকটি ব্লকে আছে ১৬৬ বর্গমাইল জমি, ১০০ গ্রাম ও ৬০ হইতে ৭০ হাজার অধিবাসী। প্রতিটি ব্লক, আবার ৫টি করিয়া গ্রাম লইয়া গঠিত এবং প্রতিটি গ্রাম একজন করিয়া শিক্ষিত গ্রাম সেবকের অধীনে। প্রতিটি পরিকল্পনা অঞ্চলে একজন পরিকল্পনা কর্মচারী আছেন ও প্রতিটি ব্লকে একজন ব্লক উন্নয়ন কর্মচারী আছেন। জেলা পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটির নিকট হইতে ইঁহারা পরামর্শ গ্রহণ করেন। পরবর্তী স্তরে রাজ্যে রাজ্য পরিকল্পনা কমিটি ও কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় কমিটি আছে। পরিকল্পনার মূলনীতি নির্ধারণ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিপূরক বিভাগ জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা।

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনায় যেরূপ ব্যাপকভাকে উন্নয়ন প্রচেষ্টা করা হয়, জাতীয় সম্প্রসারণ সেবার মাধ্যমে সেইরূপ করা হয় না। অল্প সময়ে ও কম অর্থব্যয়ে সীমাবদ্ধ লক্ষ্যের ভিত্তিতে ইহার কার্যাদি গ্রহণ করা হয়। ১০০টি গ্রাম লইয়া এক একটি জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা অঞ্চল গঠিত হয়। প্রত্যেকটি সম্প্রসারণ সেবা অঞ্চলকে পূর্ণাঙ্গ সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনা অঞ্চলে পরিবর্তিত করা হয়।

উপরোক্ত দুই প্রকার অঞ্চল মিশাইয়া মোট ১২০০ ব্লক প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে স্থাপিত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট ৫০০০ উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের সমগ্র জনসংখ্যাকে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার পরিধির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে স্থির হইয়াছিল। বর্তমানে মনে করা হয় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব হইবে।

সমালোচনা (Criticism) :

সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার ত্রুটিগুলির প্রতি বলবন্ত রাও মেহতা কমিটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শ্রী ভি, কে, আর, ভি, রাও তাঁহার পরিকল্পনা সংক্রান্ত রিপোর্টেও কতকগুলি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার বৃহত্তম ত্রুটি হইল যে, এতাবৎকাল জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টির ব্যাপারে ইহা বিশেষ কার্যকরী হয় নাই। এই পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের সহযোগিতার মাধ্যমে গ্রামের সামগ্রিক সমাজোন্নয়ন। জনসাধারণকে উন্নয়নমুখী করিতে না পারিলে পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, কর্মসূচী অনুপাতে সাফল্যের পরিমাণও আশানুরূপ হয় নাই। বহুমুখী প্রচেষ্টার অভাব এই পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হইয়াছে।

উপরোক্ত ত্রুটিগুলি সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে, গ্রামীণ অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের পক্ষে এই জাতীয় পরিকল্পনা অপরিহার্য। তবে, জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা ও উন্নয়নমুখিতা ছাড়া পরিকল্পনার সাফল্য অসম্ভব।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the salient features of the community development project in India.

(ভারতে সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত কর।) (পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

2. Outline the scheme of the national extension service in India.
(ভারতের "জাতীয় সম্প্রসারণ সেবা" ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) (পৃঃ ১৪৪-১৪৫)

চতুর্থ অধ্যায়

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প
(Small-Scale and Cottage Industries)

জাতীয় আয় কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় যে, ভারতীয় শিল্পব্যবস্থার অসংগঠিত অংশ হইতে জাতীয় আয়ের দশভাগ সংগৃহীত হয়। কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ প্রধানতঃ শিল্পব্যবস্থার এই অসংগঠিত অংশের অন্তর্ভুক্ত। বিদেশী শিল্প ও আভ্যন্তরীণ বৃহদায়তন শিল্পের প্রতিযোগিতার ফলে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির অবস্থা শোচনীয় হইয়াছে। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতিতে এইরূপ শিল্পের স্থান অস্বীকার করা যায় না।

ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের গুরুত্ব (Importance of Cottage and Small Scale Industries in India's Economy) :

ভারতবর্ষের মত অনগ্রসর দেশে ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই শিল্পসমূহের সংরক্ষণ ও উন্নতির পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দেওয়া হয়।

প্রথমতঃ, ভারতবর্ষে মূলধনের একান্ত অভাব দেখা যায়। কিন্তু শ্রমের প্রাচুর্যহেতু বেকার সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই বেকার সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শিল্পায়নের গঠন এমন হওয়া উচিত যে অল্প মূলধনে বেশী শ্রমনিয়োগ করা সম্ভব হয়। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহ প্রধানতঃ অধিক শ্রমনিয়োগকারী শিল্প (labour-intensive industries)।

সুতরাং ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উন্নতির মাধ্যমে অধিকসংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প কৃষকদের আর্থিক জীবনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। কৃষিকার্যের অবস্থা এমন শোচনীয় যে কৃষক পরিবারের ব্যয় শুধুমাত্র এই কার্যদ্বারা নির্বাহ করা সম্ভব হয় না। গ্রামে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিলে অবসর সময়ে চাষীরা এই শিল্পে কাজ করিয়া অতিরিক্ত আয়ের সংস্থান করিয়া লইতে পারে। উপরন্তু, চাষীরা বৎসরে প্রায় ছয় মাস অবধি বেকার থাকে। এই বেকার অবস্থায় চাষীরা কুটির শিল্পে নিযুক্ত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে সামাজিক ব্যয় (social cost) স্বল্প। বৃহদায়তন শিল্পব্যবস্থায় যে সমস্ত আনুষঙ্গিক সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় (যেমন, কারখানা জীবনের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ) তাহার সমাধানের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়। কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে এই সামাজিক ব্যয় নিতান্ত কম।

চতুর্থতঃ, কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের মাধ্যমে আর্থিক বৈষম্য অনেকাংশে দূর করা সম্ভব। বৃহদায়তন শিল্পব্যবস্থায় জাতীয় আয় মুষ্টিমেয় লোকের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে। কিন্তু কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটিলে অধিকসংখ্যক লোকের মধ্যে জাতীয় আয় বণ্টিত হইবে।

পঞ্চমতঃ, দ্রুত শিল্পায়নের ফলে ভোগজাত দ্রব্যের যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে তাহা কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে অধিকতর উৎপাদনের দ্বারা মিটান সম্ভব হইবে।

অসুবিধা (Difficulties) :

কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহকে বিভিন্ন অসুবিধার সম্মুখীন হইতে দেখা যায়।

প্রথমতঃ, প্রাচীন ও অনুন্নত উৎপাদন পদ্ধতি এইরূপ শিল্পে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যে সমস্ত নূতন যন্ত্রপাতির আবিষ্কার হইয়াছে তাহার প্রচলন এখানে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, এইসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে আধুনিক কারিগরী শিক্ষার একান্ত অভাব দেখা যায়। এই শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগও তাহাদের খুব কমই আছে।

তৃতীয়তঃ, উৎকৃষ্ট কাঁচামাল সরবরাহের অসুবিধা এইসব শিল্পের অন্যতম দুর্বলতা। বৃহদায়তন শিল্পের সংগঠকেরা বিশেষ ধনী বলিয়া উৎকৃষ্ট কাঁচামাল ইহারাই সাধারণতঃ পাইয়া থাকে। ফলে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলিকে নিকৃষ্ট কাঁচামালের উপরই নির্ভর করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, এই সব শিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের বিক্রয়ের অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়। কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগঠকেরা সাধারণতঃ নিতান্ত দরিদ্র; কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয়ের জন্য তাহারা প্রায়ই মহাজনদের নিকট হইতে ঋণ লইয়া থাকে। মহাজনেরা ইহার সুযোগ লইয়া স্বল্পমূল্যে উৎপন্ন দ্রব্য তাহাদের নিকট বিক্রয় করিতে এইসব শিল্পের সংগঠকদের বাধ্য করে।

পঞ্চমতঃ, দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের অভাব ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সম্প্রসারণের পথে প্রধান অন্তরায়। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সাধারণতঃ এইসব শিল্পে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দিতে প্রস্তুত থাকে না।

অসুবিধা দূরীকরণের উপায় (Remedies) :

(১) উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। কিস্তিতে পরিশোধের প্রতিশ্রুতিতে এইসব শিল্পে আধুনিক যন্ত্রপাতির সরবরাহের ব্যবস্থা সরকারের করা উচিত। এই শিল্পগুলির উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য ভারতসরকার চারটি আঞ্চলিক শিল্পকলা সম্বন্ধীয় প্রতিষ্ঠান (Institutes of Technology) স্থাপন করিয়াছেন।

(২) এইসব শিল্পের ক্রয়-বিক্রয় ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কার্ভে কমিটি ক্রয় ও বিক্রয় সমবায় সমিতি স্থাপনের সুপারিশ করিয়াছেন। এইসব সমিতির মাধ্যমে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগঠকেরা সুবিধাজনক সর্তে কাঁচামাল ক্রয় ও উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে। ফলে, তাহাদের আর মহাজনের কবলে পড়িতে হইবে না।

(৩) আধুনিক রুচি অনুসারে ও আধুনিক পদ্ধতি মত সামগ্রী উৎপন্ন করিবার কারিগরী শিক্ষা এইসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে সরকারকে দেশের বিভিন্নস্থানে কারিগরী শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৪) মূলধনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য সমবায় ঋণদান সমিতিগুলির

(Co-operative Credit Societies) সম্প্রসারণ একান্ত প্রয়োজন। রাজ্য অর্থসংস্থাকে (State Finance Corporation) এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী হইতে হইবে। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহে দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই শিল্পসমূহে মূলধন সরবরাহের ব্যাপারে সম্প্রতি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অংশ গ্রহণ করিতেছে।

উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প (Important Cottage Industries)ঃ

ভারতীয় অর্থনীতিতে কয়েকটি কুটিরশিল্পের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

(ক) **বস্ত্রবয়ন শিল্পঃ** ভারতে হস্তচালিত তাঁত শিল্পে বর্তমানে ৬০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইয়া থাকে। প্রায় ৫০ কোটি টাকা মূল্যের সামগ্রী এই শিল্পে উৎপাদিত হয়। গ্রাম্য তাঁতিগণের রক্ষণশীলতা ও সূতার যোগানের অভাব বস্ত্রবয়ন শিল্পের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(খ) **রেশম শিল্পঃ** গুটিপোকার চাষ ও রেশম প্রস্তুত ও বয়ন ব্যবস্থা কুটিরশিল্প হিসাবে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা যায়। মহীশূর, কাশ্মীর, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চলে ইহা বিশেষ প্রচলিত। রেশম প্রস্তুত করিবার উন্নততর প্রণালী গ্রহণ করিতে না পারার দরুণ এই শিল্পটি বিদেশী যন্ত্রজাত রেশমের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারিতেছে না।

কাঁসা ও পিতল শিল্পঃ নানাপ্রকার ধাতুদ্রব্য কুটির শিল্পের মাধ্যমে ভারতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদ, কাশী, মোরাদাবাদ ইত্যাদি স্থানে কাঁসা ও পিতলের উন্নতধরণের বাসন প্রস্তুত হয়। অন্যান্য যন্ত্রজাত ধাতব বাসনপত্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হয় বলিয়া এই শিল্পটিও অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে।

মৃৎশিল্পঃ বাংলাদেশে মৃৎশিল্পের প্রচলন বহুদিন হইতে দৃষ্ট হয়। বাংলাদেশের কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পের বিশেষ খ্যাতি আছে। তবে, মৃৎশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা তেমন না থাকায় এই শিল্পটি দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে।

উপরোক্ত কুটিরশিল্পগুলি ছাড়াও অন্যান্য আরও কয়েকটির উল্লেখ করা যায়। বিড়ি শিল্প, অলঙ্কার শিল্প, সরিষার তৈল শিল্প ইত্যাদি শিল্পগুলিতে অনেক লোক আংশিকভাবে বা পূর্ণভাবে নিযুক্ত আছে।

প্রশ্নাবলী

1. Indicate the importance of cottage and small-scale industries in India's economy.

(ভারতীয় অর্থনীতিতে কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের গুরুত্ব নির্দেশ কর) (পৃঃ ১৪৬-১৪৭ দেখ)

2. Explain the difficulties experienced by small-scale industries. Suggest some remedies for their removal.

(ক্ষুদ্রায়তন শিল্পসমূহের সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ কর। সমাধানের কতকগুলি পন্থা নির্দেশ কর।)
(পৃঃ ১৪৭-১৪৯ দেখ)

পঞ্চম অধ্যায়

বৃহদায়তন শিল্প (Large-Scale Industries)

গুরুত্ব ও অসুবিধা (Importance and Difficulties) :

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিপ্রধান দেশ। সাম্প্রতিককালে শিল্পব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক সম্পদ ও জনসংখ্যার তুলনায় শিল্পায়ন খুবই সামান্য। অথচ, ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে হইলে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। ভারতবর্ষে শিল্পোন্নয়নের উপযোগী কাঁচামাল ও শিল্পে কাজ করিবার বহু শ্রমিক রহিয়াছে। কিন্তু দ্রুত শিল্পব্যবস্থার উন্নতির পথে কয়েকটি অন্তরায় দেখা যায়।

প্রথমতঃ, আধুনিক বৃহদায়তন শিল্পপ্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট স্থায়ী মূলধনের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্পগত মূলধনের অপ্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতবাসীর মাথাপিছু আয় নিতান্তই কম। জীবনধারণের জন্য আয়ের প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হয়। ফলে, সঞ্চয়ের জন্য কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। অথচ, জনসাধারণের সঞ্চয় হইতেই মূলধন গড়িয়া ওঠে। যাহাদের সঞ্চয় করিবার মত ক্ষমতা আছে তাহারাও শিল্পে সঞ্চয় বিনিয়োগ করিতে

বিমুখ। তাহারা জমিজমা ইত্যাদি ক্রয় করিবার জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করে।

দ্বিতীয়তঃ, সংগঠন-ক্ষমতা ও শিল্পোদ্যোগের অভাব শিল্পসমৃদ্ধির পথে প্রধান বাধা। আধুনিক শিল্পব্যবস্থাকে সংগঠন করিতে হইলে যথেষ্ট উদ্যোগ ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। শিল্প সংগঠককে সর্বদা ঝুঁকি বহন করিতে হয়। সুতরাং তাঁহার দূরদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। এইরূপ অভিজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন লোকের উদ্যোগেই শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে এই ধরণের লোকের সংখ্যা নিতান্ত সামান্য। অধিকাংশ লোকই নির্দিষ্ট বেতনে নিরাপদ বৃত্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে শিল্পসংগঠনের উদ্যোগ খুবই সীমাবদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, দক্ষ শ্রমিকের অভাব শিল্পোন্নয়নে অন্যতম অন্তরায়। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উৎপাদনের নূতন প্রক্রিয়া সম্পর্কিত জ্ঞানের অভাব ভারতীয় শ্রমিকের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। শ্রমিকের অদক্ষতাহেতু উৎপাদনের হার অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় কম।

চতুর্থতঃ, শ্রমের গতিশীলতার (mobility of labour) অভাবও ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতিকে ব্যাহত করে। সাধারণতঃ শ্রমিকেরা গ্রামাঞ্চলে বসবাস করে, এবং গ্রামাঞ্চলের প্রতি তাহাদের সুতীব্র আকর্ষণ দেখা যায়। এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন না হইলে গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বেশী সংখ্যায় শহরাঞ্চলের শিল্পে কাজ করিতে আসিবে না।

পঞ্চমতঃ, পরিবহন ব্যবস্থার অসুবিধা দ্রুত শিল্পোন্নয়নের পথে বাধার সৃষ্টি করে। শিল্পাঞ্চলে কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস লইয়া যাইবার জন্য, এবং উৎপন্ন দ্রব্য বাজারে আনিবার জন্য উপযুক্ত পরিবহন ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

ষষ্ঠতঃ, শক্তির (Power) অভাবও ভারতবর্ষের শিল্পে অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ। কয়লাই শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু কয়লাখনিগুলি কয়েকটি অঞ্চলে মাত্র সীমাবদ্ধ। ফলে, দূর শিল্পাঞ্চলগুলিতে শক্তির অভাব দেখা যায়। জলবিদ্যুৎশক্তির যথেষ্ট উন্নতি ঘটিলে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হইবে।

প্রতিকার (Remedies) :

আধুনিক শিল্পব্যবস্থা সংগঠনের জন্য যে সমস্ত কাঁচামাল প্রয়োজন তাহার অধিকাংশই ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র বা খনিসমূহ হইতে সংগ্রহ করা সম্ভব।

শিল্পে কাজ করিবার জন্য শ্রমের প্রাচুর্য এবং শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য এক সুবিশাল আভ্যন্তরীণ বাজার ভারতবর্ষে পরিলক্ষিত হয়। এই সমস্ত উপাদান শিল্পোন্নয়নের সহায়ক। কিন্তু মূলধনের অভাব, সংগঠন-ক্ষমতা ও উদ্যোগের অভাব এবং শিল্পশ্রমিকের দক্ষতার অভাব প্রধানতঃ ভারতবর্ষে শিল্পোন্নতিকে ব্যাহত করিতেছে। উপযুক্ত শিল্পঋণ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতিতে মূলধনের সমস্যার অনেকটা লাঘব ঘটিবে। ভারত সরকার বিভিন্ন শিল্পঋণ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের দ্বারা শিল্পঋণে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতেছেন। অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে দেশের লোকের আয় বৃদ্ধি পাইবে। এই বর্ধিত আয় যাহাতে সঞ্চয়রূপে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় তাহার জন্য ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার উন্নতি একান্ত প্রয়োজন। সরকারের শিল্পনীতি এমন হওয়া উচিত যে দেশে শিল্পোদ্যোগের আবহাওয়া সৃষ্টি হইতে পারে। অগ্রসর দেশগুলির শিল্পপ্রণালীর সঙ্গে পরিচয়ের ফলে এদেশের লোকের মধ্যে শিল্পসংগঠনের উদ্যোগ অধিক পরিমাণে দেখা দিবে। সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষার বিস্তার ঘটিলে শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধি পাইবে। দেশের বিভিন্নস্থানে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা বিশেষ প্রয়োজন।

ভারত সরকারের শিল্পনীতি (Industrial Policy of Government of India) :

সমাজতান্ত্রিক কাঠামো স্থাপন ভারত সরকারের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির প্রধান উদ্দেশ্য। মূলশিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ, আর্থিক বৈষম্য হ্রাস এবং অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা "কল্যাণ রাষ্ট্রের" সরকারের শিল্পনীতির মুখ্য লক্ষ্য হওয়া উচিত। ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত ভারত সরকারের শিল্পনীতি সম্পর্কিত প্রস্তাবের মধ্যে এই সমস্ত উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

শিল্পসমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা হইয়াছে। লৌহ, ইস্পাত, আণবিক শক্তি, কয়লা, দেশরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি ১৭টি শিল্পে ভবিষ্যতে নূতন উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করিবার কর্তৃত্ব একমাত্র রাষ্ট্রের থাকিবে। তবে এই শ্রেণীভুক্ত শিল্পগুলিতে বর্তমানে যে সকল উৎপাদন-কেন্দ্র ব্যক্তিগত পরিচালনায় পরিচালিত হইতেছে, তাহাদের সম্প্রসারণের অধিকার থাকিবে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে সকল শিল্প আছে তাহাতে রাষ্ট্রগত ও ব্যক্তিগত মালিকানা উভয়ই সহ-অবস্থান করিবে। সার উৎপাদন, যন্ত্রপাতি, রাস্তা, জলপথ প্রভৃতি

১২টি শিল্প এই শ্রেণীভুক্ত। এই সমস্ত শিল্পগুলি ক্রমশঃ রাষ্ট্রীয়করণ করা হইবে। অপরাপর শিল্পগুলি ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত হইবে। এই শিল্পগুলি সরকার হইতে আর্থিক ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভ করিবে।

বৃহৎ শিল্পগুলির উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ বা প্রত্যক্ষ সাহায্য দ্বারা সরকার গ্রাম্য ও কুটির শিল্পগুলির উন্নয়নের ব্যবস্থা করিবে। এই সব শিল্পের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে ইহাদের স্বাবলম্বী করা শিল্পনীতির লক্ষ্য।

এই শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থনীতির (Mixed Economy) কাঠামো পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান ভূমিকার স্বীকৃতিই এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্য।

উল্লেখযোগ্য বৃহদায়তন শিল্প (Important Large-Scale Industries) ঃ

ভারতবর্ষের বৃহদায়তন শিল্পগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান ঃ

(ক) **বস্ত্রশিল্প ঃ** আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সর্বপ্রথম কাপড়ের মিল্ স্থাপিত হয় কলিকাতায় ১৮১৮ সালে। বোম্বাই অঞ্চলে কাপড়ের মিল স্থাপিত হয় ১৮৫৩ সালে। পরবর্তীকালে বোম্বাই অঞ্চলে বস্ত্র শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা মূলতঃ ভারতীয় মূলধন ও উদ্যোগে স্থাপিত ও পরিচালিত। বর্তমানে বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই শিল্পে মোট উৎপাদন ছিল ৪১ লক্ষ বেল্। দক্ষ শ্রমিকের ও নূতন যন্ত্রপাতির অভাব বস্ত্রশিল্পে পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে উৎপাদনের হার কম হয় ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। এইজন্য বিদেশী বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় বস্ত্র শিল্পগুলি পারিয়া উঠে না।

(খ) **পাটশিল্প ঃ** শ্রীরামপুরের অন্তর্গত রিষড়াতে ১৮৫৫ সালে ভারতের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়। হুগলী নদীর উভয় তীরে প্রায় ২৫ মাইল ধরিয়া এই শিল্প বিশেষ প্রসার লাভ করে। অধিকাংশ কলগুলি একই অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় শিল্পের একদেশীয়তার সুযোগ তাহারা পাইয়া থাকে। এই শিল্পের সমস্যাগুলির মধ্যে কাঁচা পাটের অভাব, নূতন যন্ত্রপাতির অভাব ও বিক্রয়-ব্যবস্থার ত্রুটি অন্যতম। পাট অনুসন্ধান কমিশন শিল্পটির সমস্যাগুলি পর্যালোচনা করিয়া ১৯৫৪ সালে রিপোর্ট দাখিল করেন। সরকার কমিশনের সুপারিশ মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন। কাঁচাপাটের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে কমিশন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

(গ) **লৌহ ও ইস্পাত শিল্প ঃ** ১৯০৭ সালে জাম্‌সেদ্‌জী টাটা সর্বপ্রথম আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেন। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের বর্তমানে দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে সরকারী ও বেসরকারী শিল্পে মোট উৎপাদন ৫ মিঃ টন হইবে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রধান সমস্যা। উপরন্তু, এই শিল্পের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের জন্য মূলধনের একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে রুড়কেলা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে সরকারী তত্ত্বাবধানে আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া লৌহ ও ইস্পাত কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

(ঘ) **শর্করা শিল্প ঃ** আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত চিনি শিল্পের প্রচলন হয় ১৯৩২ সালের পর। প্রধানতঃ বিহার ও উত্তর প্রদেশে এই শিল্পের প্রসার ঘটিয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে বর্তমান ভারতবর্ষের চিনির মোট চাহিদা এই শিল্প মিটাইতে সমর্থ হয়। ইক্ষুর নিকৃষ্টতা ও যোগানের অপ্রাচুর্য এই শিল্পের অন্যতম প্রধান সমস্যা। এইজন্য উৎপাদন ব্যয় স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

(ঙ) **কাগজ শিল্প ঃ** কলিকাতার নিকটে বালিতে সর্বপ্রথম আধুনিক যন্ত্রপাতি সমন্বিত কাগজের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। বড় কারখানাগুলির অধিকাংশই বিদেশী মালিকানায় ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়।

(চ) **চা-শিল্প ঃ** বিদেশী মুদ্রা অর্জনের ব্যাপারে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে চা-শিল্পের বিশেষ গুরুত্ব আছে। এই শিল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, বিদেশী মূলধনে ও তত্ত্বাবধানে এই শিল্প প্রধানতঃ পরিচালিত হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে এই শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ ৬৪৪ মিঃ টন্ হয়।

উপরোক্ত প্রধান প্রধান শিল্পগুলি ছাড়াও ভারতবর্ষে চর্মশিল্প, কাচশিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, পশম শিল্প ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় শ্রমের দক্ষতার অভাব (Inefficiency of Indian Labour) :

অর্থনৈতিক দিক হইতে উন্নত দেশগুলির শিল্প-শ্রমিকের উৎপাদন দক্ষতার মাপকাঠিতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, ভারতীয় শ্রমিকের দক্ষতা কম হওয়ার কতকগুলি কারণ নির্দেশ করা যায়।

প্রথমতঃ, মজুরীর স্বল্পতাহেতু শ্রমিকদের জীবনযাত্রার মান নীচু হয়।

স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ভাল বাসস্থান ও পুষ্টিকর খাদ্য ইত্যাদি উপাদানগুলির উপর শ্রমিকের মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য নির্ভর করে। জীবনযাত্রার মান উন্নত হইলেই শ্রমিকের দক্ষতাও বৃদ্ধি পায়। ভারতে স্বল্প মজুরীর জন্য শ্রমিকেরা উপরোক্ত সুবিধাগুলি ভোগ করিতে পারে না। সেইজন্য তাহাদের দক্ষতাও ক্ষুণ্ণ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্পশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার অভাব শ্রমিকের দক্ষতাকে ক্ষুণ্ণ করে। আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় তখনই সম্ভব হয় যখন শ্রমিকদের মধ্যে শিল্পগত ও সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটে। ভারতবর্ষে শ্রমিকেরা অজ্ঞ ও অশিক্ষিত থাকার দরুন শিল্প প্রক্রিয়ার সহিত তাহাদের পরিচিতি নাই বলিলেই হয়।

তৃতীয়তঃ, ভারতের জলবায়ুও শ্রমিকদের কর্মদক্ষতার পরিপন্থী। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে একটানা দীর্ঘকাল খাটিতে হইলে শ্রমিকের কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়।

চতুর্থতঃ, ভারতবর্ষে শিল্পে নিযুক্ত স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কম। অধিকাংশ শ্রমিক প্রধানতঃ কৃষিজীবী। কিছুকাল কারখানায় কাজ করিবার পরই তাহারা চাষের সময় গ্রামে ফিরিয়া যায়। এইরূপ অস্থায়ী ও অনিয়মিত শ্রমিকের পক্ষে শিল্পদক্ষতা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চমতঃ, ভারতীয় শিল্পে উন্নত যন্ত্রপাতির প্রয়োগ দুর্লভ। নিকৃষ্ট যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করিতে হয় বলিয়া শিল্প শ্রমিকের কর্মদক্ষতাও কম হয়।

প্রতিকার (Remedies):

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, শিল্প শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাবের মূল কারণ দুইটি: স্বল্প মজুরীজনিত নিম্ন জীবনযাত্রার মান এবং আধুনিক উৎপাদন প্রক্রিয়ার সহিত শ্রমিকের পরিচয়ের অভাব। অতএব এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্বভাবতঃই দুইটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। আয় বৃদ্ধি পাইলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হইবে ও ফলে, শ্রমিকের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প শিক্ষার ও সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার একান্ত প্রয়োজন। আধুনিক শিল্প অত্যন্ত জটিল ও ইহাতে কাজ করিতে হইলে

বিশেষ কারিগরী জ্ঞান থাকা দরকার। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the factors impeding India's efforts at rapid industrial development.

(ভারতে দ্রুত শিল্পায়নের পথে প্রতিবন্ধকগুলি আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৫০-১৫১ দেখ)

2. Point out the main reasons for the inefficiency of industrial labour in India,

(ভারতে শিল্প-শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অভাবের প্রধান কারণগুলি নির্দেশ কর।)

(পৃঃ ১৫৪-১৫৫ দেখ)

3. Briefly describe the industrial policy of the Government of India.

(ভারত সরকারের শিল্পনীতি সংক্ষেপে বিবৃত কর।) (পৃঃ ১৫২-১৫৩ দেখ)

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতের আর্থিক পরিকল্পনা

(Economic Planning in India)

অর্থবিদ্যায় সাধারণভাবে মানুষের আর্থিক ক্রিয়াকলাপ, অর্থাৎ তাহার প্রয়োজন ও পূরণের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়। ভারতবর্ষের কোটি কোটি নরনারীর আর্থিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া পৃথকভাবে কিছু আলোচনা করাই বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

এ দেশের মানুষের আর্থিক ক্রিয়াকলাপ বড় ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। সামান্য কিছু চাষবাস, পশুপালন, ছোটখাট কুটির শিল্প ইহা লইয়াই বেশীর ভাগ মানুষকে সন্তুষ্ট থাকিতে হয়। বড় আকারের ব্যবসায় বা শিল্পের সংখ্যা এখনও এ দেশে নগণ্য বলিলেই চলে। ফলে, এ দেশের অধিকাংশ লোকের আয় অত্যন্ত অল্প; সেই আয় হইতে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব

মিটাইবার সামর্থ্য তাহাদের থাকে না। ভারতের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে এ দেশের লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ২৯০ টাকার মত, অর্থাৎ মাসে ২৫ টাকারও কম। এই সামান্য আয়ের অধিকাংশ শুধু প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্যই ব্যয় করিতে হয়, অন্যান্য বস্তু কিনিবার ক্ষমতা খুব কম লোকেরই থাকে। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে এ দেশে মৃত্যুর হার এখনও অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। এই শোচনীয় দারিদ্র্যের প্রতিবিধান কিভাবে করা সম্ভব সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু আলোচনা করা দরকার।

দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িলে জাতীয় আয়ও বৃদ্ধি পায়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা যদি একই অনুপাতে বাড়িয়া যায় তাহা হইলে মাথাপিছু আয় অপরিবর্তিত থাকে। জন-সংখ্যার বৃদ্ধি যদি জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি অপেক্ষা দ্রুতগতিতে হয় তাহা হইলে মাথাপিছু আয় হ্রাস পায়। মাথাপিছু আয় বাড়াইতে হইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি অপেক্ষা জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি আরও দ্রুত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং এ দেশের সুদীর্ঘকালব্যাপী দারিদ্র্য দূর করিতে হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার নিয়ন্ত্রণ এই দুই মূলনীতি অবলম্বন করিতে হইবে। ইহা ছাড়া যাহাদের আয় অপেক্ষাকৃত বেশী তাহাদের উপর কর বসাইয়া যাহাদের আয় কম তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য দিলেও একশ্রেণীর লোকের দারিদ্র্য ও দুর্দশা দূর হইতে পারে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে এইভাবে কিছু লোকের দারিদ্র্য দূর হইলেও ইহাতে মোট জাতীয় আয় বা মাথাপিছু আয় কিছুই বাড়ে না।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সাফল্য (Aims, objectives and success of the Five-year Plans) :

দেশ স্বাধীন হইবার পরে ভারত রাষ্ট্রের মুখ্য সমস্যা দারিদ্র্য দূরীকরণের সমস্যা। বিদেশী শাসকদের আমলে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সহিত আর্থিক জীবনের যোগাযোগ ছিল খুবই সামান্য। দেশের সরকার অবশ্য খাজনা ও কর আদায় করিতেন, কিন্তু সেই রাজস্ব শাসন-ব্যবস্থা বজায় রাখিবার জন্যই খরচ হইত, জনসাধারণের আর্থিক উন্নতি বিধানের জন্য খরচের বরাদ্দ ছিল খুবই সামান্য। জনসাধারণ নিজ নিজ ক্ষমতা ও অভিরুচি অনুযায়ী উৎপাদনের কার্যে অংশ গ্রহণ করিত, তাহাতে তাহাদের আয় কম হইল কি বেশী হইল তাহার প্রতি

লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিত না। এই ধরণের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় আর্থিক জীবন সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে একেবারেই মুক্ত থাকে বলিয়া ইহাকে বলা হয় 'পরিকল্পনাবিহীন আর্থিক ব্যবস্থা' (unplanned economy)। স্বাধীন ভারতের জাতীয় সরকার দেশের দারিদ্র্য দূর করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প। সুতরাং যাহাতে আর্থিক জীবনে সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, যাহাতে প্রত্যেকেই পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করিতে পারে, তাহার দায়িত্ব সরকারকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে। যে ব্যবস্থায় আর্থিক জীবনকে কতকগুলি নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছাইয়া দিবার দায়িত্ব দেশের সরকার গ্রহণ করে তাহাকে বলা হয় 'পরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থা' (Planned economy)। এই সকল লক্ষ্য (targets) এবং লক্ষ্যে পৌছিবার উপায়-সমূহকে লইয়াই 'আর্থিক পরিকল্পনা' (economic plan) রচিত হয়।

স্বাধীন ভারতে প্রথম আর্থিক পরিকল্পনা রচিত হয় ১৯৫২ সালে। এই পরিকল্পনায় পাঁচ বৎসরের কার্যসূচী নির্দিষ্ট হইয়াছিল, সেইজন্য ইহাকে বলা হয় 'পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা'। এপ্রিল, ১৯৫১ হইতে মার্চ, ১৯৫৬—এই পাঁচ বৎসর ছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল। এই পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধি। ইহার মধ্যে খাদ্যশস্য, পরিধেয়, বাসগৃহ প্রভৃতি ভোগ্য দ্রব্য এবং সেচের খাল, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি মূলধন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে নানা ধরণের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য সরকারের মোট ব্যয় হইয়াছিল ১৯৬০ কোটি টাকা। কার্যত ইহার ফলে জাতীয় আয় শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই পাঁচ বৎসরে দেশের জনসংখ্যা শতকরা প্রায় ১২ ভাগ বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং মাথাপিছু আয় অন্ততঃ খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া চলে। এইভাবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তাহার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অতিক্রম করিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল।

এই সাফল্যের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয়ের বরাদ্দ এবং উদ্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ বেশ খানিকটা বাড়াইয়া দেওয়া স্থির হইল। এপ্রিল, ১৯৫৬ হইতে মার্চ, ১৯৬১, এই পাঁচ বৎসরে উন্নয়নমূলক সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ ৪৮০০ কোটি টাকা ধার্য করা হইল। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে ইহাতে পাঁচ বৎসরে জাতীয় আয়ের শতকরা ২৫ ভাগ বৃদ্ধি

আশা করা যায়। ইহাই দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। উপরন্তু এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কার্যসূচী অবলম্বন করিলে দেশে অতিরিক্ত প্রায় ১ কোটি লোকের কর্মসংস্থান হইবে ইহাও অন্যতর অভিপ্রেত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছিল। এই উভয় দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সরকার গত কয়েক বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিতেছেন উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের পরিধি বিস্তৃত করিতে। কিন্তু যে পরিমাণে ব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল, ঠিক সেই পরিমাণে রাজস্ব ইত্যাদি সংগ্রহ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। সেইজন্য ১৯৫৮ সালের শেষভাগে স্থির হইয়াছে যে দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উন্নয়ন ব্যয়ের মোট পরিমাণ হইবে ৪৫০০ কোটি টাকা। তবে যদি যথেষ্ট পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হয়, তাহা হইলে ব্যয়ের বরাদ্দ ৪৮০০ কোটি টাকাই রাখা হইবে।

দেশের আর্থিক উন্নতির জন্য এই সকল পরিকল্পনা রচনা করিবার ভার ১৯৫০ সালে গঠিত এক 'পরিকল্পনা সংস্থার' (Planning Commission) উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে। পরিকল্পনা-সংস্থা দেশের প্রয়োজন বিচার করিয়া এবং সরকারের রাজস্ব আগমের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়া পরিকল্পনা রচনার কাজে অগ্রসর হন। এই সকল পরিকল্পনায় শুধু যে সরকারী কর্মসূচীর কথা আলোচিত হয় এমন নয়। শিল্প-সংগঠকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে মূলধন নির্মিত হইতেছে তাহারও একটি হিসাব পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই ধরণের ব্যক্তিগত মূলধন নির্মাণের পরিমাণ ১৯৫১-৫৬ সালে ১৮০০ কোটি টাকা, ১৯৫৬-৬১ সালে ৩১০০ কোটি টাকা এবং ১৯৬১-৬৬ সালে ৪০০০ কোটি টাকা হইবার কথা। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে গত কয়েক বৎসরে মূলধন নির্মাণের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিয়াছে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ এই মূলধনের প্রসার। ইতিপূর্বে মূলধনের প্রসার ও জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির মধ্যে যে সম্পর্কের উল্লেখ করা হইয়াছে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও আমরা তাহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আর্থিক পরিকল্পনাসমূহের দ্বারা দেশের আর্থিক-জীবন যে-ভাবে রূপান্তরিত হইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হইল:

১। **কৃষি**: যদিও ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, তথাপি এখানকার কৃষি-ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। এদেশের শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী,

অথচ অধিকাংশ কৃষকের আর্থিক অবস্থা নৈরাশ্যজনক। চাষের জমির স্বল্পতা, উন্নততর চাষের প্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাব, উৎকৃষ্ট যন্ত্রপাতি, সার ও জলসেচের ব্যবস্থার অপ্রাচুর্য এবং কৃষিঋণের দুষ্প্রাপ্যতা, এই কয়েকটি কারণেই চাষীর অবস্থা এত শোচনীয়। বহু বৎসর ধরিয়া দারিদ্র্য ও অভাবের সহিত সংগ্রাম করার ফলে চাষীর মনোবলও নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কৃষিব্যবস্থাকে উন্নততর করিবার জন্য কয়েকটি কর্মপ্রণালী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করিতে হয় সমাজ-উন্নয়ন (Community Development) ও জাতীয় সম্প্রসারণ (National Extension) পরিকল্পনার। এই উভয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য চাষীকে উন্নততর চাষের প্রণালী শিখাইয়া নিজের আর্থিক অবস্থার উন্নতি বিধানে তৎপর করিয়া তোলা। সমষ্টি-উন্নয়নে গ্রামের সকল লোককেই অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহারা যৌথ প্রচেষ্টায় রাস্তাঘাট, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণ করিতে পারে, নিজেদের সুবিধার জন্য সমবায়-সমিতি গঠন করিতে পারে এবং পঞ্চায়েত সমিতি গঠন করিয়া তাহার মাধ্যমে নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যবস্থা করিতে পারে। ১৯৫২ সালের ২রা অক্টোবর তারিখে সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনার গোড়াপত্তন হয়। বর্তমানে দেশের প্রায় ৩৩০০০ গ্রাম এবং তাহাদের সওয়া লক্ষ অধিবাসী এই পরিকল্পনার সুফল ভোগ করিতে পারিতেছে। জাতীয় সম্প্রসারণ পরিকল্পনাটি ১৯৫৩ সাল হইতে কার্যকরী হইয়াছে। বর্তমানে দুই লক্ষের বেশী গ্রাম এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

কৃষির উন্নতি উৎকৃষ্ট সেচ-ব্যবস্থার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। এ দেশে অধিকাংশ কৃষিক্ষেত্রে জলসেচের কোনো ব্যবস্থা নাই। চাষীকে বৃষ্টির জলের উপর নির্ভর করিয়া চাষবাস করিতে হয়। দেশ স্বাধীন হইবার পূর্বে সেচের যতটুকু ব্যবস্থা ছিল, তাহাতে শতকরা মাত্র ১৮ ভাগ জমিতে জল সরবরাহ করা সম্ভব হইত। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সেচব্যবস্থার সম্প্রসারণের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ১ কোটি একর (acre) জমিতে নূতন জলসেচের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ২ কোটি একরেরও বেশী জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার কথা আছে। সেচব্যবস্থার প্রসার হইলে স্বভাবতঃই জমির ফলন বৃদ্ধি পায়। যে জমিতে পূর্বে ৭-৮ মণ ধান্য হইত, এখন সেখানে ১০-১২ মণ পাওয়া

যাইতে পারে। দেশের খাদ্য সরবরাহ বাড়াইবার জন্য সেচব্যবস্থার অগ্রগতি খুবই প্রয়োজন।

কৃষির উন্নতির জন্য জমিতে প্রদত্ত সারের পরিমাণও বাড়াইতে হইবে। এ দেশের জমিতে খুব সামান্যই সার দেওয়া হয় এবং সেইজন্যই অন্যান্য দেশের তুলনায় এ দেশের জমির উর্বরাশক্তি অপেক্ষাকৃত কম। দেশে সারের পরিমাণ বাড়াইবার জন্য বিহারের অন্তর্গত সিন্ধ্রিতে একটি বৃহদাকার রাসায়নিক সারের কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে দেশের অন্যান্য অংশে এই ধরণের আরও কয়েকটি কারখানা স্থাপন করার কথা চলিতেছে। রাসায়নিক সার ব্যতীত নানাবিধ জৈব (organic) সার, যেমন, পচা-পাতা, গোময়, মৃত-পশুর হাড় ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়াও জমির উর্বরাশক্তি বাড়াইবার চেষ্টা করা হইতেছে।

কৃষকের কাজের সুবিধার জন্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি দেশে প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সকল যন্ত্র চালনার জন্য এবং গ্রামাঞ্চলে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ঐ সকল অঞ্চলে সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করার চেষ্টা চলিতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় দামোদর, ময়ূরাক্ষী, মহানদী, শতদ্রু প্রভৃতি নদীতে বাঁধ দিয়া একাধারে বন্যা নিবারণ, সেচের জল সরবরাহ এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এই সকল নদী উপত্যকা পরিকল্পনার (River Valley Project) উদ্দেশ্য বহুবিধ বলিয়া ইহাদিগকে বলা হয় বহুমুখী (multipurpose) পরিকল্পনা।

২। **শিল্প**: বর্তমান যুগে যে সকল দেশ বিশেষভাবে আর্থিক উন্নতি করিয়াছে তাহাদের মধ্যে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ক্যানাডা, হল্যাণ্ড প্রভৃতির নাম করিতে হয়। এই সব দেশ শিল্পপ্রধান, অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোক কল-কারখানায় কাজ করিয়া জীবিকা অর্জন করে। শিল্প প্রতিষ্ঠার দ্বারা বহু লোকের কর্মসংস্থান হয় এবং সাধারণতঃ শিল্পে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় অপেক্ষাকৃত বেশী হইতে দেখা যায়। সেইজন্য শিল্প-প্রতিষ্ঠার দ্বারাই ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারত সরকার এ বিষয়ে অবহিত থাকিয়া বহু নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তুলিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল সরকারী প্রচেষ্টায় নয়, যাহাতে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও নূতন শিল্প দেশে গড়িয়া ওঠে, সেই উদ্দেশ্যেও একাধিক কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। ছোট, বড় ও মাঝারি সব রকমের শিল্পেই

সরকারী সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিদেশী শিল্পের প্রতিযোগিতা হইতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত দেশীয় শিল্পকে বাঁচাইবার জন্য শিল্প সংরক্ষণ (Protection) নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। বিশেষ প্রয়োজনীয় ও ব্যয়-বহুল শিল্পসমূহ সরাসরি সরকারী পরিচালনায় গড়িয়া তুলিবার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ শিল্প দেশে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জনে রেল ইঞ্জিনের কারখানা, সিন্ধ্রিতে রাসায়নিক সারের কারখানা, বাঙ্গালোরে যন্ত্রপাতি ও টেলিফোনের সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণের কারখানা, মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পিম্‌প্রিতে পেনিসিলিনের কারখানা, মাদ্রাজের সন্নিকটে পেরাম্বুর নামক স্থানে রেলের কামরা প্রস্তুতের কারখানা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী উদ্যোগে তিনটি ইস্পাতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেশে লৌহ ও ইস্পাত নির্মাণের সুবিধা যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে। এই তিনটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে বাংলা দেশে দুর্গাপুরে, উড়িষ্যার অন্তর্গত রুর-কেলায়, মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত ভিলাই নামক স্থানে। অদূর ভবিষ্যতে ইস্পাত, ভারী যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক কলকব্জা ইত্যাদির আরও কয়েকটি বৃহদাকার কারখানা দেশে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে দেশে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহাদের উন্নতির ব্যবস্থাও পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। বস্ত্রশিল্প, পাটজাত দ্রব্য, চিনি, সিমেণ্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরাতন যন্ত্রপাতির সংস্কার এবং উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এই সকল আধুনিক শিল্প ব্যতীত দেশে প্রাচীন পদ্ধতিতে পরিচালিত বহু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে হস্তচালিত তাঁতশিল্প আকারে বৃহত্তম। ইহা ছাড়া রেশম, পশম, নানাবিধ ধাতু ও পাথরের কাজ, বাঁশ ও বেতের কাজ, ইত্যাদি ছোট আকারের শিল্পে বহু লোক নিযুক্ত আছে। সাধারণতঃ এই সকল শিল্পে নিযুক্ত কর্মীরা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র। এই সকল শিল্পে উৎপাদনের পদ্ধতি উন্নত হইলে ইহাদের আয় বৃদ্ধি পাইবে। ক্ষুদ্র শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বিশেষভাবে চেষ্টা করা হইয়াছে।

৩। **পরিবহন ব্যবস্থা :** দেশে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার হইলে এক-

স্থানের উৎপন্ন দ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া গিয়া সেখানকার লোকের প্রয়োজন পূরণ করা যায়। ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার আবার নির্ভর করে রাস্তাঘাট, রেলপথ, বিমান বা জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থার উপর। আমাদের দেশে প্রয়োজনের অনুপাতে এই সকল ব্যবস্থা এখনও খুব অপর্যাপ্ত। সেইজন্য আমাদের পরিকল্পনায় দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। নূতন রেলপথ নির্মাণ, পুরাতন রেলপথের সংস্কার, নূতন রেলগাড়ী ও ইঞ্জিন ক্রয় ইত্যাদির জন্য পরিকল্পনায় ব্যবস্থা রহিয়াছে। দেশের বিভিন্ন অংশে প্রশস্ত জাতীয় রেলপথ এবং অন্যান্য পাকা ও কাঁচা সড়ক নির্মাণের বরাদ্দও করা হইয়াছে। জাহাজ চলাচল ও বিমান পরিবহনের ব্যবস্থা বিস্তৃততর করিবার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনায় কয়েকটি প্রস্তাব করা হইয়াছে।

৪। **সমাজ কল্যাণ:** দেশের জনসাধারণ যাহাতে উন্নততর স্বাস্থ্যের অধিকারী হইতে পারে তাহার জন্য চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক ব্যয়বরাদ্দ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতধরণের শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে। নূতন বাসগৃহ নির্মাণ ও শ্রমজীবীদের জন্য কল্যাণ-কেন্দ্র স্থাপন ইত্যাদি জনসেবামূলক কাজের জন্যও পরিকল্পনায় একাধিক কার্যসূচী অবলম্বন করা হইয়াছে।

নীচের তালিকা দুইটি হইতে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারী ব্যয় ও কর্মধারার একটি পরিচয় পাওয়া যাইবে।

প্রথম পরিকল্পনায় (১৯৫১-৫৬) সরকারী ব্যয়ের হিসাব

		কোটি টাকা
১।	কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	২৯৯
২।	সেচ-ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন	৫৮৫
৩।	শিল্প ও খনিজ উৎপাদন	১০০
৪।	পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	৫৩২
৫।	সামাজিক সেবামূলক কাজ	৪২৩
৬।	অন্যান্য ব্যয়	৭৪
		২০১৩*

* এই হিসাবে সম্পূর্ণ ঠিক নয়। মোট ব্যয়ের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কিছু কম হইয়াছিল। সর্বশেষ হিসাবে মোট ব্যয় ১৯৬০ কোটি টাকা বলিয়া ধরা হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (১৯৫১-৬১) সরকারী ব্যয়ের বরাদ্দ

	কোটি টাকা
১। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন	৫৬৮
২। সেচ-ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন	৮৬০
৩। বৃহদাকার শিল্প ও খনিজ উৎপাদন	৮৮০
৪। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	২০০
৫। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৩৪৫
৬। সামাজিক সেবামূলক কাজ	৮৬৩
৭। অন্যান্য ব্যয়	৮৪
	৪৮০০†

প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা ঃ

(ক) প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষি উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি।

প্রথমতঃ, ভারতের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ;

দ্বিতীয়তঃ, কাঁচামালের সরবরাহ বৃদ্ধি করিতে না পারিলে দ্রুত শিল্পায়ন সম্ভব হয় না। এই দুইটি কারণে কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা অপরিহার্য।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হয় শিল্পের উপর। দ্রুত শিল্পসমৃদ্ধি না ঘটিলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু শিল্পব্যবস্থার ভিত্তির উপর ভাবীকালের অর্থনৈতিক প্রগতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। প্রথম পরিকল্পনায় মোট ব্যয়ের ৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হইয়াছিল শিল্পখাতে ; দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ইহা বৃদ্ধি করিয়া ১৮ শতাংশেরও কিছু অধিক করা হয়।

(খ) প্রথম পরিকল্পনায় কর্মসংস্থানের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। অবশ্য, পরিকল্পনার শেষভাগে বেকার সমস্যা তীব্র আকার

† ১৯৫৮ সালের সংশোধিত ব্যয় বরাদ্দ।

ধারণ করায় অধিকতর কর্মসংস্থানের জন্য পরিকল্পনার কিছু রদবদল করা হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম হইতেই কর্মসংস্থানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিক শ্রমনিয়োগকারী কুটির ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পগুলির সম্প্রসারণ ও উন্নতির ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) প্রথম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় আয় বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধি ছাড়াও, আয়-বৈষম্য দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তির উপর সমাজতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করাও লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া :

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকালের শেষাংশে তৃতীয় পরিকল্পনা রচনার প্রস্তুতি পরিলক্ষিত হয়। ইহার খসড়া পরিকল্পনা কমিশন প্রকাশ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনার কার্যকালের মধ্যে জাতীয় আয় বার্ষিক শতকরা ৫ ভাগ বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আয়-বৈষম্য হ্রাস, অধিকতর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, মূল শিল্পগুলির সম্প্রসারণ এইগুলিও পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ ৭,৫০০ কোটি টাকা ধার্য করা হইয়াছে। বেসরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৪,০০০ কোটি টাকা। কৃষিখাতে মোট বিনিয়োগের শতকরা ৮·৬ ভাগ, শিল্পখাতে শতকরা ২০·৭ ভাগ, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায় শতকরা ২০ ভাগ এবং সমাজ সেবা খাতে শতকরা ১৭·২ ভাগ ধার্য করা হইয়াছে। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে দিনপ্রতি মাথাপিছু ১৮ আউন্স খাদ্যশস্য ও বাৎসরিক মাথাপিছু ১৭ গজ বস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। এই পরিকল্পনা গঠিত হইলে যন্ত্রপাতির বাৎসরিক উৎপাদনের মূল্য হইবে ৩০ কোটি টাকার মত।

তৃতীয় পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য যে অর্থবিনিয়োগ করার প্রয়োজন হইবে তাহা শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ উৎস হইতেই পাওয়া যাইবে না। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, প্রায় ২৬০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক সাহায্য এই পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজন হইবে।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the aims and objectives of India's Five-year plans.

(ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী বিবৃত কর।) (পৃঃ ১৫৭-১৫৯ দেখ)

2. Give a comparative estimate of the First and Second Five-year Plans.

(প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা কর।) (পৃঃ ১৬৪-১৬৫ দেখ)

3. Write a short note on the Third Five-year Plan.

(তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।) (পৃঃ ১৬৫ দেখ)

তৃতীয় খণ্ড

রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ও
পৌরনীতি

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মুখবন্ধ (Preface to Politics)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে একটি চিরন্তনী জিজ্ঞাসা আছেঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি ? রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যা ও ইহাকে কেন্দ্র করিয়া অন্য যে সমস্ত পরস্পরযুক্ত সমস্যার উদ্ভব ঘটে তাহার সচেতন আলোচনা এবং সমাধানের সম্ভাব্য পথ নির্দেশ করার প্রচেষ্টাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু। রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ অসম্পূর্ণ থাকে যদি সমস্যাগুলির প্রতি ছাত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ না থাকে। অপরিবর্তিত সমস্যার পরিবর্তনশীল সমাধানের সচেতন প্রচেষ্টা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে সমৃদ্ধ করে।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যা। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো ও এ্যারিস্টটল হইতে সুরু করিয়া ল্যাস্কী, বার্কার, ম্যাক্-আইভার প্রভৃতি আধুনিক লেখকেরা এই সমস্যার আলোচনা করিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় ও সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূলস্থত্র। এই নীতির ভিত্তিতে সরকারের রূপ ও কাঠামো গড়িয়া ওঠে। শাসক যদি শাসিতের দ্বারা নির্বাচিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে গণতান্ত্রিক শাসনের উদ্ভব ঘটে। আবার, যে ব্যবস্থায় শাসকের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ শাসিতকে নির্বিবাদে স্বীকার করিতে বাধ্য করা হয়, তাহাকে একনায়কতন্ত্র বলে। বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের নীতি নির্ধারিত হইয়াছে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও শাসন-ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ গণতান্ত্রিক ভাবধারার ভিত্তি। সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দর্শনে ক্ষমতার একত্রীকরণের নীতি প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি সার্বজনীন নীতি বা কোন একক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় না।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিবার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে। ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণের সঙ্গে মূল্যায়নের সমন্বয়ে এই পদ্ধতি গড়িয়া ওঠে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের একটি ইতিহাস আছে। রাষ্ট্রেরও অনুরূপ ঐতিহাসিক বিবর্তন

ঘটিয়াছে। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রকে বারংবার কতকগুলি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ণয় প্রাচীন এথেন্সে পেরিক্লিসের সম্মুখে যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছিল মূলতঃ বর্তমানেও রাষ্ট্রের কর্ণধারকে সেই সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। ইতিহাসের এই সমস্ত অভিজ্ঞতার আলোকে আধুনিক রাষ্ট্রবিষয়ক সমস্যাগুলিকে বিশ্লেষণ করিলেই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যথার্থ উপলব্ধি ঘটে। বর্তমানের পথপ্রদর্শক হিসাবেই অতীতের উপযোগিতা। তাই, ইতিহাসের বিশ্লেষণই কেবল মাত্র রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পদ্ধতি নয়। ঘটনাবলীর মূল্যায়নের মাধ্যমে সম্ভাব্য সমাধানের পথ নির্দেশও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম কর্তব্য।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the nature of Political Science.
   (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি আলোচনা কর।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র (The State)

রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, গঠন ও বৈশিষ্ট্য, নীতি ও আদর্শ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল বিষয়বস্তু। মানুষের জীবনের বিবিধ প্রয়োজনকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। মানুষ চায় জীবনের চরম বিকাশ, এবং ইহার জন্য প্রয়োজন সুশৃঙ্খল সমাজ-জীবন। রাষ্ট্র ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের মাধ্যমেই জীবন সার্থক ও পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। অ্যারিস্টটলের ভাষায়, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাত্রার সহায়তা সাধনই রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।

রাষ্ট্রের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হইতে হইবে। রাষ্ট্রের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—(১) জনসংখ্যা,

(২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার, (৪) সার্বভৌমিকতা এবং (৫) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।

জনসমষ্টি (Population): পূর্বেই বলা হইয়াছে যে জীবনের প্রয়োজন চরিতার্থ করিবার জন্যই রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং, জনসংখ্যা ব্যতীত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। জনসমষ্টির সংখ্যা কত হইবে এই সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট সূত্র নাই। প্রাচীনকালে রাষ্ট্র নগরকেন্দ্রিক ছিল এবং এই রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (direct democracy) প্রচলিত ছিল। ফলে রাষ্ট্রের জনসংখ্যা স্বল্প ছিল। কিন্তু বর্তমান রাষ্ট্রগুলিকে বৃহৎ জনসংখ্যার প্রতি আগ্রহশীল থাকিতে দেখা যায়, কারণ জনসংখ্যার উপর রাষ্ট্রের শক্তি, বিশেষতঃ সামরিক শক্তি, অনেকটা নির্ভরশীল।

নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Fixed Territory): কোন জনসমষ্টি যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে তখন তাহাদের মধ্যে সখ্যভাব সৃষ্টি হয়। এই সখ্যভাবই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তি। রাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যাযাবর জাতির বসবাস করিবার মত কোন নিদিষ্ট ভূখণ্ড নাই। এইজন্য তাহাদের পক্ষে রাষ্ট্র সংগঠন করা সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের আয়তন সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। আধুনিক পৃথিবীতে ভারতবর্ষের মত বৃহদায়তন রাষ্ট্র ও সিংহলের মত ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্র উভয়ই দেখা যায়।

ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রের কয়েকটি সুবিধা আছে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের নাগরিকদের পক্ষে সহজেই একত্রিত হইয়া সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে মত প্রকাশ করা সম্ভব হয়। সরকারের পক্ষেও জনসাধারণের সহিত নিবিড় যোগসূত্র রাখা এবং তাহাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে সচেতন থাকা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক লেখকগণ বৃহৎ রাষ্ট্রগঠনের পক্ষপাতী। কারণ, ছোট রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কম। দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হওয়া সহজ। রাষ্ট্রের আয়তন বৃহৎ হইলে নানাবিধ অর্থ নৈতিক সম্পদের প্রাচুর্য সেখানে দেখা যাইবার সম্ভাবনা থাকে।

জনসংখ্যার সহিত ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদের একটা সামঞ্জস্য থাকা উচিত। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অধিক হইলে অর্থ নৈতিক বিপর্যয় দেখা দিবে, এবং জনসমষ্টির তুলনায় সম্পদ বেশী হইলে জনাভাব হেতু প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হইবে না।

সরকার (Government) :

রাষ্ট্রগঠনের অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান হইল সরকার। জীবনের কয়েকটি মূল্যবান আদর্শকে চরিতার্থ করিবার জন্য মানুষ রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিয়াছে। সুশৃঙ্খল সমাজেই রাষ্ট্র গঠনের এই উদ্দেশ্য সার্থক হওয়া সম্ভব। নানাবিধ নির্দিষ্ট নিয়মকানুন বা আইনসৃষ্টির মাধ্যমে সরকার জনসমষ্টিকে সুসংবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করে। সাধারণ নীতি নির্ধারিত হয় সরকারের মাধ্যমে। সরকার হইল রাষ্ট্রের সাংগঠনিক রূপ। রাষ্ট্রের ভাব-ধারা ও আদর্শকে বাস্তব রূপ দেয় সরকার।

আধুনিক পৃথিবীতে সরকারের রূপ বিভিন্ন। একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র, যুক্তরাষ্ট্র ও এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার ও মন্ত্রিসভা-শাসিত সরকার প্রভৃতি নানাবিধ সরকারী ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে আজকাল চলিত আছে।

সার্বভৌম ক্ষমতা (Sovereignty) :

রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌম ক্ষমতা বলিতে আমরা বুঝি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যাহারা বসবাস করে এবং যে সমস্ত সংঘ বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত আছে, তাহাদের সকলের উপর রাষ্ট্রের চরম ও সীমাহীন ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্র যে কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারে। কেহ যদি এই আইন ভঙ্গ করে, তবে তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। সাধারণতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা কোন গণ-পরিষদ এই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সার্বভৌমিকতার অর্থ হইল যে রাষ্ট্র বিদেশী শাসন বা নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত থাকিবে। কোন দেশের উপর বিদেশী রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব থাকিলে তাহাকে রাষ্ট্র আখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি (International Recognition) :

সভ্যতার অগ্রগতির ফলে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারা শুধুমাত্র জাতীয় রাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক পৃথিবী পরস্পর নির্ভরশীল। বর্তমানে একটি রাষ্ট্রের পক্ষে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করা প্রয়োজন। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জ (United Nations) বিভিন্ন রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সংগঠন। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যপদের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃতি লাভ সম্ভব হয়। কম্যুনিস্ট চীন (সাম্যবাদী চীন প্রজাতন্ত্র) এখনও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হইতে পারে নাই। কারণ, জাতিপুঞ্জের অনেক সভ্য এখনও তাহাকে রাষ্ট্ররূপে স্বীকার করিতে চাহে না। সেজন্য অনেকে চীনা প্রজাতন্ত্রকে পূর্ণ রাষ্ট্ররূপে গণ্য করেন না।

উপসংহার :

বিখ্যাত মার্কিন রাজনীতিজ্ঞ গার্নারের (Garner) ভাষায়, রাষ্ট্র হইল বহুসংখ্যক লোকের সমষ্টি, যাহারা কোন এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত, এবং এমন একটি সংগঠিত সরকারের অধিকারী যাহার প্রতি এই জনসমষ্টির বৃহৎ অংশ স্বভাবতই আনুগত্য প্রদর্শন করে। ("The State is a community of persons more or less numerous, permanently occupying a definite portion of territory, independent, or nearly so, of external control, and possessing an organised government to which a great body of inhabitants render habitual obedience") অতএব গার্নারের সংজ্ঞা অনুসারে রাষ্ট্রের চারিটি বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়—(১) জনসমষ্টি, (২) নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, (৩) সরকার এবং (৪) সার্বভৌম ক্ষমতা। গার্নারের সংজ্ঞার সহিত আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত করিলে, রাষ্ট্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সুস্পষ্ট হইবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি রূপ বৈশিষ্ট্যটির মূল্য অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক চেতনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের এই উপাদানের মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে, এবং ভবিষ্যতে ইহাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক উপাদান হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

রাষ্ট্র ও যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহ (State and Units of Federation) :

যে রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়, তাহাকে যুক্তরাষ্ট্র (Federation) বলা হয়। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশসমূহকে রাষ্ট্র ('State') আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই অংশগুলির (যেমন পশ্চিমবঙ্গ, বিহার প্রভৃতি) জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড এবং সরকার আছে। কিন্তু রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপাদান সার্বভৌম ক্ষমতা। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলির কাহারও

এই ক্ষমতা নাই। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও নাই। সুতরাং, যুক্তরাষ্ট্রের অংশগুলিকে 'রাষ্ট্র' আখ্যা দেওয়া যায় না।

রাষ্ট্র ও সমাজ (State and Society) :

রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে মৌলিক ও সুস্পষ্ট সম্বন্ধ নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনুধাবন করার প্রথম ও প্রধান পথ। সুপ্রাচীন গ্রীক দর্শনে ও আধুনিক সাম্যবাদী দর্শনে রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য করা হয় নাই। ফলে প্রবল পরাক্রান্ত, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভব হয় এবং মানুষের সর্বাঙ্গীণ জীবনের উপর রাষ্ট্রের সমগ্র নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক চিন্তাধারায় সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য করা হয়। ফলে সমাজের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত, সীমিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

ঐতিহাসিক ধারায় ও দার্শনিক চিন্তায় সমাজ রাষ্ট্র অপেক্ষা ব্যাপকতর ও বৃহত্তর। মানুষ প্রথম সমাজের সৃষ্টি করে, এবং পরে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। চিন্তাধারায়ও সমাজ প্রথম ও প্রধান স্থান অধিকার করে। মানুষের জীবন বিচিত্র ও বহুমুখী। বিচিত্র জীবনের বিবিধ প্রয়োজনকে চরিতার্থ করিবার জন্য সমাজের উদ্ভব ঘটিয়াছে। এইজন্য সমাজে বহুবিধ প্রতিষ্ঠানের অবস্থান দেখা যায়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত প্রতিষ্ঠান, শ্রমিক সংস্থা এবং রাষ্ট্র সবই সমাজের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানুষের জীবনের একটি প্রয়োজনকে অর্থাৎ রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজন, সার্থক করিবার জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সমাজের রূপ সামগ্রিক, রাষ্ট্রের রূপ আংশিক। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের উপর সমাজের নিয়ন্ত্রণ স্বীকৃত। কারণ, সমগ্র সমাজের রাষ্ট্র একটি অংশমাত্র। এইজন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র সর্বদা সমাজের নিয়ন্ত্রণাধীন। মানুষের সমগ্র জীবনের উপর রাষ্ট্রের সর্বাঙ্গীণ নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করা হয় না। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রধানতঃ শক্তি। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় আইন মান্য করান হয়। কিন্তু সমাজ কাজ করে সহযোগিতা ও শুভেচ্ছার দ্বারা। সামাজিক বিধি-নিয়ম আমরা মান্য করি, কারণ তাহা না করিলে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে সমাজ-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে।

যদিও সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে, তথাপি রাষ্ট্রের মাধ্যমেই সমাজের আইনগত কাঠামো সৃষ্টি হয়। সামাজিক সংহতি ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের জন্য মানুষের নাগরিক আচরণের নির্দেশ দেয় রাষ্ট্র।

রাষ্ট্র ও সরকার (State and Government) :

সরকার রাষ্ট্রের একটি অংশ। অংশ কখনও সমগ্রের সমান হয় না। সুতরাং রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে।

প্রথমতঃ, সরকার রাষ্ট্রের কর্মময় রূপ। রাষ্ট্রের আদর্শ ও নীতিকে বাস্তব রূপ দিবার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য যে সরকারী ক্ষমতার প্রয়োজন হয় তাহা রাষ্ট্র হইতে গৃহীত। রাষ্ট্রের ক্ষমতা মৌলিক ; সরকার রাষ্ট্র-প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে।

দ্বিতীয়তঃ, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্র একটি ধারণা। সরকার ইহার বাস্তব রূপ। সুতরাং, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাগরিকের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। রাষ্ট্রের পরিচালক, অর্থাৎ সরকারের বিরুদ্ধে নাগরিকের অভিযোগ থাকিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, সমগ্র জনসমষ্টি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। এই জনসংখ্যার একটি অংশমাত্র সরকার গঠন করে। যেমন, বর্তমান ভারতীয় সরকার কংগ্রেস সমর্থকদের অর্থাৎ ভারতীয় বৃহৎ জনসমষ্টির একটি অংশের দ্বারা গঠিত। কিন্তু সমগ্র জনসাধারণকে লইয়াই ভারতীয় রাষ্ট্র সংগঠিত।

সর্বশেষে, সরকার অস্থায়ী, কিন্তু রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। ভারতবর্ষে বর্তমানে কংগ্রেস সরকার বিদ্যমান, কিন্তু আগামী নির্বাচনে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল বা সাম্যবাদী দল সরকার গঠন করিতে পারে। কিন্তু সরকারের এই পরিবর্তনের দ্বারা রাষ্ট্রের কোন পরিবর্তন সাধিত হইবে না।

ধারণা ও সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাষ্ট্রই মৌলিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের ভাবধারার বাহনরূপে সরকারের উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং, জনসাধারণের অভিযোগ সরকারের বিরুদ্ধে থাকিতে পারে ; কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে, প্রকৃতপক্ষে, কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না।

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘ (State and other Associations) :

মানুষের জীবনের বিবিধ প্রয়োজনকে রূপায়িত করিবার জন্য সমাজ-ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। এক একটি প্রয়োজনকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সামাজিক সংঘ গড়িয়া উঠিয়াছে। সমাজ বিভিন্ন সংঘের সমষ্টি। কোন এক সাধারণ উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিবার জন্য যখন বিভিন্ন ব্যক্তি একত্রিত ও সংগঠিত হয় তখন সংঘের সৃষ্টি হয়। সুতরাং, কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের

ভিত্তিতে সংঘ সংগঠিত হয়। রাষ্ট্রও একটি সংঘ। মানুষের জীবনের প্রয়োজনকে চরিতার্থ করিবার জন্য ঐতিহাসিক ধারায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইয়াছে। রাষ্ট্র ও সংঘ উভয়েরই উদ্দেশ্য হইল মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়তা করা। এই মিল থাকা সত্ত্বেও রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংঘের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ঃ

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সদস্যপদ বাধ্যতামূলক, কিন্তু সংঘের সদস্যপদ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত। একজন ব্যক্তিকে কোন না কোন রাষ্ট্রের সদস্য হইতেই হইবে। কিন্তু সে ব্যক্তি কোন সংঘের সদস্য নাও হইতে পারে। কোন সংঘের সদস্য হওয়া বা সদস্যপদ পরিত্যাগ করা উভয়ই ব্যক্তির স্বেচ্ছাধীন।

দ্বিতীয়তঃ, একসঙ্গে একাধিক সংঘের সদস্য হওয়া সম্ভব, কিন্তু একসঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সদস্য হওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সীমানা একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সংঘের কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। কয়েকটি সংঘ আছে যাহার সদস্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকেরা। যেমন, আন্তর্জাতিক রেডক্রস সোসাইটি পৃথিবীর প্রায় সমস্ত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের লইয়া সংগঠিত। অতএব, এই সব সংঘের কার্য পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত।

চতুর্থতঃ, প্রত্যেক সংঘের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে। ফলে, সংঘ শুধুমাত্র এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলীই সম্পাদন করে। যেমন, শ্রমিক সংঘের (Trade Union) উদ্দেশ্য হইল শুধুমাত্র শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করা। ধর্ম বা শিক্ষা লইয়া এই সংঘ ব্যস্ত থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য বিবিধ, এবং ফলে রাষ্ট্রকে বহুবিধ কার্য সম্পাদন করিতে হয়। রাষ্ট্রকে যেমন আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হয়, তেমনি ইহাকে হাসপাতাল বা শিক্ষালয়ও প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। নাগরিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য রাষ্ট্রকেই দায়ী থাকিতে হয়। ফলে, রাষ্ট্রের কার্যের পরিধি সুবিশাল।

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু আভ্যন্তরীণ মতবিরোধ বা কলহ বা অন্য কোন কারণে বিভিন্ন সংঘের বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। নির্বাচন বা গৃহযুদ্ধের ফলে সরকারের পরিবর্তন ঘটিলেও রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অপরিবর্তিত থাকে।

ষষ্ঠতঃ, রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মৌলিক পার্থক্য হইল যে, রাষ্ট্র সার্বভৌম কিন্তু সংঘগুলি নয়। সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য। ফলে,

রাষ্ট্র তাহার সদস্যদের উপর বলপ্রয়োগ করিতে পারে। রাষ্ট্রের নির্দেশ অমান্য করিলে শাস্তিভোগ করিতে হয়। কিন্তু কোন সংঘের পক্ষে সদস্যদের উপর এইরূপ বলপ্রয়োগ করা সম্ভব নয়। সংঘের নির্দেশ মান্য করা বা না করা সদস্যদের স্বেচ্ছাধীন।

সপ্তমতঃ, রাষ্ট্র বিভিন্ন সংঘের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কোন সংঘ জনস্বার্থবিরোধী কার্য করে তাহা হইলে রাষ্ট্র ইহার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। একাধিক সংঘের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে মীমাংসার দায়িত্ব গ্রহণ করে রাষ্ট্র।

স্থতরাং দেখা যায় যে মূলগত ঐক্য সত্ত্বেও গঠন, সীমানা, কার্যাবলী ও স্বরূপের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংঘের মধ্যে পার্থক্য আছে।

প্রশ্নাবলী

1. What are the essential characteristics of a State?

(রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি?) (পৃঃ ১৬৯-১৭২ দেখ)

2. Define State and point out its characteristics. Is the 'State' of West Bengal a State?

(রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্ণয় কর এবং ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কি রাষ্ট্র?)

(পৃঃ ১৬৮-১৭২ ও ১৭২-১৭৩ দেখ)

3. Distinguish between 'State' and 'Government'.

(রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।) (পৃঃ ১৭৪ দেখ)

4. Distinguish between 'State' and 'Associations'.

(রাষ্ট্র ও সংঘের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর।) (পৃঃ ১৭৪-১৭৬ দেখ)

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্র উৎপত্তির মতবাদ

(Theories of the origin of State)

রাষ্ট্রব্যবস্থার উৎপত্তির আখ্যান এখনও রহস্যাবৃত। এই রহস্যের উদ্‌ঘাটনে বিভিন্ন দার্শনিক বিভিন্ন যুগে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন,

এবং তজ্জন্য তাঁহাদের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন রাষ্ট্র উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদে দেখা যায়। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় কয়েকটি মতবাদের উদ্ভব ঘটিয়াছে। সুতরাং, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাদের বিশ্লেষণ বাঞ্ছনীয়। আবার, কয়েকটি মতবাদ প্রধানতঃ কল্পনাপ্রসূত (speculative)। ইহাদের কোন সুদৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Theory of Social Contract) :

সামাজিক চুক্তি মতবাদ প্রধানতঃ কল্পনাপ্রসূত। এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে মানুষ যেখানে বাস করিত, তাহার নাম দেওয়া হইয়াছে—"প্রকৃতির রাজ্য" (State of Nature)। নানা কারণে মানুষ প্রকৃতির রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিল। এই মতবাদের প্রধান সমর্থক ছিলেন ইংরেজ লেখকদ্বয় হব্‌স্ (Hobbes) ও লক্ (Locke) এবং ফরাসী দার্শনিক রুশো (Rousseau)। প্রকৃতির রাজ্যের রূপ সম্পর্কে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। এই তিনজন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকায় তাঁহাদের সিদ্ধান্তও বিভিন্ন হইয়াছে।

হব্‌স্ ছিলেন ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের গৃহশিক্ষক। আইনগত সার্বভৌমের সমর্থন এবং গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করা হব্‌সের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীতে, হব্‌সের জীবিতকালে ইংল্যাণ্ডে যে গৃহবিপ্লব (civil war) হইয়াছিল তাহার প্রভাব হব্‌সের চিন্তাধারায় দেখা যায়। তাঁহার বিখ্যাত লেভিয়াথান (Leviathan) গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়। হব্‌সের মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল 'নির্জন, দরিদ্র, ঘৃণ্য, পাশবিক ও অনিশ্চিত' ("solitary, poor, nasty, brutish, short")। এই অবস্থায় জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিল না। নিরাপত্তা লাভের জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যে চুক্তি করিয়া সার্বভৌম শক্তিকে প্রতিষ্ঠা করিল। সার্বভৌম শক্তি রহিল চুক্তির উর্ধ্বে। কারণ, সার্বভৌম চুক্তিতে অংশ গ্রহণ করেন নাই। অতএব তাঁহাকে অপসারিত করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, হব্‌সের মতে সর্বসাধারণ সার্বভৌম শক্তির হস্তে সমস্ত অধিকার

ও ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছে। সুতরাং এই শক্তির ক্ষমতা সীমাহীন। অতএব হব্‌স স্বৈরতন্ত্রের ভক্ত ছিলেন। ম্যাক্‌আইভারের (Maciver) মতে নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার মধ্যে হব্‌স্ নিরাপত্তাকে বরণ করিয়াছিলেন।

১৬৮৮ সালে ইংল্যাণ্ডে দ্বিতীয় জেম্‌সের স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে যে গণ-অভ্যুত্থান হইয়াছিল তাহার সমর্থনে লক্ তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। জনসম্মতির ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (constitutional monarchy) প্রতিষ্ঠা করাই লকের মতবাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। লকের মতে প্রকৃতির রাজ্যে ছিল শান্তি ও যুক্তি। কিন্তু প্রাকৃতিক আইনকে ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন নিরপেক্ষ বিচারসভা ছিল না এবং অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য কোন শাসন-কর্তৃপক্ষ ছিল না। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মানুষ প্রথমে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল এবং পরে শাসকের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া জনসাধারণ সরকার প্রতিষ্ঠা করিল। সরকার চুক্তিতে অংশগ্রহণকারী। সুতরাং সরকার চুক্তির সর্ত মানিতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, প্রাকৃতিক আইন অনুসারে আইন প্রণয়ন করা, আইনের ব্যাখ্যা করা ও আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া সরকারের কাজ। জীবনের অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার ও সম্পত্তির অধিকার জনসাধারণ নিজেদের হস্তে রাখিয়া দিল। লকের মতে সার্বভৌম শক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; সরকার যদি চুক্তির সর্ত ভঙ্গ করে, তাহা হইলে সরকারকে অপসারিত করিবার অধিকার জনসাধারণের আছে। সুতরাং লক্ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক রুশো জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সুইজারল্যাণ্ডে এবং দার্শনিক মতবাদ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন ফরাসী দেশে। তাঁহার মতবাদ প্রচারের কোন রাষ্ট্রনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু তাঁহার ভাবধারা ফরাসী বিপ্লবকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। রুশো ছিলেন সেই গণ-জাগরণের মন্ত্রঋষি। রুশোর মতে প্রকৃতির রাজ্য ছিল ভূস্বর্গতুল্য। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথা সৃষ্টি হওয়ার ফলে মানুষ হইল স্বার্থপর। সে নিজের সম্পত্তি ও পরের সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য করিতে শিখিল। প্রকৃতির রাজ্যে আসিল বিরোধ ও সংঘাত। মানুষ নিরাপত্তা হারাইল। এই অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য মানুষ চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিল। প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছা ও স্বার্থ 'সাধারণ ইচ্ছা'য় (General

will) সন্নিবিষ্ট। রাষ্ট্রই হইল 'সাধারণ ইচ্ছা'র ধারক। রুশোর মতে 'সাধারণ ইচ্ছা' ন্যায্য, যুক্তিসঙ্গত ও পক্ষপাতশূন্য। জনগণ মিলিতভাবে রাষ্ট্রের মাধ্যমে এই ইচ্ছা প্রকাশ করে। তাই সকলেই 'সাধারণ ইচ্ছা' মানিতে বাধ্য। সুতরাং রাষ্ট্রের ক্ষমতা সীমাহীন এবং রাষ্ট্রের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, 'সাধারণ ইচ্ছা' প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়। প্রতিনিধিমূলক আইন সভার নির্বাচন ব্যবস্থা চালু রাখিলে রুশোর মতে সাধারণ ইচ্ছাশক্তি প্রকাশিত হয় না। শুধু জনগণের মিলিত অধিবেশনে আইনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয়, সমাজ সচেতন, কল্যাণকামী নির্দেশই সাধারণ ইচ্ছার প্রতীক।

সমালোচনা :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক চুক্তিমতবাদ চিন্তাজগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু পরে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে এই মতের সমালোচনা করা হইয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক দর্শনে এই মতবাদের কোন গুরুত্ব নাই।

প্রথমতঃ, এই মতের ঐতিহাসিক অসত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। ইতিহাসের কোথাও আমরা এমন কোন দৃষ্টান্ত পাই না যেখানে রাষ্ট্র চুক্তির দ্বারা সৃষ্টি হইয়াছে। মানুষ কোনদিনই প্রকৃতির রাজ্যে বাস করে নাই। রাষ্ট্র একটি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠান এবং ইহা গড়িয়া উঠিয়াছে মানুষের জীবনের প্রয়োজনকে চরিতার্থ করিবার জন্য।

দ্বিতীয়তঃ, চুক্তিতে অংশ গ্রহণকারী এক পক্ষের মৃত্যুর পর চুক্তি বাতিল হইয়া যায়। সুতরাং চুক্তিতে অংশ গ্রহণকারীদের বংশধরদের উপর চুক্তির কোন আইনসঙ্গত বন্ধন থাকিতে পারে না। অতএব, সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্র সৃষ্টি হইলেও এই চুক্তির বন্ধন চিরস্থায়ী হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ প্রচার করে যে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের কয়েকটি স্বাভাবিক অধিকার ছিল। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে কোন অধিকার থাকিতে পারে না। অধিকার রক্ষার জন্য আইনের প্রয়োজন। আইনের জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রের। অতএব, রাষ্ট্রবিহীন স্বাধীনতার অস্তিত্ব কাল্পনিক।

চতুর্থতঃ, এই মতবাদ বিশৃংখলাকে প্রশ্রয় দেয়। কোন সময় আমাদের

যদি ধারণা হয় যে রাষ্ট্র চুক্তির সর্ত মান্য করিতেছে না তাহা হইলে আমরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারি।

তথাপি, সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন নহে। ইহা প্রচার করে যে, জনসাধারণের সম্মতি সরকারী ব্যবস্থার ভিত্তি এবং গণতান্ত্রিক মতবাদে এই দৃষ্টিভঙ্গী প্রধান। গণতন্ত্রের প্রসারে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাধারায় এই মতবাদের ভূমিকা বিশেষ না থাকা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে রাষ্ট্র-উৎপত্তির তত্ত্ব ছাড়াও মতবাদটি শাসক-শাসিতের সম্পর্ক নির্ধারণের মৌলিক সমস্যাটির অবতারণা ও আলোচনা করিয়াছে।

বলপ্রয়োগে রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মতবাদ (Theory of Force) :

এই মতবাদ অনুসারে বলা হয় যে, বলপ্রয়োগের দ্বারা রাষ্ট্রের উদ্ভব হইয়াছে। যখন কোন শক্তিশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন দুর্বল ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বলপ্রয়োগের দ্বারা পরাজিত ও বশীভূত করিয়া একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিল তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি হইল। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর আভ্যন্তরীণ শান্তি ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষা করার প্রয়োজন হইল। কেবল বলপ্রয়োগের মাধ্যমেই শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা সম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটিয়াছে বলপ্রয়োগের দ্বারা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে শক্তিপ্রয়োগের উপর।

কয়েকজন জার্মান লেখক এই মতবাদের উগ্র সমর্থক ছিলেন। একজন লেখকের মতে ন্যায় ও অন্যায়ের দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয় যুদ্ধের দ্বারা ("The dispute as to what is right is decided by the arbitrament of war"—Bernhardt)। আর একজন জার্মান লেখকের মতে যুদ্ধ দেশপ্রীতি ও জাতীয় আদর্শবাদকে সুদৃঢ় করে। দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্বে জার্মানী ও ইটালির একচ্ছত্র শাসক (Dictator) ছিলেন যথাক্রমে হিটলার ও মুসোলিনী। তাঁহাদের যুদ্ধবাদী নীতির মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর নগ্ন প্রকাশ দেখা যায়।

সমালোচনা :

এই মতবাদের কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আদিম যুগে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে বলপ্রয়োগ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। সমাজ-ব্যবস্থার শৈশবকালে শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে আদিম মানুষকে আইন-

কানুন মান্য করিতে বাধ্য করা হইত। কিন্তু রাষ্ট্রসৃষ্টির বিভিন্ন প্রয়োজনীয় উপাদানের মধ্যে কেবল একটি উপাদান হইল বলপ্রয়োগ। একটি উপাদানকে একমাত্র উপাদানে পরিণত করিবার চেষ্টা এই মতবাদের প্রধান ত্রুটি (The theory of force "errs in magnifying what has been only one factor in the evolution of society into the sole controlling force" – Leacock)। দ্বিতীয়তঃ, গ্রীণ (Green) সত্যই বলিয়াছেন যে, রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি সর্বসাধারণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়। শান্তিশৃংখলা রক্ষার জন্য শক্তিপ্রয়োগের প্রয়োজন আছে। কিন্তু আধুনিক সমাজ-শাস্ত্রবিদ্ ম্যাকআইভার বলেন যে শক্তিপ্রয়োগ সাধারণ ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল না হইলে রাষ্ট্র ভাঙ্গিয়া যাইবে। তৃতীয়তঃ, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভায় ও অন্যান্য সমিতিতে আলোচনার দ্বারাই জনসাধারণ একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শক্তিপ্রয়োগের দ্বারা কোন কিছু জনগণের উপর চাপাইয়া দেওয়া গণতন্ত্রবিরুদ্ধ। চতুর্থতঃ, এই মতবাদ বিশ্ব-শান্তির প্রধান অন্তরায়। যদি যুদ্ধ দ্বারা আন্তর্জাতিক বিরোধের মীমাংসা করা হয়, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি কোনদিনই অব্যাহত থাকিতে পারে না।

ঐশ্বরিক মতবাদ (Theory of Divine origin) :

এই মতবাদ অনুসারে রাষ্ট্র ভগবানের দ্বারা সৃষ্ট। প্রাচীনকালে ধারণা করা হইত যে, শাসক ভগবানের দ্বারা নিযুক্ত প্রতিনিধি এবং তাঁহার কাজের জন্য একমাত্র ভগবানের নিকট দায়ী। শাসকের ক্ষমতা ও আদেশ অমান্য করার অর্থ ভগবানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা। অতএব শাসকের ক্ষমতা সীমাহীন এবং জনসাধারণ শাসকের নির্দেশ মান্য করিতে বাধ্য।

মধ্যযুগে এই মতবাদের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজারা এই মতবাদের পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের মতে, রাজা ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি ("Kings are the breathing images of God upon earth") এবং প্রজা বা কোন মানবিক প্রতিষ্ঠান (যেমন আদালত) রাজার বিচার করিবে না। সামাজিক চুক্তি মতবাদের অভ্যুদয় ও গণতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই মতবাদের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছে।

সমালোচনা :

আধুনিক লেখকদের মতে, রাষ্ট্র মানুষের সামাজিক প্রয়োজন

মিটাইবার জন্য মানুষের সৃষ্ট একটি প্রতিষ্ঠান। তাই আধুনিক চিন্তাধারায় ঐশ্বরিক মতবাদের কোন স্থান নাই। এই মতবাদ শাসকের স্বৈরাচারকে প্রশ্রয় দেয়। ভগবানের নিকট দায়ী থাকার অর্থ বাস্তব জগতে কাহারও নিকট দায়ী না থাকা। অর্থাৎ জনসাধারণের নিকট কোন দায়িত্ব না থাকায় শাসক স্বেচ্ছাচারী হন? দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ গণতন্ত্র-বিরোধী। জনসাধারণের নিকট শাসকের সম্পূর্ণ দায়িত্ব প্রতিষ্ঠা গণতন্ত্রের মূল কথা। জনসাধারণের সম্মতিই গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি।

কিন্তু এই মতবাদের কিছুটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে। আদিম মানুষের মধ্যে যখন শৃংখলাবোধ জাগে নাই, তখন ধর্মই তাহাকে রাষ্ট্রীয় শাসন মান্য করিতে শিখাইয়াছিল। রাষ্ট্রের অনুশাসন মান্য করা ধর্মীয় কর্তব্য বলিয়া গণ্য করা হইত। রাষ্ট্রীয় আইন ভগবানের সৃষ্টি এই ধারণা সঞ্চারিত করিয়া এই মতবাদ আদিম মানুষকে আইন মান্য করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিল।

ঐতিহাসিক বা বিবর্তনমূলক মতবাদ (Historical or Evolutionary theory):

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া দেখা যায় যে, রাষ্ট্র ভগবানের সৃষ্টি নয়, বলপ্রয়োগের দ্বারাও ইহার সৃষ্টি হয় নাই বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেও রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে নাই। রাষ্ট্র ঐতিহাসিক বিবর্তনের (evolution) ফল। বিবর্তন বলিতে অতি ধীরে ধীরে যে রূপান্তর ঘটে, তাহাকে বুঝায়। রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন কোন বিশেষ সময়ে বা বিশেষ কারণে হয় নাই। মানব সমাজ ঐতিহাসিক ধারায় ক্রমাগত রূপান্তরিত হইতে হইতে অবশেষে যখন একটি পরিণত, সার্বজনীন প্রতিষ্ঠানের রূপ ধারণ করিল তখন রাষ্ট্রব্যবস্থার সৃষ্টি হইল।

যে সমস্ত প্রধান উপাদান রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে তাহারা হইল রক্তের সম্বন্ধ, ধর্ম, যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা।

রক্তের সম্বন্ধ (Kinship):

প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় রক্তের সম্বন্ধই ছিল প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় বন্ধন। সুনির্দিষ্ট পারিবারিক নিয়ম-শৃংখলার মধ্যেই সরকারের সূত্রপাত ঘটে। সার্বভৌম শক্তির আদেশ প্রদান করা ও প্রজাদের সেই আদেশ মান্য

করার মধ্যেই রাষ্ট্রের সূচনা নিহিত। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য সর্বপ্রথম দেখা যায় পরিবারের মধ্যে। পরিবারে বয়োজ্যেষ্ঠরা আদেশ করিতেন ও বয়ঃকনিষ্ঠরা আদেশ মানিত। এইভাবে আদিম মানুষ শাসন মান্য করিতে শিখিল।

ধর্ম (Religion) :

যৌথ উপাসনা বিচ্ছিন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া শাসকের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করিয়াছিল। প্রাচীন কালে ধর্মের দুইটি রূপ দেখা যায়—প্রকৃতির উপাসনা ও পূর্বপুরুষদের উপাসনা। বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে আদিম মানুষ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কল্পনা করিত। ক্রমে রাজা ভগবানের প্রতিনিধি এবং রাজার শাসনের বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ ভগবানের আদেশ অমান্য করা—এই ধারণা আদিম মানুষকে সার্বভৌম শক্তির নির্দেশ মান্য করিতে বাধ্য করিয়াছিল।

যুদ্ধ (War) :

গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় সর্বদাই দেখা যাইত। অনবরত যুদ্ধের ফলে যুদ্ধ পরিচালনার জন্য স্থায়ী নেতৃত্বের উদ্ভব হইল। এই স্থায়ী নেতাই পরবর্তীকালে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইলেন ও রাজার উপাধি গ্রহণ করিলেন।

রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (Political Consciousness) :

অ্যারিস্টটল বলিয়াছেন, মানুষ স্বভাবত রাষ্ট্রনৈতিক জীব। কিন্তু সমাজ ব্যবস্থার প্রথম দিকে তাহার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা ছিল সুপ্ত। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রথার সৃষ্টির ফলে এই সুপ্ত চেতনার সক্রিয় প্রকাশ সম্ভব হইল। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমাজে বিশৃংখলা প্রকট হইল। ব্যক্তিগত সম্পত্তিপ্রথার উদ্ভবের ফলে পরের আক্রমণ হইতে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার প্রয়োজন মানুষ উপলব্ধি করিল। এই সব প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ একটি রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন গড়িবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল। এই রাষ্ট্রনৈতিক চেতনাই রাষ্ট্রগঠনের মৌলিক উপাদান।

সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়াপত্তনে বিভিন্ন উপাদান সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। রাষ্ট্র কোন এক বিশেষ সময়ে বা কোন এক বিশেষ কারণে সৃষ্ট হয় নাই। ইহা ঐতিহাসিক ধারার পরিণত ফল। সুতরাং ঐতিহাসিক মতবাদ রাষ্ট্রের ক্রমবিকাশের ধারার সঠিক বিশ্লেষণ করিয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a brief account of the theory of social contract as an explanation of the origin of the State.

(সামাজিক চুক্তি মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও)। (পৃঃ ১৭৪-১৮০ দেখ)

2. Discuss critically the social contract theory of the origin of the State.

(সামাজিক চুক্তি মতবাদটির আলোচনা কর)। (পৃঃ ১৭৮-১৮১ দেখ)

3. Write a note on the theory of evolution as an explanation of the origin of the State.

(রাষ্ট্র-উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে ঐতিহাসিক মতবাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও)। (পৃঃ ১৮৩-১৮৪ দেখ)

4. "The State is the result of brute force". Discuss the validity of the statement.

("রাষ্ট্র পাশবিক শক্তির ফল"—এই উক্তির সত্যতা নির্ণয় কর)। (পৃঃ ১৮১-১৮২ দেখ)

5. "The State is neither a divine institution nor a deliberate human contrivance : it has come into existence as the result of natural evolution." Discuss the statement.

("রাষ্ট্র ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান নয়, মানুষ পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইহা সৃষ্টি করে নাই; ইহা স্বাভাবিক বিবর্তনের ফল"—এই বিবৃতির আলোচনা কর)। (পৃঃ ১৮৩-১৮৪ দেখ)

চতুর্থ অধ্যায়

জাতি ও জাতীয় জনসমষ্টি
(Nation and Nationality)

জাতি (Nation) ঃ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 'জাতি' শব্দটির প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে লেখকদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। বার্জেস (Burgess) বলেন যে, যে জনসমষ্টির মধ্যে বংশগত ঐক্য বা রক্তের ঐক্য দেখা যায় তাহাকেই 'জাতি' আখ্যা দেওয়া উচিত (a population of an ethnic unity)। একই বংশোদ্ভব লোক-গোষ্ঠীকে জাতি বলে। কিন্তু বর্তমানে এই মতের বিশেষ কোন মূল্য নাই। আধুনিক

জাতিসমূহ গভীরভাবে সংমিশ্রিত ("notoriously of very mixed race" —Sidgwick)। সুইজারল্যাণ্ডের জনসমাজ একটি স্বতন্ত্র জাতি, কিন্তু তাহারা একই বংশোদ্ভূত নয়। জাতি বলিতে আমরা সেই জনসমাজকে বুঝি যাহা রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিতে সংগঠিত। (জাতি = জাতীয় জনসমষ্টি + রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠন।) কোন জাতীয় জনসমাজ যখন রাষ্ট্র সৃষ্টি বা রাষ্ট্র সৃষ্টির সুতীব্র ইচ্ছার মাধ্যমে নিজেদের সুসংগঠিত করে, তখন সেই জনসমাজ জাতিতে পরিণত হয়।

জাতীয় জনসমষ্টি (Nationality) ঃ

জাতীয় জনসমষ্টি বলিতে আমরা সেই জনসমাজকে বুঝি যাহা অন্যান্য জনসমাজ হইতে নিজেকে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী বলিয়া মনে করে। লর্ড ব্রাইস্ (Lord Bryce) বলেন যে জাতীয় জনসমষ্টি ভাষা ও সাহিত্য, ভাবধারা, প্রথা এবং ঐতিহ্যের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এমন একটি লোকগোষ্ঠী যাহা অন্যান্য অনুরূপ জনসমষ্টি হইতে নিজেকে পৃথক মনে করে ("a nationality is a population held together by certain ties, as for example, language and literature, ideas, customs and traditions in such a way as to feel itself a coherent unity distinct from other populations similarly held together by like ties of their own")। সমচেতনা এবং সমভাব বা ঐক্যবোধই জাতীয় জনসমষ্টির প্রাণস্বরূপ।

জাতীয় জনসমাজের উপাদান (Elements of Nationality) ঃ

এই সমভাব সৃষ্টি করিতে বিভিন্ন উপাদান সাহায্য করিয়াছে। ভাষার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, ভৌগোলিক ঐক্য এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্যই জাতীয় জনসমষ্টি গঠনের প্রধান উপাদান। ভাষা হইল ভাবের বাহন। একই ভাষাভাষী লোকেরা একই ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়, এবং ইহাতে সমভাব সৃষ্টি সহজ হয়। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডে তিনটি ভাষা (ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়) প্রচলিত। অথচ, সেখানকার অধিবাসীরা ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও একই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ। ভাষার ঐক্য জাতিগঠনে মূল্যবান, কিন্তু অপরিহার্য উপাদান নয়। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ফলে আজকাল জাতীয়

ভাবসৃষ্টিতে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয় ভূমিকা স্বীকার করা হয় না। ভৌগোলিক ঐক্য জাতি গঠনের উল্লেখযোগ্য উপাদান হইলেও ইহা অপরিহার্য নয়। ইস্রাইল (Israel) রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে ইহুদীরা পৃথিবীর বিভিন্ন ভূখণ্ডে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বসবাস করিত, কিন্তু তাহারা সকলেই একই জাতীয় ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিল। ইতিহাসের ঐক্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য জাতি গঠনের বিশেষ মূল্যবান উপাদান। সংঘবদ্ধভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের, দুঃখ বরণের বা সাফল্যের স্মৃতি স্থানীয় জনসমষ্টির মধ্যে জাতীয়ভাবের সৃষ্টি করে। অর্থ নৈতিক স্বার্থের ঐক্য এই জাতীয়ভাবকে সুদৃঢ় করে।

উদাহরণ স্বরূপ, আমরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসের উল্লেখ করিতে পারি। সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনের অত্যাচার ও অর্থনৈতিক শোষণ ভারতবাসীরা সমভাবে ভোগ করিয়াছিল। এই দুঃখকষ্ট সমভাবে ভোগ করার জন্য ভারতীয়দের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহানুভূতি দেখা দিল। পরশাসনমুক্ত হইবার জন্য তাহারা সংঘবদ্ধভাবে সংগ্রাম করিল। এই যৌথ দুঃখবরণ ও সংগ্রাম ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ভারতীয়দের একই জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত করিল। এইভাবে ভারতবর্ষে জাতীয় জনসমষ্টির জন্ম হইল। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ যখন বিদেশী শাসনমুক্ত হইল এবং সার্বভৌম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিল তখন এই জাতীয় জনসমাজ জাতিতে পরিণত হইল।

জাতীয়ভাবের সাংগঠনিক রূপঃ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right of Self-determination or "One Nation, One State" principle) :

বিভিন্ন জাতীয় লোকের সংমিশ্রণে যে রাষ্ট্র সমাজ গড়িয়া ওঠে তাহা হইল অস্বাভাবিক মিলনের ফল। প্রত্যেক জাতীয় জনসমষ্টির ভাবধারা, সমস্যা ও স্বার্থ স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের নিজের রাষ্ট্রনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করার স্বাভাবিক অধিকার থাকা উচিত। অর্থাৎ প্রত্যেক জাতীয় জনসমষ্টির পৃথক রাষ্ট্র গড়িয়া তোলার অধিকার থাকা উচিত। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি উইলসন (Wilson) আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের একজন প্রধান সমর্থক ছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধকালে তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় এই মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার মতে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার

এমন একটি মূল্যবান নীতি যাহা রাষ্ট্রনৈতিক নেতাদের পক্ষে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হইলে অসন্তোষ ও যুদ্ধ কখনই অবলুপ্ত হইবে না।

এই মতবাদের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তি দেখান হয়। প্রথমতঃ, বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টির আচার-ব্যবহারে অনেক সময় তীব্র পার্থক্য থাকায় একাধিক জাতীয় জনসমষ্টির দ্বারা সংগঠিত রাষ্ট্রে সমভাবের অভাব দেখা যায়। ইংরেজ লেখক মিল (Mill) বলেন যে, কোন লোকগোষ্ঠীর মধ্যে যদি সমভাবের অভাব দেখা যায়, বিশেষতঃ যদি তাহারা ভিন্ন-ভাষাভাষী হয়, তাহা হইলে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য যে জনমতের প্রয়োজন, তাহা তাহারা গঠন করিতে পারে না। মিলের মতে, বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টির দ্বারা সংগঠিত রাষ্ট্রে তাই গণতন্ত্র কার্যকরী হয় না। দ্বিতীয়তঃ, একজাতীয় রাষ্ট্র (Mono-national State) হইলে স্বভাবতঃই, রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণের আনুগত্য স্বতঃস্ফূর্ত ও সহজ হয়। কারণ, এইরূপ রাষ্ট্রব্যবস্থায় জাতীয় চরিত্রের প্রতিফলন আইনের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।

তৃতীয়তঃ, বহু জাতীয় জনসমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্রে (Poly-national State) কোন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টির আচার-ব্যবহার ও স্বার্থের পার্থক্য থাকায় তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ ও অসন্তোষ দেখা যায়। ফলে, রাষ্ট্রের নানাবিধ উন্নতি ব্যাহত হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির প্রয়োগের মাধ্যমে সমস্ত জাতির আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে এবং বৈরীভাবের পরিসমাপ্তি ঘটিবে।

কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা সর্বত্র স্বীকার করা যায় না। সুইজারল্যাণ্ডে ভিন্ন ভাষাভাষী লোক বসবাস করে। কিন্তু সেখানে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সফলভাবে কার্যকরী হইয়াছে। সংঘবদ্ধ সচেতন জনমতের প্রস্তুতি এবং গণতন্ত্রের সার্থকতা প্রধানতঃ নির্ভর করে নাগরিকদের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার উপর।

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ ঐতিহাসিক লর্ড অ্যাকটন (Lord Acton) বলেন যে, একই রাষ্ট্রে বহু জাতির সমন্বয় সভ্য জীবনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। অনেক সময় উন্নতিশীল জাতির সঙ্গে একই রাষ্ট্রে বসবাস করিয়া অনুন্নত জাতির অগ্রগতি সম্ভব হয়। যে জাতির মধ্যে সংগঠনের ক্ষমতা নষ্ট হইয়াছে,

যে জাতি প্রাণশক্তি হারাইয়াছে, সে জাতি একই রাষ্ট্রে উন্নত জাতির সঙ্গে থাকিয়া সজীব হইয়া ওঠে।

তৃতীয়তঃ, এই নীতির অবাধ প্রয়োগ হইলে বহু পুরাতন রাষ্ট্রকে বিভক্ত করিতে হইবে এবং বহু ক্ষুদ্র নূতন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি মাসারিক (President Masaryk) বলিয়াছিলেন যে, জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিলে ইউরোপে বর্তমান আটাশটি রাষ্ট্রের পরিবর্তে আটষট্টিটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হইবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করিলে সুইজারল্যাণ্ড তিনটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইবে। এইরূপ ক্ষুদ্রায়তন রাষ্ট্রগুলির অনেকেই আত্মনির্ভর হইতে পারিবে না। সামরিক ও অর্থনৈতিক আত্মনির্ভরতার উপর রাষ্ট্রের অগ্রগতি নির্ভর করে।

বর্তমান বিশ্বে বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সঙ্কটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। এই অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি হইলেও তাহারা অর্থনৈতিক দিক হইতে স্বাবলম্বী না হইতে পারিলে স্বভাবতঃই বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীগুলির ক্রীড়নকে পরিণত হইবে। আন্তর্জাতিক উত্তেজনাকে ইহা প্রশমিত না করিয়া বরং জটিলতর করিবে।

উপসংহার: অতএব আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগের অনেক অসুবিধা আছে। অনেক রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতি এমনভাবে সংমিশ্রিত যে তাহাদের পৃথক করিয়া স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন জাতীয় জনসমষ্টির মধ্যে যদি গভীর অসন্তোষ ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় এবং ইহার জনসংখ্যা যদি খুব স্বল্প না হয় তাহা হইলে সেই জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা উচিত।

কোন রাষ্ট্র যদি বহুজাতির সমন্বয়ে সংগঠিত হয় তাহা হইলে সেই রাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা থাকা উচিত। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাতেই আঞ্চলিক সরকার সৃষ্টির মাধ্যমে তাহাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে পারে।

প্রশ্নাবলী

1. What is a 'Nation'? Explain the principle: "One nation, one State".

("জাতি" শব্দটির অর্থ কি? "এক জাতি এক রাষ্ট্র" নীতির ব্যাখ্যা কর।)

(পৃঃ ১৮৫-১৮৬ ও পৃঃ ১৮৭-১৮৯ দেখ)

2. What is a 'nationality'? Can 'nationality' be a satisfactory basis of statehood?

("জাতীয় জনসমষ্টি" বলিতে কি বুঝায়? জাতীয় জনসমষ্টি কি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় ভিত্তি?)

(পৃঃ ১৮৬ ও পৃঃ ১৮৭-১৮৯ দেখ)

পঞ্চম অধ্যায়

সরকারের শ্রেণীবিভাগ: গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র
(Forms of Government: Democracy and Dictatorship)

প্রাচীন ও আধুনিক অনেক লেখক সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। প্রাচীন লেখকদের মধ্যে অ্যারিস্টটলের নাম সমধিক প্রসিদ্ধ। দুইটি নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ব্যবহারকারীর সংখ্যা কত ও দ্বিতীয়তঃ, সরকার কি উদ্দেশ্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। তাঁহার মতে চরম ক্ষমতা যদি একজনের হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে সেই সরকার রাজতন্ত্র (monarchy)। যদি কয়েকজনের শাসন হয় তাহা হইলে ইহা অভিজাততন্ত্র (aristocracy), এবং যদি বহুলোকের শাসন হয় তাহাকে মিশ্র শাসনতন্ত্র (polity) বলে।

অ্যারিস্টটলের মতে যদি সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে ইহা স্বাভাবিক (normal) শাসন এবং শুধুমাত্র শাসকের স্বার্থসিদ্ধি করা যদি সরকারের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা বিকৃত (perverted) শাসন। এই অর্থে রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং মিশ্র শাসনতন্ত্র স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা। তাহাদের বিকৃত রূপ হইল যথাক্রমে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র (despotism), ধনতন্ত্র (oligarchy) এবং গণতন্ত্র (democracy)।

অ্যারিস্টটল কর্তৃক সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিম্নলিখিতভাবে দেখান যাইতে পারে :—

শ্রেণীবিভাগের প্রথম নীতি (সংখ্যা অনুসারে)	শ্রেণীবিভাগের দ্বিতীয় নীতি (সরকারের উদ্দেশ্য অনুসারে)	
	সর্বসাধারণের কল্যাণে শাসন ক্ষমতার ব্যবহার	শাসকের স্বার্থে সরকারী ক্ষমতার ব্যবহার
একজনের শাসন	রাজতন্ত্র	স্বেচ্ছাচারতন্ত্র
কয়েকজনের শাসন	অভিজাততন্ত্র	ধনতন্ত্র
বহুলোকের শাসন	মিশ্র শাসনতন্ত্র	গণতন্ত্র

আধুনিক লেখকেরা অ্যারিস্টটলের শ্রেণীবিভাগ সমর্থন করেন না। রূপ ও কাঠামোর দৃষ্টিতে সরকারের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। বর্তমানে প্রথমতঃ, সরকারকে গণতন্ত্র (Democracy) ও একনায়কতন্ত্র (Dictatorship) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়। সরকারী ক্ষমতার অধিকারী যখন সমগ্র জনসাধারণ তখন তাহাকে গণতন্ত্র বলে। শাসনক্ষমতা যদি একজন বিশেষ ব্যক্তি বা একটি বিশেষ দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে তবে তাহাকে একনায়কতন্ত্র বলে। ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে গণতন্ত্র প্রচলিত। সোবিয়েৎ রাশিয়া একনায়কতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কেন না সেখানে সাম্যবাদী দলের (Communist Party) হস্তে শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ও এই দলের নেতাদের দ্বারাই এই ক্ষমতা পরিচালিত।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক জগতে আইন সভা শাসিত (Parliamentary Form of Government) অর্থাৎ দায়িত্বশীল (responsible) বা মন্ত্রিসভা-শাসিত (Cabinet) সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার (Presidential Form of Government) থাকিতে পারে। যে শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রীরা আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন তাহাকে আইনসভা-শাসিত সরকার বলে। যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য স্বীকার করা হয় এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁহাকে পদচ্যুত করা যায় না, তাহাকে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার বলে। ইংল্যাণ্ডে আইনসভা-শাসিত সরকার এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, আধুনিককালে অনেক দেশে এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government) এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal Government)—এই দুই শ্রেণীর সরকারও দেখা যায়। এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় সমস্ত সরকারী ক্ষমতা একটি সরকারের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে, এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার উভয়ের মধ্যে শাসন ক্ষমতা বণ্টন করা হয়। আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংল্যাণ্ডে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত।

গণতন্ত্র (Democracy) :

কোন শাসনের প্রতি সমর্থকদের সংখ্যা গুণিয়া গণতন্ত্রের স্বরূপ আবিষ্কার করা যায় না। হিটলারের শাসনের প্রতি জার্মানীর বেশীসংখ্যক লোকের সমর্থন ছিল। কিন্তু হিটলারের শাসনকে গণতান্ত্রিক শাসন বলা যায় না। মূলতঃ গণতন্ত্র একটি রাষ্ট্রনৈতিক পদ্ধতি যাহার মাধ্যমে জনসাধারণ শাসক নির্বাচন করে (Democracy is primarily a way of determining who shall govern—MacIver)।

গণতন্ত্র এমন একটি সরকারী ব্যবস্থা যাহা জনসাধারণের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। জনসাধারণকে যদি সরকার গঠন করিতে হয় তবে তাহাদের শাসক পছন্দ করিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত। যদি দেশে একটিমাত্র দল থাকে তাহা হইলে জনসাধারণকে সেই দলকেই শাসন করিবার জন্য পছন্দ করিতে হইবে। এই অবস্থায় পছন্দ করিবার স্বাধীনতা অর্থহীন হইবে। যদি বিকল্প মতবাদ ও কর্মপন্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন দল গড়িয়া ওঠে, তাহা হইলেই শাসক পছন্দ করিবার স্বাধীনতা বাস্তবরূপ ধারণ করে। কোন্ দল শাসন করিবে অর্থাৎ সরকার গঠন করিবে তাহা জনসাধারণ নির্ধারণ করে নির্বাচনের মাধ্যমে। নির্বাচনে প্রত্যেক নাগরিককে অংশ গ্রহণ করিতে দিতে হইলে তাহাকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

অতএব বিভিন্ন দলের সহ-অবস্থান, দলীয়-নীতি ও কর্ম-পন্থা সম্পর্কে স্বাধীন আলোচনা করিবার অধিকার, নির্বাচনের দ্বারা সরকার গঠন এবং সার্বজনীন ভোটাধিকার গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ (Forms of Democracy) :

গণতন্ত্র সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ (direct) এবং পরোক্ষ (বা প্রতিনিধিমূলক) (indirect or representative) এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র :

যে ব্যবস্থায় জনসাধারণ কোন সভায় সমবেত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে সরকারী নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তাহাকে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বলে। এই প্রকার ব্যবস্থায় জনসাধারণ নিজেরাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্রগুলিতে (city-states) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। নগর-রাষ্ট্রের নাগরিকেরা সমবেত হইয়া সরকারী কার্য পরিচালনা করিত। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেই শুধু মাত্র প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে। রাষ্ট্রের আয়তন যদি ছোট ও জনসংখ্যা যদি স্বল্প হয় তাহা হইলেই জনসাধারণের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসন পরিচালনা করা সম্ভব। আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এত বৃহৎ ও এগুলির জনসংখ্যা এত বেশী যে সেখানে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। একমাত্র সুইজারল্যাণ্ডের কয়েকটি ক্যাণ্টনে (বা শাসন বিভাগে) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সব ক্যাণ্টনের নাগরিকেরা নিজেরাই ক্যাণ্টনের কর্মচারীদের নির্বাচিত করে এবং আইন প্রণয়ন করে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আধুনিক রূপ হইল গণভোট (Referendum) ও গণ-উদ্যোগ (Initiative)। গণভোটের অর্থ হইল যে আইন সভায় উত্থাপিত কোন আইনের খসড়ার উপর জনসাধারণের মতামত চাওয়া হয়। জনসাধারণ ভোটের দ্বারা খসড়াটিকে গ্রহণ করিতে পারে বা বাতিল করিতে পারে। তাহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

নির্দিষ্ট সংখ্যক ভোটদাতা যদি কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে চায় বা আইনের খসড়া প্রণয়ন করিয়া আইন সভার নিকট প্রেরণ করে, তাহা হইলে আইন সভা তাহা বিবেচনা করিবে। সুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে পঞ্চাশ হাজার ভোটাধিকারী নাগরিক যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের পূর্ণ সংশোধন দাবী করিতে পারে।

নির্বাচিত প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবী (Recall) তৃতীয় প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিনিধি নির্বাচনের পরে যদি তাঁহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন বা নির্বাচকমণ্ডলীর (Electorate) স্বার্থ-বিরোধী কাজ করেন তাহা হইলে নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহার পদত্যাগ দাবী করিতে পারে।

গণভোট জনসাধারণকে অবাঞ্ছিত আইন বাতিল করিবার ক্ষমতা দেয়। গণ-উদ্যোগের দ্বারা জনসাধারণ নিজেদের কাম্য দাবীকে আইনে রূপান্তরিত

করিতে পারে। পদত্যাগ দাবীর দ্বারা অসাধু প্রতিনিধির অপসারণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। কিন্তু আধুনিক আইনের রূপ এত জটিল যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের পক্ষে এ বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র :

আধুনিককালে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র অধিক প্রচলিত। এই শাসন-ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ ক্ষমতা জনসাধারণের হস্তে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষমতা ব্যবহার করে না। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে, এবং জনসাধারণ এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন ক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা ব্যবহার করে।

ভারতবর্ষে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্র প্রবর্তিত হইয়াছে। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতা নির্বাচকমণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত, কিন্তু তাহারা পরোক্ষভাবে আইন সভায় তাহাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ক্ষমতা ব্যবহার করে। গণভোট, গণ-উদ্যোগ প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ভারতীয় সংবিধানে স্বীকার করা হয় নাই।

গণতন্ত্রের গুণ (Merits of Democracy) :

জনসাধারণের দ্বারা সরকারের নির্বাচন ও জনমতের দ্বারা সরকারের নিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইহা শাসকদের দক্ষ, সক্রিয় ও দায়িত্বশীল করে। সরকারী দল জানে যে কার্যে অক্ষমতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করিলে বিরোধী দল ইহার সুযোগ লইবে এবং পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ করা কষ্টসাধ্য হইবে। এই ভয়ে সরকারী দল সর্বদা দক্ষ ও দায়িত্বশীল হইবার চেষ্টা করে।

দ্বিতীয়তঃ, মিলের মতে একমাত্র গণতন্ত্রেই নাগরিক অধিকার ও স্বার্থ অবহেলিত হয় না। প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার আছে এবং সরকার সকলের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য প্রত্যেকের অধিকার ও স্বার্থের প্রতি সরকার দৃষ্টি রাখে।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে বিপ্লবের সম্ভাবনা কম। গণতন্ত্রের ভিত্তি স্বাধীনতা ও সাম্য। জনসাধারণ স্বাধীনভাবে সরকার নির্বাচন করে। অতএব গণতান্ত্রিক সরকারের ভিত্তি হইল জনসাধারণের সম্মতি। গণতন্ত্রে মানুষে মানুষে পার্থক্য করা হয় না। সকলেই সমানভাবে শাসন ক্ষমতায় অংশ

গ্রহণ করিবার সুযোগ পায়। স্বাধীনতা ও সাম্যের অনুপস্থিতিই বৈপ্লবিক পথে মানুষকে প্ররোচিত করে। গণতন্ত্র স্বাধীনতা ও সাম্যের আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুতরাং গণতন্ত্র স্থায়ী শাসন ব্যবস্থা।

চতুর্থতঃ, একমাত্র গণতন্ত্রেই মানুষের চরিত্র গঠন সম্ভব হয়। গণতন্ত্রে প্রত্যেককে রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার আত্মনির্ভরতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায় এবং রাষ্ট্রনৈতিক কার্যে তাহার উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। লর্ড ব্রাইস বলেন, ভোটাধিকারের মাধ্যমে মানুষের ব্যক্তিত্ব সমুন্নত হয়।

পঞ্চমতঃ, গণতন্ত্র দেশপ্রীতি সুদৃঢ় করে। জনসাধারণ যখন অনুভব করে যে সরকার তাহাদেরই সৃষ্টি, তখন তাহাদের দেশপ্রীতি বৃদ্ধি পায়।

গণতন্ত্রের ত্রুটি (Defects of Democracy) :

অনেকে বলেন যে, গণতন্ত্র মূর্খ, অশিক্ষিত জনসাধারন দ্বারা শাসিত সরকার। ইহার গুরুত্ব সংখ্যার উপর, গুণের উপর নয়। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত সর্বদা গ্রহণ করা হয়, যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠরা হইল 'সর্বাপেক্ষা অজ্ঞ ও সর্বাপেক্ষা অদক্ষ'। দক্ষ ও সুশিক্ষিত সংখ্যালঘিষ্ঠের মতকে গণতন্ত্রে মূল্য দেওয়া হয় না। ইহার ফলে সরকার সুদক্ষ হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রে শিল্পকলায় বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন প্রগতি সম্ভব নয়। জনসাধারণ স্বভাবতঃ রক্ষণশীল এবং পুরাতন ব্যবস্থার প্রতি আসক্ত। ইহার ফলে নূতন চিন্তাধারা ও নূতন আবিষ্কার জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় গণতান্ত্রিক সরকার বিশেষ দুর্বলতার পরিচয় দেয়। গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা ও আইন সভায় সুদীর্ঘ আলোচনার দ্বারাই কেবল কোন একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু জরুরী অবস্থায় (যেমন যুদ্ধকালে) দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক সরকার দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে না বলিয়া জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বিশেষ কার্যক্ষম হয় না।

চতুর্থতঃ, দলপ্রথার ত্রুটিগুলি গণতন্ত্রে সহজেই ধরা পড়ে। দলপ্রথা গণতন্ত্রের ভিত্তি। কিন্তু ইহা কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করিয়া জাতীয় সংহতি নষ্ট করে, এবং নির্বাচনে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অসাধু উপায় অবলম্বন করিয়া জাতির নৈতিক মান অবনত করে।

পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যয়বাহুল্য দেখা যায়। নির্বাচনে প্রচুর অর্থের অপচয় ঘটে। এই অর্থ দেশের অনেক উন্নতিমূলক কার্যে ব্যয় করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, অনেক লেখকের মতে গণতন্ত্রে জনতা মনোবৃত্তি (mob psychology) প্রকট হয়। জনসাধারণ রাজনৈতিক নেতাদের বাক্‌চাতুরী বা ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়।

উপসংহার ঃ

গণতন্ত্রের ত্রুটি আছে সন্দেহ নাই। কিন্তু কোন সরকারী ব্যবস্থাই সর্বাঙ্গসুন্দর ও নিখুঁত নয়। অন্যান্য শাসনের তুলনায় গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা। একনায়কতান্ত্রিক শাসনের তুলনায় ব্রিটেন বা আমেরিকার শাসন ব্যবস্থার কর্মনৈপুণ্য কম নয়। গণতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ হইল যে, ইহা সকল নাগরিককে সমান মর্যাদা দেয়। নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভব। গণতন্ত্রকে অর্থনৈতিক ন্যায়ের (economic justice) ভিত্তিতে সংশোধন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতি ও আর্থিক ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিয়া একনায়কতন্ত্র গ্রহণ করিলে মানব সভ্যতার অগ্রগতি নিশ্চয়ই ব্যাহত হইবে। সুখের বিষয়, বিগত দুইটি মহাযুদ্ধে গণতন্ত্রের জয় ও একনায়কতন্ত্রের আংশিক পরাজয় সূচিত হইয়াছে।

গণতন্ত্রকে সফল করিবার উপায় (Conditions of successful functioning of Democracy) ঃ

গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন গণতান্ত্রিক নাগরিকদের। নাগরিক যদি তাহার অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সজাগ হয় তাহা হইলেই গণতন্ত্র সফল হইয়া উঠে। ইহার জন্য প্রয়োজন নাগরিকের উপযুক্ত শিক্ষা। রাষ্ট্রীয় কার্যে যদি নাগরিককে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত মজুরীতে কাজ করিতে হইবে। যে মানুষ অভাবের মধ্যে বাস করে, যে মানুষের কাজের নিরাপত্তা নাই, তাহার পক্ষে রাষ্ট্রীয়

কার্যে সক্রিয় ও সচেতন হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে শিক্ষা এবং উপযুক্ত মজুরীতে কাজের ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপযোগী সুযোগ সুবিধা দিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা ও আপোষ করিবার অভ্যাস না থাকিলে গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে না। গণতন্ত্রে সরকারী দল ও বিরোধী দল উভয়ই দেখা যায়। সরকারী দল সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে নির্বাচিত। সরকারী দলের উদ্দেশ্য যদি হয় সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থসিদ্ধি করা, এবং বিরোধী দলের উদ্দেশ্য যদি হয় সমস্ত সরকারী কাজ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া তাহা হইলে শাসন ব্যবস্থা কার্যকরী হইতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠের পারস্পরিক সহযোগিতা ও আপোষের মাধ্যমেই গণতন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য প্রয়োজন জনশাসনের সহিত দক্ষতার সমন্বয় সাধন। যখন কোন কর্মপন্থার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি হয়, কিন্তু সরকারী দক্ষতার অভাবে এই কর্মপন্থার বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হয় না, তখনই গণতন্ত্রের বিপর্যয় ঘটে।

সর্বশেষে, গণতন্ত্রে উপযুক্ত, নির্ভীক ও সৎ নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। জনসাধারণ স্বভাবতঃ রাষ্ট্রীয় কার্য সম্পর্কে বিমুখ। তাহাদের রাষ্ট্রীয় কার্যে সচেতন ও সক্রিয় করা গণতান্ত্রিক নেতাদের প্রধান দায়িত্ব।

একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্র (Dictatorship and Democracy) :

একনায়কতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। একনায়কতন্ত্রে মতবাদের পার্থক্য স্বীকার করা হয় না। শাসকগোষ্ঠী দ্বারা সমর্থিত শুধুমাত্র একটি মতবাদের অস্তিত্ব একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকার করা হয়। ফলে একটিমাত্র দল রাষ্ট্রে সক্রিয় থাকে এবং সরকারী ক্ষমতা এই দলেরই একচেটিয়া অধিকার। কিন্তু গণতন্ত্রে মতবাদের বিভিন্নতা স্বীকার করা হয়। ফলে গণতন্ত্রে বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠে এবং সরকারী ক্ষমতা কোন একটি বিশেষ দলের একচেটিয়া কায়েমী স্বার্থ হইয়া উঠে না। সোবিয়েৎ রাশিয়ায় শুধুমাত্র সাম্যবাদী দলের (Communist Party) অস্তিত্ব রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ব্রিটেন বা ভারতবর্ষের মত গণতান্ত্রিক দেশে একাধিক দলকে কাজ করিতে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে রাষ্ট্রের দ্বারা মানুষের জীবনের সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। মানুষের অর্থনৈতিক জীবন হইতে সুরু করিয়া তাহার সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবন পর্যন্ত রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। জীবনের কোন অংশই রাষ্ট্রের এলাকার বাহিরে থাকে না। কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র মানুষের সমস্ত জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে না। মানুষের সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য গণতন্ত্রে স্বীকৃত হয়।

একনায়কতন্ত্রের প্রকারভেদ (Kinds of Dictatorship) :

তিন প্রকার একনায়কতন্ত্র পরিলক্ষিত হয় : (ক) সামরিক (military) (খ) ফ্যাসিস্ট (fascist) ও (গ) সাম্যবাদী (communist)।

(ক) যখন কোন সৈন্যাধ্যক্ষ সামরিক শক্তিবলে দেশের প্রচলিত আইনব্যবস্থা লুপ্ত করিয়া একচ্ছত্র শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তখন সামরিক একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। আয়ুব খাঁর নেতৃত্বে বর্তমান পাকিস্তান এই শাসন ব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(খ) উগ্র জাতীয়তাবাদের অনুপ্রেরণায় কোন একটি দল রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা একচ্ছত্রভাবে পরিচালনা করিলে ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্র সৃষ্ট হয়। হিটলারের শাসনকালে জার্মানীতে ও মুসোলিনী শাসিত ইটালীতে এইরূপ শাসন ব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছিল।

(গ) মার্ক্সীয় দর্শনের আলোকে শ্রেণীহীন সমাজগঠনকল্পে উৎপীড়িতদের একনায়কতন্ত্র সাম্যবাদী একনায়কতন্ত্র রূপে পরিচিত। সোবিয়েৎ রাশিয়া ও কম্যুনিস্ট চীনে এই প্রকারের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে। সাম্য-বাদী দলের (Communist Party) একচ্ছত্র কর্তৃত্ব এই ব্যবস্থায় স্বীকৃত হয়।

একনায়কতন্ত্রের গুণ (Merits of Dictatorship) :

একনায়কতন্ত্রে মাত্র একটি দল থাকে। কোন বিরোধী দলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ফলে জাতীয় জীবনে কোন বিভেদ ও বিরোধের সৃষ্টি হয় না। সুতরাং একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় হয়।

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সরকারী ক্ষমতা একটি দলের হস্তে কেন্দ্রীভূত থাকে। ফলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনার

প্রয়োজন হয় না। সুতরাং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়। অতএব জরুরী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র অনেক সময় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

তৃতীয়তঃ, ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি শাসন পরিচালনায় দক্ষ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অগ্রগামী। মানুষের জীবনের উপর রাষ্ট্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় এবং দলীয় বিরোধ না থাকায় শাসনব্যবস্থা বিশেষভাবে শক্তিশালী ও দক্ষ হয়, এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করা সহজ হয়। সোবিয়েৎ রাশিয়ায় স্বল্পকালের মধ্যে যে বিরাট অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছে তাহা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের দক্ষতারই পরিচয় দেয়।

একনায়কতন্ত্রের দোষ (Demerits of Dictatorship) :

একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একটি মতবাদের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। এই মতবাদ-বিরুদ্ধ কোন ভাবধারার প্রকাশ এই শাসনব্যবস্থায় দণ্ডনীয়। মতবাদের বৈচিত্র্য এই ব্যবস্থায় স্বীকার করা হয় না। চিন্তার স্বাধীনতা অস্বীকার করার ফলে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব হয় না। চিন্তাশীল, জীবন্ত মানুষ একনায়কতন্ত্রে গড়িয়া উঠিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রের স্থায়িত্ব কম। জনসাধারণের সম্মতি এই শাসনের ভিত্তি নয়। সরকার জনসাধারণের সৃষ্টি নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় মানুষের দেশপ্রীতি জন্মিতে পারে না। বলপ্রয়োগের দ্বারা সাধারণের আনুগত্য আদায় করা হয়। কিন্তু গণসম্মতির উপর শাসনব্যবস্থার ভিত্তি রচিত না হইলে ইহা কখনই স্থায়ী হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, শাসকের ভ্রান্তিহীন সামর্থ্যের বিপজ্জনক ধারণার উপর একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত। অনিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থার অপ্রতিহত প্রভাব জনসাধারণের জীবনকে বিপন্ন করে। এই শাসনব্যবস্থায় স্বাধীন ও সক্রিয় সমালোচনার স্থান না থাকায় ভুলত্রুটির সম্ভাবনা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকে।

প্রশ্নাবলী

1. Define Democracy.
(গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কি ?) (পৃঃ ১৯২ দেখ)

2. Distinguish between Direct and Representative Democracy. Which type would you prefer and why?

(প্রত্যক্ষ ও প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের পার্থক্য নির্দেশ কর। কোন্‌টি তুমি সমর্থন কর এবং কেন?) (পৃঃ ১৯২-১৯৪ দেখ)।

3. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Is Democracy suited to India?

(গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। গতণন্ত্র কি ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী শাসনব্যবস্থা?) (পৃঃ ১৯৭-১৯৮ দেখ।)

[দ্বিতীয় অংশের উত্তরের ইংগিত: অনেকে মনে করেন যে জনসাধারণের দারিদ্র্য ও শিক্ষার অভাবহেতু ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা সফল হইতে পারে না। কিন্তু দুইটি সাধারণ নির্বাচন প্রমাণ করিয়াছে যে ভারতের জনসাধারণ গণতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল। নিরপেক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির উপযুক্ত ভূমিকা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। জাতীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ও সাধারণ মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটিতেছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি সফল হইলে ভারতীয় গণতন্ত্রের ভিত্তি আরও সুদৃঢ় হইবে।]

4. Describe the merits and demerits of Representative Democracy.

(প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের গুণাগুণ বর্ণনা কর।) (পৃঃ ১৯৪-১৯৬ দেখ।)

5. What do you understand by Dictatorship? State its demerits. Has dictatorship any merit?

(একনায়কতন্ত্র বলিতে তুমি কি বুঝ? ইহার ত্রুটিসমূহ উল্লেখ কর। এই শাসনব্যবস্থার গুণ কি?) (পৃঃ ১৯৭-১৯৯ দেখ।)

6. What are the conditions of the successful functioning of Democracy?

(গণতন্ত্রকে সফল করিবার উপায়গুলি কি?) (পৃঃ ১৯৬-১৯৭)

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের শ্রেণীবিভাগ ঃ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ঃ আইনসভা-শাসিত সরকার ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকার

(Forms of Government : Unitary and Federal Government, Parliamentary and Presidential Government)

এককেন্দ্রিক শাসন (Unitary Government) ঃ

এই শাসন-ব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে সমস্ত শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকে। শাসনের সুবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার থাকিতে পারে। কিন্তু আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সৃষ্টি; এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত ক্ষমতাই শুধুমাত্র আঞ্চলিক সরকার ভোগ করে। সুতরাং আঞ্চলিক সরকারের কোন মৌলিক ক্ষমতা নাই; সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে গৃহীত। কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতার হ্রাসবৃদ্ধি বা সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করিতে পারে। সুতরাং একটিমাত্র সার্বভৌম আইনসভার অবস্থিতি এবং অপর কোন সার্বভৌম প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতি এই শাসন ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক শাসন প্রচলিত আছে। ব্রিটেনের স্থানীয় সরকারগুলি পার্লামেন্টেরই সৃষ্টি এবং পার্লামেন্টদত্ত ক্ষমতাই তাহারা ভোগ করে।

গুণ (Merits) ঃ

সমস্ত সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকার ফলে এককেন্দ্রিক সরকার বিশেষ শক্তিশালী হয়। বিভিন্ন সরকারের মধ্যে শাসন ও আইন সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হয় না। সমস্ত দেশব্যাপী একই প্রকারের শাসন ও আইন প্রচলিত থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনে নাগরিকদের আনুগত্য খণ্ডিত নয়। যেমন, ভারতবর্ষে পশ্চিম বাংলার লোকের আনুগত্য কিছুটা কেন্দ্র ও কিছুটা রাজ্যের প্রতি, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে সকলের আনুগত্যই সমগ্র এককেন্দ্রিক ব্রিটিশ সরকারের প্রতি। সেখানে কোন প্রকার খণ্ডিত আনুগত্য নাই। আনুগত্যের অখণ্ডতার ফলে কোন অঞ্চল সমগ্র রাষ্ট্রের অধীনতা অস্বীকার করিয়া সেই রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, একটিমাত্র সরকার (কেন্দ্রীয় সরকার) থাকায় এককেন্দ্রিক শাসনে ব্যয়বাহুল্য দেখা যায় না।

চতুর্থতঃ, এককেন্দ্রিক শাসনের সংবিধান সহজেই পরিবর্তনীয়। ইহার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শাসন পরিচালিত হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষার ব্যাপারে এককেন্দ্রিক শাসন বিশেষ কর্মক্ষম হয়।

ত্রুটি (Defects):

এককেন্দ্রিক শাসনে সমস্ত ক্ষমতা একটি সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকায় সরকারী স্বৈরাচারের সৃষ্টি হইতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকে। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাচারের সম্ভাবনা থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রগুলি এত বৃহদায়তন যে একটি কেন্দ্র হইতে সমস্ত দেশ দক্ষতার সহিত শাসন করা যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে স্থানীয় সমস্যা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকা এবং যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং বৃহৎ দেশে এককেন্দ্রিক শাসন বাঞ্ছনীয় নয়।

তৃতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলির কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা ক্ষমতা থাকে না। ইহার ফলে শাসনের ব্যাপারে স্থানীয় লোকদের উৎসাহের অভাব দেখা যায়।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন (Federal Government):

যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা বিভক্ত থাকে। সংবিধান উভয় সরকারের ক্ষমতা নির্দেশ করিয়া দেয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যসরকার সংবিধান কর্তৃক নির্দিষ্ট

সীমারেখার মধ্যেই শাসন ক্ষমতা ভোগ করিতে পারে। উভয় সরকার স্ব-স্ব এলাকায় স্বাধীন। শাসন ক্ষমতা ভাগ করিবার নীতি বিভিন্ন যুক্তরাষ্ট্রে ভিন্নরূপ, কিন্তু একটি সাধারণ নীতি সব যুক্তরাষ্ট্রেই অনুসরণ করা হয়। যে সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে সমস্ত দেশের স্বার্থ জড়িত, সেইগুলির শাসনদায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া হয়। আর যে সমস্ত বিষয়গুলি একান্তই আঞ্চলিক এবং সমস্ত দেশের স্বার্থ জড়িত নয়, তাহাদের শাসনভার আঞ্চলিক সরকারকে দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় হয়। সংবিধানের ধারাগুলি যদি সুস্পষ্টভাবে লিখিত না থাকে তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে স্ব স্ব ক্ষমতার সীমারেখা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা থাকে। উভয় সরকারের সম্মতি ব্যতীত সংবিধানের পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। যদি শুধু একটি সরকারকে সংবিধান পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইলে সেই সরকার অন্য সরকারের ক্ষমতা খর্ব করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত একান্ত প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকার বা একাধিক আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে এলাকা বা ক্ষমতা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের ধারাগুলি ব্যাখ্যা করিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রকে বিশেষ শক্তিশালী করা হইয়াছে। জরুরী অবস্থায় ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় পরিণত করা যায়। ভারতের রাষ্ট্রপতি তখন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া নিজে ভারতের শাসনভার পরিচালনা করিতে পারেন। রাজ্যপাল নিয়োগের মধ্য দিয়া ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলের (যেমন ত্রিপুরা) শাসক মনোনয়নের মধ্য দিয়া রাষ্ট্রপতি রাজ্য-শাসন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। সুতরাং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রকে পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্র বলা যায় না।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য (Distinction between unitary and federal governments):

যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ও এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। যুক্তরাষ্ট্রে অঞ্চল ও কেন্দ্রের মধ্যে শাসনক্ষমতা সংবিধানের মাধ্যমে এমনভাবে

ভাগ করিয়া দেওয়া হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারগুলি কেহ কাহারও এলাকার মধ্যে অনুপ্রবেশ করে না,—প্রত্যেকেই নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সংবিধানবণ্টিত বিষয়গুলির উপর স্বাধীনভাবে কর্তৃত্ব করে। অপরপক্ষে, এককেন্দ্রিক সরকার অর্থে এমন শাসন ব্যবস্থা বোঝায় যেখানে অনুরূপ কোন ক্ষমতা বিভাগের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা একটি-মাত্র কেন্দ্রীয় আইন সভার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অপর কোন সার্বভৌম আঞ্চলিক আইন-প্রণয়ন সংস্থা এককেন্দ্রিক সরকারে পরিলক্ষিত হয় না।

গুণ (Merits) :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনের গুণ হইল যে, এখানে মিলনের মাধ্যমে ছোট রাষ্ট্র-সমূহের শক্তি বৃদ্ধি পায়, অথচ তাহাদের প্রয়োজনীয় স্বাতন্ত্র্যও অক্ষুণ্ণ থাকে। বিভিন্ন জাতীয় জনসমষ্টির সমাবেশে যে রাষ্ট্র গঠিত হয় সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান একান্ত প্রয়োজন। কারণ, কেবল যুক্তরাষ্ট্রেই এই সমস্ত জাতীয় জনসমষ্টি তাহাদের সংস্কৃতি ও অন্যান্য জাতীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিভক্ত থাকায় কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারের সৃষ্টি হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে বহু আঞ্চলিক সরকার থাকে। ফলে বহুসংখ্যক লোক শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। ইহাতে রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয় এবং নাগরিক কর্তব্য সম্পর্কে তাহারা সচেতন হইয়া ওঠে।

চতুর্থতঃ, বৃহৎ রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন বিশেষ উপযোগী। বৃহৎ রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্র হইতে সমস্ত দেশ সুশাসন করা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রে বহু আঞ্চলিক সরকার থাকায় আঞ্চলিক সমস্যা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি রাখা সম্ভব হয়।

ত্রুটি (Defects) :

যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও বহু আঞ্চলিক সরকার থাকে। নিজ নিজ ক্ষমতা ও সীমানা লইয়া ইহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। যুক্ত-রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বা একাধিক আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনা থাকে। দেশের সর্বত্র শাসন ও আইনের মধ্যে সহযোগিতা না থাকায় যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বিশেষ শক্তিশালী হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রে কালের পরিবর্তনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে অসুবিধা হয়। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র দুষ্পরিবর্তনীয়। ইহার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সহিত শাসনযন্ত্রের পরিবর্তন সাধন সহজে সম্ভব হয় না, এবং ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক নীতি অনুসরণে যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতা বিশেষ ভাবে দেখা যায়। কেন্দ্র ও অঞ্চলের স্বার্থের বিরোধ হেতু অনেক সময় সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রের পক্ষে শক্তিশালী বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় না।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকের আনুগত্য একদিকে কেন্দ্র সরকারের প্রতি, অপরদিকে রাজ্য সরকারের প্রতি। এই দ্বিধা-বিভক্ত নাগরিকতার ফলে রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থ অপেক্ষা আঞ্চলিক স্বার্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার প্রবণতা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়। এইরূপ অবস্থায় রাষ্ট্রব্যবস্থা দুর্বল হইবার আশঙ্কা থাকে।

পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে বহু সরকার অবস্থান করায় সরকারী ব্যয় বিশেষ বৃদ্ধি পায়।

যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপায়সমূহ (Conditions for the successful working of Federation) :

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় জাতীয় সংহতির সঙ্গে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যের সমন্বয় দেখা যায়। কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপর এই শাসনের সাফল্য নির্ভরশীল। নিম্নোক্ত সর্তের উপর যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে :

প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে মিলনের আকাঙ্ক্ষা (desire for union) থাকিবে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে মিলিত হইয়াও আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। মিলনের মাধ্যমে আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য অবলুপ্ত হইলে এককেন্দ্রিক শাসনের সৃষ্টি হইবে। এইজন্য যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় ও আঞ্চলিক সরকার উভয়ই সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত সরকার।

দ্বিতীয়তঃ, যে সমস্ত জনসমষ্টি যুক্তরাষ্ট্র সংগঠনের অভিলাষী তাহাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি বা সখ্যভাব (like-mindedness) একান্ত প্রয়োজন। এই সখ্যভাব সৃষ্টিতে বিভিন্ন উপাদান সহায়তা করে। ভাষার

ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, ইতিহাসের ঐক্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের ঐক্য সমভাব সৃষ্টির উপাদান।

তৃতীয়তঃ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য (geographical contiguity) যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের অন্যতম সর্ত। বিভিন্ন অঞ্চল যদি দূরত্বের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর ঐক্য সৃষ্টি হওয়া সুকঠিন। পাকিস্তান রাষ্ট্রে ভৌগোলিক সান্নিধ্যের অভাব দেখা যায়। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে বিরাট দূরত্বের ব্যবধান আছে তাহার ফলে দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে স্বার্থের ঐক্যের (community of interests) অভাব পরিলক্ষিত হয়। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সফল হয় না।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চলসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা, আয়তন ও সম্পদের বিরাট অসাম্য (gross inequality) বর্তমান থাকিলে এই শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না। ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে এই ভীতি সঞ্চারিত হয় যে বৃহৎ রাজ্য বা রাজ্যগোষ্ঠী তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিবে। এই ভীতি দূর করিবার জন্য সমস্ত অঞ্চলের সমান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার থাকা বাঞ্ছনীয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে (সেনেটে) সমস্ত রাজ্যকে সমান প্রতিনিধিত্বের অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ট্রে অধিবাসীদের মধ্যে সুগভীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা (political consciousness) থাকা প্রয়োজন। কেন্দ্রের প্রতি আনুগত্য ও রাজ্যের প্রতি আকর্ষণের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা এই শাসনে অভিপ্রেত। কেন্দ্রের প্রতি প্রবণতা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে। আবার রাজ্যের প্রতি অধিকতর আসক্তি জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে প্রয়োজন সচেতন রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী।

ভারতবর্ষে দ্বিতীয়, চতুর্থ ও সর্বশেষ সর্তের অভাব দেখা যায়। ভাষা ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা সহভাবসৃষ্টির প্রধান অন্তরায়। বিভিন্ন অঞ্চলসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা ও সম্পদের বিরাট পার্থক্য পারস্পরিক সন্দেহ ও ভীতির সঞ্চার করিয়াছে। উপরন্তু, ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ। এই সব অপূর্ণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা কেন্দ্র-প্রবণ যুক্তরাষ্ট্রের (Unitary Federation) সৃষ্টি করিয়াছেন।

আইনসভা ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারী ব্যবস্থা ঃ

আইনসভা-শাসিত বা দায়িত্বশীল বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারী ব্যবস্থা (Parliamentary or Responsible or Cabinet form of Government) ঃ

এই ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক ও নামসর্বস্ব শাসকের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। প্রকৃত শাসক বা মন্ত্রিসভা সমস্ত কাজ ও নীতির জন্য প্রত্যক্ষভাবে ও আইনতঃ আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। কিন্তু নামসর্বস্ব শাসক বা রাষ্ট্রের প্রধানের কোন দায়িত্ব নাই। যেমন ব্রিটেনে রাজা হইলেন নামসর্বস্ব শাসক, এবং পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী মন্ত্রিসভা প্রকৃত শাসক।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইন সভার সদস্য। মন্ত্রিসভা হইল আইন সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি বা পরিষদ। মন্ত্রিসভা সমস্ত নীতি ও কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্রীদের সরকারী ক্ষমতায় অবস্থানকাল নির্দিষ্ট নয়। তাঁহারা ততদিন শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন যতদিন তাঁহারা আইনসভার আস্থাভাজন থাকিবেন। সুতরাং এই ব্যবস্থায় আইন সভার প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়, এবং আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগের দায়িত্ব এই ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য।

গুণাগুণ (Merits and demerits of the Parliamentary System) ঃ

গুণ ঃ এই শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও সহযোগিতা দেখা যায়। মন্ত্রীরা বিভিন্ন শাসন বিভাগের প্রধান এবং তাঁহারা আইন সভারও সদস্য। মন্ত্রীরাই আইন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ফলে আইন প্রণয়ন এবং আইনের প্রয়োগের মধ্যে একটা যোগসূত্র দেখা যায় এবং সরকারী কার্যে দক্ষতা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না। আইন সভার প্রতি সরকারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকে। সরকারের সমস্ত কার্যকে নিয়ন্ত্রণ করে আইন সভা। এই নিয়ন্ত্রণ সরকারকে দায়িত্বশীল করিয়া তোলে।

তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনশীলতা (flexibility) এই ব্যবস্থার অন্যতম গুণ। কোন মন্ত্রিসভা কতদিন শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে তাহা এই ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এই ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা বা প্রধান মন্ত্রীর পরিবর্তন সম্ভব। জরুরী অবস্থায় কোন এক নূতন প্রধান মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চেম্বারলেনের পরিবর্তে চার্চিল ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী হন। তখনকার সংকটের সময় তিনি জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ব্রিটেনে আইনসভা-শাসিত সরকারী ব্যবস্থা প্রচলিত আছে বলিয়াই এই পরিবর্তন সাধন সহজ হইয়াছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির শাসনে এরূপ পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। কারণ তাঁহার অবস্থানকাল সুনির্দিষ্ট।

ত্রুটি ঃ

আইনসভা শাসিত সরকারী ব্যবস্থায় ক্ষমতা পৃথকীকরণ (separation of powers) প্রয়োগ দেখা যায় না। শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ইহার ফলে সরকারী স্বৈরাচার দেখা যাইতে পারে। আইন সভার দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মন্ত্রিসভা একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে। ইহার ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাকে সমালোচকগণ মন্ত্রিসভার একনায়কতন্ত্র (cabinet dictatorship) আখ্যা দিয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থায় এই শাসনের দুর্বলতা বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। মন্ত্রিসভা ও আইন সভায় দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুতরাং জরুরী অবস্থায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ এই শাসনে সম্ভব হয় না।

তৃতীয়তঃ, কোন দীর্ঘকালীন, সামঞ্জস্যপূর্ণ কর্মসূচী এই ব্যবস্থায় অনুসরণ করা সম্ভব হয় না। সরকারের কোন স্থায়িত্ব নাই। সরকারী দল জানে না কতদিন তাহারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবে। এই অনিশ্চয়তার জন্য সরকারী দল কোন দীর্ঘস্থায়ী সুপরিকল্পিত নীতি গ্রহণ করিতে উৎসাহিত বোধ করে না।

রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা (Presidential form of Government) ঃ

এই শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত শাসক ও নামসর্বস্ব শাসকের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করা হয় না। রাষ্ট্রের প্রধান রাষ্ট্রপতি, এবং তিনিই প্রকৃত

শাসক। সমস্ত শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে কেন্দ্রীভূত। এই শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রীরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারী, তাঁহারা আইনসভার সদস্য নন।

দ্বিতীয়তঃ, আইনসভার নিকট রাষ্ট্রপতির কোন দায়িত্ব নাই। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি তাঁহার দায়িত্ব আছে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন এবং কোন কাজ বা নীতির জন্য আইনসভার নিকট তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না।

তৃতীয়তঃ, তাঁহার কর্মকাল নির্দিষ্ট। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে তাঁহাকে সহজে পদচ্যুত করা সম্ভব নয়।

অতএব, এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল যে, শাসন বিভাগ সাধারণতঃ আইনসভার উপর নির্ভরশীল নয়।

রাষ্ট্রপতি শাসনের গুণাগুণ (Merits and demerits of the Presidential form of Government) :

গুণ : রাষ্ট্রপতির কার্যকাল সুনির্দিষ্ট। তাই স্থায়িত্ব সম্পর্কে অনিশ্চয়তা না থাকায় সুপরিকল্পিত সরকারী নীতি এই ব্যবস্থায় গ্রহণ এবং সাফল্যের সহিত প্রয়োগ করা সম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকায় এই ব্যবস্থায় অল্প সময়ে দ্রুত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হয়। রাষ্ট্রপতিই সমস্ত শাসনক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং তিনি তাড়াতাড়ি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন।

ত্রুটি : রাষ্ট্রপতি আইনসভার নিয়ন্ত্রণমুক্ত। আইনসভার নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। নিদিষ্ট সময়ের পূর্বে তাঁহাকে অপসারিত করা সম্ভব নয়। ইহার ফলে তিনি নিজের খেয়ালখুসী মত কাজ করিতে পারেন। তাই রাষ্ট্রপতির শাসনে স্বেচ্ছাচারের সম্ভাবনা আছে।

দ্বিতীয়তঃ, এই শাসন-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক, এবং প্রত্যেকেই নিজস্ব এলাকায় প্রধান। ইহার ফলে শাসন বিভাগ ও আইন বিভাগের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা যায়। ফলে সরকারী কার্যে দক্ষতার অভাব দেখা যায়। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসের (আমেরিকার আইনসভা) মধ্যে অসহযোগিতা ও বিরোধ হেতু অনেক লোকহিতকর, গুরুত্বপূর্ণ কাজ ব্যাহত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে কোন শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ?—ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার সর্বময় কর্তা। কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা পার্লামেণ্টের নিকট দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে তাঁহার শাসন-ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হয়। এই মন্ত্রিসভাই আসল শাসক। সুতরাং ভারতবর্ষে যদিও রাষ্ট্রপতির স্থান সকলের উর্ধ্বে, তবুও ভারতবর্ষের শাসন-ব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্ট শাসিত ব্যবস্থা বলাই যুক্তিসঙ্গত।

প্রশ্নাবলী

1. How will you distinguish Unitary Government from Federal Government? Illustrate your answer.

(উদাহরণ সহ এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের পার্থক্য নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২০১-২০৪)

2. What are the characteristics of a Federal Constitution?

(যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের বৈশিষ্ট্য কি?) (পৃঃ ২০২-২০৩ দেখ)

3. Compare the advantages and disadvantages of a Unitary State with those of a Federal State.

(এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সুবিধা-অসুবিধাগুলির তুলনামূলক আলোচনা কর।) (পৃঃ ২০১-২০৫ দেখ)

4. Distinguish between Cabinet form of government and Presidential form of government. Discuss their respective merits and demerits.

(মন্ত্রিসভা-শাসিত ও রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ইহাদের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।) (পৃঃ ২০৭-২১০ দেখ)

5. What, according to you, are the reasons for the present tendency towards federation?

(বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে প্রবণতার কারণ নির্দেশ কর।)

[ইংগিত: আধুনিক যুগে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দিকে বিশেষ প্রবণতা দেখা যাইতেছে। ইহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের পক্ষে স্বাধীন অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা বিশেষ কষ্টসাধ্য। এইজন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র একত্রিত হইয়া একটি বৃহৎ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ইহাতে সামরিক শক্তি বিশেষ বৃদ্ধি পায়। অথচ যুক্তরাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হইয়াও প্রত্যেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বহু রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হওয়ায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কেন্দ্রীয় স্বৈরাচারের আশঙ্কা আছে। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গ সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বিভক্ত থাকায় সরকারী স্বৈরাচারের সম্ভাবনা হ্রাস পায়। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমেই প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব।]

6. Discuss the conditions for the successful working of federation.

(যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্যের উপায়সমূহ আলোচনা কর।) (পৃঃ ২০৫-২০৬ দেখ)

— ———

সপ্তম অধ্যায়

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ
(Organs of Government)

সরকারের বিভিন্ন বিভাগ :

সরকার যে কেবল রাষ্ট্রের একটি বিশেষ উপাদান তাহা নহে, এক কথায় বলা যায় সরকার রাষ্ট্রের মুখপাত্র। সরকার রাষ্ট্রের কর্মময় রূপ। রাষ্ট্রের উৎপত্তি নাগরিকগণের সুখসমৃদ্ধ জীবনের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। কিন্তু রাষ্ট্র তাহার সমস্ত কার্য সরকারের মাধ্যমে করে। এইজন্য সরকারকে বিভিন্ন ধরণের কাজ করিতে হয়। সরকারকে যে সকল কার্য করিতে হয় তাহাদিগকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথা : আইন রচনা, রচিত আইনগুলিকে প্রয়োগ করা এবং আইন-অমান্যকারিগণের বিচার করা। আইন রচনা করে আইনপ্রণয়ন-বিভাগ, আইন প্রয়োগ করে শাসন-বিভাগ, আইনঅমান্যকারী-দের বিচার করে বিচার-বিভাগ।

আইনপ্রণয়ন-বিভাগ (Legislature) :

নাগরিকগণের মঙ্গল সাধনের জন্য রাষ্ট্রের যে বিভাগ বিভিন্ন প্রকারের আইন রচনা করে তাহাকে আইনপ্রণয়ন-বিভাগ বলা হয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে স্বৈরাচার হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য এই তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার সমতা রক্ষা করা হয়, তবুও নিরপেক্ষ বিচারে দেখা যায় আইন-বিভাগের ক্ষমতা অন্যান্য বিভাগের ক্ষমতা অপেক্ষা বেশী। কারণ আইন-প্রণয়ন-বিভাগ প্রথমে আইনপ্রণয়ন করে, পরে শাসন-বিভাগ তাহার ব্যবহারিক রূপ দেয় এবং যাহারা এই আইন অমান্য করে বিচার-বিভাগ তাহাদের বিচার করে।

কার্যাবলী (Functions) :

১। আইনপ্রণয়ন-বিভাগের প্রধান কাজ হইল সংবিধান কর্তৃক নির্দেশিত বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে নূতন আইন প্রণয়ন করা। প্রয়োজন মত নূতন আইন রচনা করা ছাড়াও ইহা অপ্রয়োজনীয় পুরাতন আইনগুলিকে সংশোধিত করিতে বা বাতিল করিতে পারে।

২। আইন প্রণয়ন ব্যতীত আইনপ্রণয়ন-বিভাগের আরও কতকগুলি বিশেষ কার্য আছে। সরকার রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার জন্য এবং নাগরিকগণের উন্নতির জন্য নানা প্রকারে অর্থব্যয় করে এবং ঐ ব্যয়ভার বহনের জন্য নানা প্রকার কর ধার্য করে। এই বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে আইনসভা।

৩। মন্ত্রিসভা-পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ ব্যবস্থাপক সভা বা আইনসভার সদস্যগণের মধ্য হইতে প্রধান মন্ত্রী দ্বারা মনোনীত হন। মন্ত্রিসভা সরকারী নীতি ও কার্যপ্রণালীর জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে। যদি সরকারী নীতি আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ না করে তবে মন্ত্রিমণ্ডলীকে তাহাদের নীতি পরিবর্তন করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভা অনাস্থা (No Confidence) প্রস্তাব আনয়ন করিয়া মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে।

৪। কোন কোন রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতিগণ আইনসভার সদস্যগণের দ্বারা নির্বাচিত হন। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা ও প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। আবার, সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েৎ রাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইনসভার দ্বারা মনোনীত হন।

৫। আইনসভা কেবলমাত্র আইনবিষয়ক কার্য করে তাহা নহে, শাসন ও বিচার বিভাগীয় কতকগুলি কার্যও সম্পাদন করে। কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (যেমন রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি) নিয়োগ করা এবং অন্য রাষ্ট্রের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করা কিংবা সন্ধি অনুমোদন করা শাসন-বিভাগের কাজ। কিন্তু কোন কোন রাষ্ট্রে আইনসভা ঐ কাজ করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটের (Senate) উদাহরণ দেওয়া যায়।

৬। জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কোন কার্য করার জন্য কিংবা আইন অমান্য করার জন্য বিচারের ভার বিচার-বিভাগের উপর। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে ঐ বিচারের ভার থাকে আইনসভার উপর। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ অভিযুক্ত হইলে সেনেটে তাঁহাদের বিচার হয়। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতের দোষী রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির বিচারের ভার কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উপর।

সংগঠন (Organisation) : দ্বিতীয় কক্ষ (Bicameralism) :

আইনসভার গঠনপ্রণালী দুই প্রকার। আইনসভার একটি মাত্র কক্ষ থাকিলে তাহাকে এককক্ষযুক্ত ব্যবস্থা (Unicameral System) এবং দুইটি কক্ষ থাকিলে তাহাকে দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থা (Bicameral System) বলা হয়। প্রায় প্রত্যেক আধুনিক দেশেই দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা দেখা যায়। প্রথম কক্ষ জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত। এইজন্য ইহাকে গণপরিষদ (Popular House) বলে। দ্বিতীয় কক্ষ জনসাধারণের ভোটের ভিত্তিতে গঠিত হয় না। বিভিন্ন দেশে ইহার গঠন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। ভারতবর্ষের রাজ্যসভার ১২ জন মনোনীত সদস্য ব্যতীত সকলেই রাজ্যের আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত। আবার, ইংল্যাণ্ডের হাউস্ অফ লর্ডস (House of Lords) প্রধানতঃ বংশানুক্রমিক নীতির ভিত্তিতে সংগঠিত।

দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থার সপক্ষে যুক্তি :

শুধু একটি কক্ষ থাকিলে মুহূর্তের আবেগে হঠাৎ অচিন্তিত ও অপরিণত আইন প্রণয়নের সম্ভাবনা থাকে। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থায় দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের দ্বারা অনুমোদিত বিল আলোচনা করে। ইহাতে যে কালক্ষেপ হয় তাহাতে বিলটির দোষত্রুটি ধরা পড়ে। ফলে শেষ পর্যন্ত যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাহা হয় সুচিন্তিত ও বিবেচনাপ্রসূত।

দ্বিতীয়তঃ, শুধু একটি কক্ষ থাকিলে আইনসভার স্বৈরাচার সৃষ্টি হইতে পারে। দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থায় দ্বিতীয় কক্ষ প্রথম কক্ষের ক্ষমতাকে সংযত ও প্রতিহত করিয়া আইনসভার স্বৈরাচার হইতে নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে।

তৃতীয়তঃ, কোন বিল সম্পর্কে সচেতন জনমত সংগঠনের জন্য দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োজন। কোন বিল প্রথম কক্ষে গৃহীত হইবার পর আলোচনার জন্য দ্বিতীয় কক্ষে যায়। ইহার ফলে, জনসাধারণ বিলটি সম্পর্কে আলোচনা ও চিন্তা করিবার সময় পায় এবং তাহাদের সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। প্রথম কক্ষ সমগ্র জনসাধারণের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়, এবং দ্বিতীয় কক্ষ অংশগুলির স্বার্থের

প্রতিনিধিত্ব করে। এইভাবে আইনসভায় কেন্দ্রাভিমুখী ও কেন্দ্রবিমুখ শক্তির সমন্বয় সম্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থায় বিভিন্ন শ্রেণীগত স্বার্থ (যেমন শ্রমিক স্বার্থ) আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব করিবার সুযোগ পায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদে তাঁহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শিক্ষকগণ কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারেন।

দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থার বিপক্ষে যুক্তি :

বিখ্যাত ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ ল্যাস্কি প্রভৃতি কয়েকজন লেখক দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থার বিরোধী। ল্যাস্কি বলেন যে, কোন আইনই আজ মুহূর্তের আবেগে রচিত হয় না। প্রত্যেকটি আইনই সুদীর্ঘ আলোচনার ফল। সুতরাং বিলম্ব ঘটাইবার জন্য দ্বিতীয় কক্ষের কোন প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় কক্ষ থাকার জন্য সরকারের প্রচুর অর্থের অপচয় ঘটে। এই অর্থ উন্নতিমূলক কার্যে ব্যয় করা যায়।

তৃতীয়তঃ, দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থা জরুরী নীতি গ্রহণের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত নয়। জাতীয় সঙ্কটের সময় দ্রুত আইন প্রণয়নের একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ থাকার জন্য প্রথম কক্ষ সত্বর আইন প্রণয়ন করিতে পারে না।

দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে উপরোক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও ইহা প্রায় প্রত্যেক দেশেই স্থায়ী ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের আইন জনসাধারণের উপর সুদূর-প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। একাধিক আলোচনাসভা বা আইনসভা থাকিলে আইনে ভুলত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে। ফাইনারের (Finer) মতে ইহাই দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থার পক্ষে প্রধান যুক্তি।

কিন্তু দ্বিতীয় কক্ষ বংশগত নীতির ভিত্তিতে (যেমন, ইংল্যাণ্ডের হাউস্ অফ লর্ডস) সংগঠিত হইলে ইহার মর্যাদা ও প্রভাব হ্রাস পায়। দ্বিতীয় কক্ষের গঠন শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহাতে দ্বিতীয় কক্ষ আইন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সক্রিয় ও সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে।

ভারতবর্ষে দ্বিকক্ষযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। পার্লামেণ্টের দুইটি কক্ষ আছে, লোকসভা (House of the People) ও রাজ্যসভা (Council of State)। লোকসভার সদস্যরা সাধারণ ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত। রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির মনোনীত ১২ জন সদস্য ছাড়া সকলেই রাজ্যের আইনসভা-সমূহের নিম্নকক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত। অর্থকরী

আইন ছাড়া সমস্ত ব্যাপারে উভয় পরিষদের ক্ষমতা একরূপ। অর্থকরী আইনের ব্যাপারে লোকসভার ক্ষমতাই বেশী। উপরন্তু, মন্ত্রিসভা শুধুমাত্র লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবে। রাজ্যসভার নিকট উহার কোন দায়িত্ব নাই।

শাসন-বিভাগ (Executive) :

আইনপ্রণয়ন-বিভাগ আইন প্রণয়ন করে, এবং ঐ প্রণীত আইনগুলিকে যাহাতে জনসাধারণ মানিয়া চলে তাহার ব্যবস্থা যে বিভাগ করে তাহাকে শাসন-বিভাগ বলে। শাসন-বিভাগ জনসাধারণকে রাষ্ট্রের আইনগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য করে। ব্যাপক অর্থে রাষ্ট্রের প্রকৃত কর্মকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সরকারী কর্মচারী সকলেই এই বিভাগের অন্তর্গত।

কার্যাবলী (Functions) :

১। **আভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা :** এই কার্যের দ্বারা শাসন-বিভাগ রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা, নিম্নপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ, জরুরী অবস্থায় আইন জারী করা প্রভৃতি কাজ করে। এই কাজ সম্পাদিত হয় স্বরাষ্ট্র বিভাগ নামে এই বিভাগের একটি অংশের দ্বারা।

২। **আন্তঃরাষ্ট্র কার্যাবলী :** শাসন-বিভাগ অপর রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি, দূত প্রেরণ, কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন প্রভৃতি কার্য করিয়া থাকে। এই কার্য করে আন্তঃরাষ্ট্র বিভাগ।

৩। **যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা :** শাসন-বিভাগ কেবলমাত্র রাষ্ট্রের মধ্যে শান্তিরক্ষা করে তাহা নহে, রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর হাত হইতেও রক্ষা করে। এইজন্য সরকারকে সৈন্যবাহিনী সংগঠন করিতে হয়।

৪। **অর্থসংক্রান্ত কার্য :** শাসন-বিভাগ এই কার্য দ্বারা সরকারের কর সংগ্রহ, ব্যয় ও হিসাব পরীক্ষা করে।

৫। **আইন প্রণয়ন কার্য :** রাষ্ট্রের প্রধান যে কর্মকর্তা শাসন-বিভাগের শীর্ষে থাকেন, তাঁহার সম্মতি না পাইলে কোন নিয়ম আইন বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না। শাসন-বিভাগ আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করে ও স্থগিত রাখে। আইনসভার অধিবেশন চলিতে না থাকিলে শাসন-বিভাগ অস্থায়ী জরুরী আইন তৈয়ারী করিতে পারে।

শাসন-বিভাগের সংগঠন (Organisation of the Executive) :

শাসন-বিভাগ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংগঠিত হয়। আমেরিকায় রাষ্ট্রপতির শাসন প্রচলিত আছে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন। তিনি জনসাধারণের দ্বারা নির্দিষ্টকালের জন্য (৪ বৎসর) নির্বাচিত। আইনসভার নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। সমস্ত শাসন-ক্ষমতা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকে। তাঁহার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য এক মন্ত্রিসভা থাকে। এই মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত একদল পরামর্শদাতা। তাঁহারা আইনসভার সভ্য নহেন। আইনসভার বিতর্কে তাঁহারা যোগদানও করেন না। তাঁহারা রাষ্ট্রপতিকে বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ দেন, কিন্তু ইহা গ্রহণ বা বাতিল করা সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছাধীন।

পার্লামেন্টারী ব্যবস্থায় নামসর্বস্ব শাসক ও প্রকৃত শাসক উভয়ই দেখা যায়। যেমন ইংল্যাণ্ডে রাজা যদিও আইনগত প্রধান শাসক, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিসভার হাতে। মন্ত্রিসভাই প্রকৃত শাসক। মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য, এবং তাঁহাদের নীতি ও কর্মপন্থার জন্য আইনসভার নিকট দায়ী। আইনসভার আস্থার উপর তাঁহারা নির্ভরশীল। মন্ত্রিসভার অধিনায়ককে প্রধান মন্ত্রী বলে। প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে কার্য ও দায়িত্ব ভাগ করিয়া দেন এবং বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেন। প্রধান মন্ত্রীই আইনসভার নেতা। তিনি সাধারণতঃ আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারূপে নামসর্বস্ব শাসকের নির্দেশে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

মন্ত্রীদের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একদল স্থায়ী সরকারী কর্মচারী (Civil Servants) বা রাষ্ট্রভৃত্য থাকেন। তাঁহারা নিরপেক্ষভাবে সরকারী কার্য সম্পাদন করেন। সমাজতান্ত্রিক পটভূমিকায় আধুনিক রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিশেষ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্থায়ী কর্মচারীদের গুরুত্ব, সংখ্যা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সাধারণতঃ রাষ্ট্রভৃত্য নিয়োগ পরিষদ (Public Service Commission) দ্বারা পরিচালিত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা এই সব কর্মচারীদিগকে নিয়োগ করা হয়। নির্দিষ্ট কার্যকালের পূর্বে কেবলমাত্র নামসর্বস্ব শাসকই তাঁহাদের পদচ্যুত করিতে পারেন।

বিচার-বিভাগ (Judiciary) :

কার্যাবলী (Functions) : এই বিভাগের প্রধান কার্য প্রচলিত

আইনের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ করা এবং রাষ্ট্রের আইন-অমান্যকারীদের শাস্তি দেওয়া। কিন্তু কেবলমাত্র বিচার করা এবং আইনের অর্থ বিশ্লেষণ করা ছাড়া আরও অনেক কার্য এই বিভাগ সম্পাদন করিয়া থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় বিচার-বিভাগ সংবিধানের নীতিগুলির যথাযথ ব্যাখ্যার দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার সীমা নির্দেশ করে।

আজকাল প্রায় সকল দেশেই লিখিত সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার (fundamental rights) দেওয়া হয়। বিচার-বিভাগ এই অধিকারগুলি সংরক্ষিত করে।

কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারপতিরা প্রচলিত আইনের সাহায্যে বিচারের মীমাংসা না করিতে পারিলে নিজেদের বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে মীমাংসা করেন। এই সকল বিচারের নির্দেশগুলি বিচারকদের দ্বারা প্রণীত আইন (Judge-made laws) বলিয়া পরিচিত হয়।

বিচার-বিভাগের কার্যগুলি আধুনিককালে বিস্তৃত হওয়ার ফলে উপরোক্ত কার্যগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশেষ কার্য বিচার-বিভাগকে করিতে হয়। নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা, দেউলিয়া ব্যক্তি বা কোম্পানীর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করা এই বিভাগের কার্য।

বিচার-ব্যবস্থার স্বাধীনতা (Independence of the Judiciary) :

কর্মকুশল ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থার উপর নাগরিকের কল্যাণ নির্ভর করে। প্রায় সব দেশেই শাসন-বিভাগ বিচারকদিগকে নিযুক্ত করে। কারণ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে, শাসন-বিভাগ বিচারকের গুণাগুণ বিচার করিতে বিশেষ সক্ষম। বিচারকদের নিরপেক্ষতা তাঁহাদের কার্যকালের স্থায়িত্বের উপর নির্ভর করে। স্বল্পকালের জন্য নিযুক্ত হইলে তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে কোন রায় দিতে চাহিবেন না। কারণ তাঁহারা ধারণা করিতে পারেন যে, সরকারের বিরুদ্ধে রায় দিলে তাঁহাদের পুনর্নিয়োগ ঘটিবে না। সুতরাং, সুদীর্ঘকালের জন্য বিচারপতিদের নিযুক্ত করা উচিত। অসদাচরণ ও অযোগ্যতা প্রমাণিত না হইলে তাঁহাদের অপসারিত করা উচিত নয়। তাঁহাদের অপসারণ বিশেষ পদ্ধতিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহা না হইলে তাঁহাদের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটিবে। বিচার-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতার

জন্য বিচারকদের নির্দিষ্ট ও উপযুক্ত বেতন দেওয়া উচিত। তাঁহাদের বেতন স্বল্প হইলে বিচার-ব্যবস্থায় দুর্নীতি দেখা দিতে পারে।

শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগকে স্বতন্ত্র রাখা উচিত। ল্যাস্কি বলেন যে, নিরপেক্ষতাই বিচার-ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বিচার-বিভাগের উপর শাসন-বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থাকিলে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভব নয়।

প্রশ্নাবলী

1. Describe the functions of the different organs of a modern government.

(আধুনিক সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর।)

(পৃঃ ২১১-২১২, ২১৫ ও ২১৬-২১৭ দেখ)

2. Are you an advocate of the bicameral legislature? If so, why so; if not, why not? State your reasons fully.

(দ্বিপরিষদীয় আইনসভা তুমি সমর্থন কর কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত লিখ।)

(পৃঃ ২১৩-২১৪ দেখ)

3. Discuss the reasons for the existence of the bicameral system of legislature.

(দ্বিপরিষদীয় আইনসভার অস্তিত্বের কারণ নির্দেশ কর।) (পৃঃ ২১৩-২১৪ দেখ)

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষমতা পৃথকীকরণ

(Separation of Powers)

ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি (Principle of Separation of Powers):

সরকারী ক্ষমতায় পৃথকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অ্যারিস্টটল, সিসেরো প্রমুখ প্রাচীন লেখকেরা অনুভব করিয়াছিলেন। তবে সুসম্বদ্ধ নীতি হিসাবে ফরাসী লেখক মন্টেস্কুই সর্বপ্রথম বিষয়টিকে পরিবেশন করেন।

এই নীতি অনুসারে সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগ নিজস্ব এলাকার মধ্যে

সীমাবদ্ধ থাকিবে; এবং এই এলাকার মধ্যে বিভাগটি সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে। একটি বিভাগ অন্য একটি বিভাগের ক্ষমতাকে প্রতিহত করিবে। ইহার ফলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারিবে না। সরকারী স্বৈরাচারের পথ রুদ্ধ করিয়া নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করা ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রধান উদ্দেশ্য।

সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে কোন লোক বা লোকগোষ্ঠীর হস্তে অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকিলে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার ঘটে। সমস্ত সরকারী ক্ষমতা যদি এক বা একাধিক ব্যক্তির হস্তে ন্যস্ত থাকে তাহা হইলে সরকারী স্বৈরাচারের সৃষ্টি হয় এবং নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা ব্যাহত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী লেখক মণ্টেস্কু (Montesquieu) বলেন যে আইন প্রণয়ন ও শাসন বিষয়ক ক্ষমতা যখন কোন লোকগোষ্ঠী বা ব্যক্তির হস্তে কেন্দ্রীভূত হয়, তখন ব্যক্তিস্বাধীনতা থাকিতে পারে না। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের ফলে জনসাধারণের মধ্যে এই ভীতি সঞ্চারিত হয় যে একই লোক বা লোকগোষ্ঠী অত্যাচারমূলক আইন প্রণয়ন করিয়া অত্যাচারীর মত শাসন করিতে পারে। আইন-পরিষদ ও শাসন-বিভাগ হইতে বিচার ক্ষমতাকে পৃথক না করিলে স্বাধীনতা থাকিবে না। শাসন-বিভাগের উপর যদি বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইলে বিচার কখনই নিরপেক্ষ হইতে পারে না। যে শাসনকর্তা লোককে গ্রেপ্তার করে সেই যদি আবার বিচার করে তাহা হইলে বিচার প্রহসনে পর্যবসিত হইবে এবং নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব হইবে। এই কারণে মণ্টেস্কু সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতা পৃথক করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

সমালোচনা ঃ

প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, পরিপূর্ণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ সম্ভব নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—যেমন, জরুরী অবস্থায় প্রায় সব দেশেই শাসনকর্তৃপক্ষকে স্বল্পমেয়াদী আইন (ordinance) প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। আমেরিকার শাসনব্যবস্থা পৃথকীকরণ নীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত। কিন্তু আমেরিকায়ও ইহার সম্পূর্ণ প্রয়োগ সম্ভব হয় নাই। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, রাষ্ট্রপতি কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন করিতে পারেন, কিন্তু আমেরিকার

আইনসভার উচ্চ পরিষদ সেনেটের সম্মতি লাভ না করিলে ইহা কার্যকরী হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই নীতির সম্পূর্ণ প্রয়োগ কাম্য নয়। পরিপূর্ণ ক্ষমতা পৃথকীকরণ বিভাগীয় মনোভাবের (departmentalism) সৃষ্টি করে এবং ইহার ফলে সরকারী দক্ষতা হ্রাস পায়। প্রত্যেক বিভাগ যদি শুধুমাত্র নিজের সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে এবং অন্যান্য বিভাগের সহিত সহযোগিতা না করে তাহা হইলে সরকারী কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না। বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সহযোগিতার দ্বারা সরকারী ব্যবস্থায় দক্ষতার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়তঃ, আধুনিক লেখকেরা (ফাইনার প্রভৃতি) ক্ষমতার পৃথকীকরণের দ্বারা স্বাধীনতা রক্ষা করার প্রয়োজনকে স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে সুদৃঢ় দলপ্রথাই (Organised Party system) সরকারী স্বৈরাচার সৃষ্টিতে বাধা দিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ করা হয় নাই। কিন্তু সেখানে শক্তিশালী বিরোধীদলের অস্তিত্ব স্বেচ্ছাচারিতার হাত হইতে সকলকে রক্ষা করে।

চতুর্থতঃ, এই নীতি প্রত্যেক সরকারী বিভাগের সমান ক্ষমতা দাবী করে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশে আইনসভার ক্ষমতাই সর্বাধিক। একমাত্র আইনসভাই জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত ও জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে।

গুরুত্ব : ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতিকে বর্তমানে অপরিহার্য বলিয়া স্বীকার করা হয় না। কিন্তু ইহার কিছুটা মূল্য আছে। শাসন ব্যবস্থা ও আইন পরিষদের নিয়ন্ত্রণ হইতে বিচার-বিভাগকে সর্বদা স্বাধীন রাখা উচিত। বিচার-বিভাগের নিরপেক্ষতার উপর নাগরিকের ব্যক্তিস্বাধীনতা নির্ভর করে। বিচার-বিভাগের উপর শাসন-বিভাগ বা আইন-পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব থাকিলে বিচার-বিভাগের পক্ষে এই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির প্রয়োগের দ্বারা সরকারের প্রত্যেক বিভাগের কার্য-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যখন একটি বিভাগ প্রধানতঃ একটি কার্যে নিযুক্ত থাকে, তখন সেই বিভাগের বিশেষীকরণ (specialisation) হয়। ফলে ইহার কার্য-দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

উপসংহার :

প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্রেই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের প্রচেষ্টা দেখা যায়।

ইহার ফলে সরকারী ক্ষমতার উত্তরোত্তর কেন্দ্রীকরণ ঘটিয়াছে। কিন্তু অনেক রাষ্ট্রে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি গ্রহণ করা সত্ত্বেও ক্ষমতার এই কেন্দ্রীকরণের ফলে সরকারী স্বৈরাচারের সৃষ্টি হয় নাই। বলিষ্ঠ, সুসংগঠিত দলপ্রথা উদ্ভবের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে।

ভারতবর্ষে, আমেরিকায় ও ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির কার্যকারিতা : (The extent of separation of powers in the constitutions of India, U. S. A. and England) :

ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতাগণ ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি স্বীকার করেন নাই। মন্ত্রীরা আইনসভার সদস্য, এবং তাহাদের নীতি ও কার্যের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের প্রধান শাসক বা রাষ্ট্রপতি স্বল্পমেয়াদী আইন প্রণয়ন করিতে পারেন। সুতরাং, শাসন-বিভাগেরও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আছে। পূর্বে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে শাসন ও বিচার ক্ষমতা সন্নিবিষ্ট ছিল। ভারতের নূতন সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles of State Policy)-সমূহের একটি নীতি হইল—শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করা হইবে। এই নীতি অনুসারে বিভিন্ন রাজ্যে (যেমন অন্ধ্র, মাদ্রাজ প্রভৃতি) শাসন-বিভাগ হইতে বিচার-বিভাগকে পৃথক' করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আংশিক প্রয়োগ স্বীকৃত হইয়াছে।

আমেরিকার সংবিধানে এই নীতির বিশিষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়। সংবিধানের রচয়িতারা মন্টেস্কুর মতবাদের দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলেন। সমস্ত আইন-বিষয়ক ক্ষমতা আমেরিকার আইনসভা কংগ্রেসের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে; শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে এবং বিচারক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হস্তে ন্যস্ত করা হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি আইনসভার সদস্য নন, এবং আইনসভার নিকট তাঁহার কোন দায়িত্ব নাই। সুতরাং, আমেরিকার সংবিধানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ক্ষমতা পৃথক করা হইয়াছে। কিন্তু সংবিধানের রচয়িতাগণ এই নীতি সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিতে সক্ষম হন নাই। আমরিকার সংবিধানে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষমতা দুইটি বিভাগ যুক্তভাবে ব্যবহার করে। যেমন, পররাষ্ট্রের সহিত চুক্তি সম্পাদন সম্পর্কিত

ক্ষমতা কংগ্রেস ও রাষ্ট্রপতির মধ্যে বিভক্ত। কংগ্রেসকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসের নিকট বাণী (Message) প্রেরণ ও কংগ্রেসে গৃহীত কোন বিলকে বাতিল (Veto) করিয়া দেওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিও কিছুটা আইন সম্পর্কিত ক্ষমতা ভোগ করেন।

ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি প্রয়োগ করা হয় নাই। মন্ত্রিসভার সদস্যরা আইনসভা বা পর্লামেণ্টের সদস্য, এবং তাঁহাদের নীতির জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী। ইংল্যাণ্ডে মন্ত্রিসভাই পার্লমেণ্টের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। আবার, আইনসভা মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে পারে। ইংল্যাণ্ডে আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ বা হাউস অব্ লর্ডস্ আবেদন করিবার সর্বশেষ আদালত। সুতরাং আইন, শাসন ও বিচারের ক্ষমতার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা হয় নাই। ইংল্যাণ্ডে শাসনব্যবস্থার দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ব্যক্তিস্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির পূর্ণ প্রয়োজন হয় নাই। ইংল্যাণ্ডে বলিষ্ঠ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য, বিরোধীদলের উপযুক্ত ভূমিকা এবং জনসাধারণের সচেতনতা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

প্রশ্নাবলী

1. Give a critical estimate of the theory of Separation of Powers.

(ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির আলোচনা কর।) (পৃঃ ২২১-২২২)

2. Explain the doctrine of Separation of Powers. What are its limitations?

(ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির ব্যাখ্যা কর। এই নীতির ত্রুটিগুলি কি?) (পৃঃ ২১৮-২২০)

3. State the extent of Separation of Powers in the Constitutions of the U. S. A. and India.

(ভারতবর্ষ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির কার্যকারিতা বিবৃত কর।)
(পৃঃ ২১৮-২২০ দেখ)

নবম অধ্যায়

নাগরিকতা (Citizenship)

নাগরিকের সংজ্ঞা (Definition of a citizen) :

ব্যুৎপত্তিগত অর্থে নাগরিক কথাটির দ্বারা বুঝায় কোন নগরের অধিবাসী। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নাগরিক কথাটি এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত না হইয়া আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা বিচার করিলে বুঝা যায় যে, নাগরিক কথাটি চলিয়া আসিয়াছে গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের যুগ হইতে। ক্ষুদ্রায়তন গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা সক্রিয় ও প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণ করিত তাহাদের নাগরিক বলা হইত।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহ বৃহদায়তন। সুতরাং বর্তমানে নাগরিকদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। এইজন্য শাসনকার্যে সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ বর্তমানে নাগরিকতার ভিত্তি নয়। নাগরিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য। আনুগত্যের অর্থ হইল যে, রাষ্ট্রের নীতি ও আদর্শের প্রতি নাগরিকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আছে, এবং রাষ্ট্রের সংকটের সময় সে রাষ্ট্রকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবে। নাগরিক রাষ্ট্র-স্বীকৃত সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি সে কতকগুলি কর্তব্য পালন করে। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন এক রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার উপভোগ করে ও রাষ্ট্রের প্রতি কতকগুলি কর্তব্য পালন করে তাহাকে ঐ রাষ্ট্রের নাগরিক বলে।

নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (Distinction between Citizens and Aliens) :

সাধারণতঃ রাষ্ট্রের অধিবাসীদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—নাগরিক ও বিদেশী। যে রাষ্ট্রের যাহারা নাগরিক তাহারা সেই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য দেখাইবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রে যাহারা বিদেশী বলিয়া পরিচিত তাহারা সেই

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে না। বিদেশীদের আনুগত্য অন্য রাষ্ট্রের প্রতি। যেমন, ভারতবর্ষে যে সমস্ত আমেরিকান বসবাস করেন, তাঁহাদের আনুগত্য আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি, ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রতি নয়।

দ্বিতীয়তঃ, কোন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ ঐ রাষ্ট্রের সমস্ত সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে, কিন্তু ঐ রাষ্ট্রে যে সমস্ত বিদেশী বসবাস করে তাহারা শুধুমাত্র সামাজিক অধিকারগুলি ভোগ করিতে পারে। বিদেশী কোনরূপ রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করিতে পারে না। যেমন, ভোটাধিকার, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার এবং সরকারী পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার সাধারণতঃ বিদেশীদের থাকে না।

বিদেশী ও নাগরিকের মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। উভয়েই যে রাষ্ট্রে বাস করে সে রাষ্ট্রের সাধারণ আইন মান্য করিতে বাধ্য থাকে।

নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি (Methods of acquisition of Citizenship) :

নাগরিকদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, জন্মসূত্রে নাগরিক বা স্বাভাবিক নাগরিক (Citizen by birth or Natural Citizen) এবং গৃহীত নাগরিক (Naturalised Citizen)। স্বাভাবিক নাগরিকতা অর্জনের নীতি দুই প্রকার—জন্মভূমি সূত্রে (Jus Soli) এবং জন্মসূত্রে (Jus Sanguinis)। প্রথম নীতি অনুসারে, শিশু যে রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে সে সেই রাষ্ট্রেরই নাগরিক হইবে। এই ক্ষেত্রে শিশুর পিতামাতার নাগরিকতা বিচার করার প্রয়োজন হয় না। তাহারা নাগরিক হউক বা বিদেশী হউক, শিশু তাহার জন্মস্থান অনুসারে নাগরিকতা অর্জন করিবে। এই নীতি অনুসারে, কোন ভারতীয় দম্পতির সন্তান যদি ইংল্যাণ্ডে ভূমিষ্ঠ হয় তাহা হইলে তাহাকে ইংল্যাণ্ডের নাগরিকতা দেওয়া হইবে।

দ্বিতীয় নীতি অনুসারে, শিশু যে কোন রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, তাহার নাগরিকতা নির্ভর করে পিতামাতার নাগরিকতার উপর। পিতামাতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক সে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে গণ্য হইবে। যেমন, ভারতীয় নাগরিকতা আইন অনুসারে ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান অন্য রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিলেও সে ভারতবর্ষের নাগরিক হইবে।

উপরোক্ত দুইটি নীতি ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের অনুমোদনক্রমে সেই রাষ্ট্রের

নাগরিকতা অর্জন করা যায়। একজন বিদেশী কয়েকটি সর্ত পালন করিলে নূতন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে। নিম্নলিখিত উপায়ে কোন বিদেশী অপর এক রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করিতে পারে :—

(ক) কোন বিদেশী মহিলা অপর এক রাষ্ট্রের নাগরিককে বিবাহ করিয়া সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হইতে পারে ;

(খ) কোন কোন রাষ্ট্রে নিয়ম আছে যে, কোন বিদেশী সেই রাষ্ট্রের সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত হইলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে গৃহীত হয় ;

(গ) কোন বিদেশী একযোগে কয়েক বৎসর একটি রাষ্ট্রে বাস করিলে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে গৃহীত হইতে পারে। গ্রেট ব্রিটেনে নাগরিক-রূপে স্বীকৃতি পাইবার জন্য কোন বিদেশীকে অন্ততঃ পাঁচ বৎসরকাল বাস করিতে হয়।

নাগরিকতার বিলুপ্তি (Loss of Citizenship) :

বিভিন্ন পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটে। কেহ বিদেশী সরকারের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলে বা নিজ রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী হইতে পলায়ন করিলে (desertion from military service) তাহার নাগরিকতার বিলুপ্তি ঘটিতে পারে। কোন মহিলা একজন বিদেশীকে বিবাহ করিলে সে তাহার নিজ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার হারায় এবং স্বামীর দেশের নাগরিকতা অর্জন করে। কোন নাগরিক যদি বহুদিন যাবৎ স্বরাষ্ট্রে অনুপস্থিত থাকে তাহা হইলে তাহার নাগরিক অধিকার আর থাকে না।

নাগরিক অধিকার বিলুপ্তির সর্বাপেক্ষা প্রচলিত পদ্ধতি হইল কোন ব্যক্তির পক্ষে স্বরাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া অন্য রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়া। অতীতে নাগরিক অধিকারের এই পরিবর্তন স্বীকৃত হইত না। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে কোন ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত নাগরিকতা পরিবর্তনের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়।

প্রশ্নাবলী

1. Define a Citizen and distinguish between a Citizen and an Alien. How is citizenship acquired ?

(নাগরিকের সংজ্ঞা কি? নাগরিক ও বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। নাগরিকতা লাভের পদ্ধতি কি?) (পৃঃ ২২৩-২২৫ দেখ

2. D'stinguish between a Natural Citizen and a Naturalised Citizen.
স্বাভাবিক নাগরিক ও গৃহীত নাগরিকের মধ্যে পার্থক্য কি ?) (পৃঃ ২২৫-২২৭ দেখ)

দশম অধ্যায়

সুনাগরিকতার অন্তরায়
(Hindrances to Good Citizenship)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের ভূমিকা :

প্রাচীন কালে রাজাই যখন রাজ্যের সর্বস্ব ছিলেন, তখন রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে সাধারণ মানুষের কোন ভূমিকা ছিল না। ফলে, রাজা ভাল হইলে রাষ্ট্র ভাল হইত, রাজা খারাপ হইলে রাষ্ট্রও খারাপ হইত। ইতিহাসের বিবর্তনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে রাষ্ট্রশক্তি জনগণের হস্তগত হইয়াছে। বর্তমান কালের গণতন্ত্রে রাজার আসনে বসিয়াছে জনসাধারণ। ফলে, এখনকার কালের রাষ্ট্রে জনগণ ভাল হইলে রাষ্ট্র ভাল, জনগণ খারাপ হইলে রাষ্ট্রও খারাপ।

নাগরিকের যোগ্যতার উপরেই বর্তমান রাষ্ট্রের সাফল্য নির্ভর করে। রাষ্ট্রের পক্ষপুটচ্ছায়ে অধিকার ভোগ ও বিনিময়ে কর্তব্য সম্পাদনের মধ্য দিয়া নাগরিকের সত্তার উপলব্ধি ঘটে। অতএব, সার্থক নাগরিক তাহাকেই বলা যায়, যে অধিকার সম্পর্কে সচেতন এবং কর্তব্য সম্পাদনে তৎপর। বিখ্যাত ইংরাজ লেখক লর্ড ব্রাইসের মতে, ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধি, সংযম এবং বিবেচনা নাগরিক জীবনকে সার্থক করিয়া তোলে।

সুনাগরিকের গুণাবলী (Qualities of a Good Citizen) :

সুনাগরিকত্বের প্রথম প্রয়োজন বুদ্ধির প্রাখর্য। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় নাগরিককে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিতে হয়। রাষ্ট্রের কাঠামো ও কার্যাবলী বর্তমানে জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। এই জটিল রাষ্ট্র-

ব্যবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে নাগরিককে বিশেষ বুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে। সরকারী ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হইতেছে, রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন্‌টিকে সমর্থন করা উচিত ইত্যাদি সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থায় নাগরিকের অংশগ্রহণের সার্থকতা নির্ভর করে তাহার বিচার বিবেচনার সামর্থ্যের উপর।

দ্বিতীয়তঃ, আত্মসংযম সুনাগরিকত্বের অন্যতম নিদর্শন। অসংযত ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই অকল্যাণকর। সমাজ-জীবনের পরস্পর নির্ভরশীলতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া নাগরিকের নিজস্ব ব্যবহার সংযত করা উচিত। সামগ্রিক জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থ বিসর্জন দিতে হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রভাবে অনেক ক্ষেত্রে নাগরিকের শুভবুদ্ধি বিপন্ন হয় এবং ব্যক্তি অসংযত আচরণের দ্বারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বিঘ্নিত করে। ব্যক্তিগত চরিত্রের সংযম রাষ্ট্রকল্যাণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তিই সুনাগরিক। নাগরিকের সততা ও সত্যনিষ্ঠা রাষ্ট্রের অলঙ্কার স্বরূপ। অন্যায় আচরণ, অহেতুক মিথ্যাভাষণ, উৎকোচ গ্রহণ ও প্রদান ইত্যাদি নানাবিধ প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত হইলেই নাগরিক রাষ্ট্রের প্রকৃত অংশগ্রহণকারী রূপে পরিগণিত হয়। সুনাগরিকতার মুখ্য উদ্দেশ্য সততার সহিত নাগরিক দায়িত্ব সম্পাদন।

সুনাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক ঃ

ব্যক্তি চরিত্রের সমুন্নতিতে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়; ব্যক্তি চরিত্রের দোষে রাষ্ট্রও দোষদুষ্ট হয়। অধিকার ও কর্তব্য-বোধের সমন্বয়ে নাগরিকের সার্থকতা। ব্যক্তিচরিত্রের কতকগুলি দোষের ফলে নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া পড়ে। এই দোষগুলিই সার্থক নাগরিকতার পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নাগরিক-ভিত্তিক বলিয়া নাগরিক চরিত্রের ত্রুটিগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিক জীবনের সার্থকতার পথে প্রতিবন্ধকগুলি লর্ড ব্রাইসের মতে—(ক) ঔদাসীন্য, (খ) স্বার্থপরতা ও (গ) দলীয় মনোভাব।

(ক) **ঔদাসীন্য (Indolence) ঃ** রাষ্ট্র-সচেতনতা নাগরিকের মহত্তম গুণ। এই গুণটির অভাব, তাই, নাগরিক চরিত্রের প্রধানতম ত্রুটি। অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে নাগরিক উদাসীন হইলে সমগ্র রাষ্ট্রব্যবস্থা বিকল হইয়া পড়ে।

অধিকারগুলি স্বাধীনতার রক্ষাকবচ; কর্তব্যগুলি রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে অপরিহার্য। নাগরিকের সদাজাগ্রত দৃষ্টি এইগুলির দিকে নিবদ্ধ থাকিলেই গণতন্ত্র বাঁচিয়া থাকে। উদাসীন নাগরিক সর্বকালে ও সর্বদেশে একনায়কতন্ত্রকে বাঁচাইয়া রাখে।

এই ঔদাসীন্যের জন্য নাগরিক অনেক সময় তাহার মূল্যবান ভোটাধিকার ব্যবহার করে না বা সরকারী কার্যে অংশ গ্রহণ করিতে চাহে না। ইহার ফলে সু-শাসনের পরিবর্তে অদক্ষ ও স্বেচ্ছাচারী শাসন সৃষ্টি হইতে পারে।

(খ) **স্বার্থপরতা (Self-interest)**: নাগরিকের রাষ্ট্রচেতনা গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং যে নাগরিক ব্যক্তি-স্বার্থকে রাষ্ট্র-কল্যাণের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়, সে নাগরিক গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক। বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অনেক ক্ষেত্রে আত্মস্বার্থকে ছাড়িতে হয়। সাময়িক কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভে স্বার্থপর নাগরিক রাষ্ট্রের ও নিজের বিপদ ডাকিয়া আনে। কারণ, এই স্বার্থপরতার ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা নষ্ট হয় এবং স্বার্থপর নাগরিকের দুরভিসন্ধির ফলে সমস্ত নাগরিকই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(গ) **দলীয় মনোভাব (Party-spirit)**: দলীয় ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় অংশ। কিন্তু, দলস্বার্থকে রাষ্ট্র-কল্যাণের ঊর্ধ্বে স্থান দিলে রাষ্ট্র ও দল উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অস্তিত্ব দল-ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। রাজনৈতিক ও আনুষঙ্গিক কারণে দলগুলি যদি রাষ্ট্র-কল্যাণকে মুখ্য না ভাবিয়া শক্তির দ্বন্দ্বে মত্ত থাকে, তাহা হইলে জনমত বিভ্রান্ত হয়। বিশেষতঃ, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে গণতন্ত্রে যখন উন্নয়ন প্রচেষ্টা চলে, তখন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মৌলিক ঐক্য একান্ত প্রয়োজনীয়। দলস্বার্থপরতা গণতন্ত্রের পরিপন্থী।

সুনাগরিকতার প্রতিবন্ধকগুলি দূরীকরণের উপায়:

উল্লিখিত অন্তরায়গুলির আলোচনা হইতে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সহজেই বোঝা যায়। নাগরিক চরিত্রের ত্রুটিগুলির মূল উৎস রাষ্ট্র-চেতনার অভাব। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সহিত ব্যক্তির সম্পর্ক গ্রীক নগর-রাষ্ট্রে অবিচ্ছেদ্য ছিল। বর্তমান কালের বৃহদায়তন রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিক ও রাষ্ট্রের এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকা অসম্ভব। সুতরাং রাষ্ট্রব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্তমান কালের নাগরিক অবহিত না হওয়ার

ফলে গণতন্ত্র দোষদুষ্ট হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া, ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশগুলিতে দ্রুত রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তনের ফলে নাগরিক নূতন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নিজের স্থান সম্বন্ধে সজাগ হইতে পারে না। শিক্ষা ও সংস্কৃতি হইতে রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ব্যবধান থাকার ফলেই সার্থক নাগরিক সৃষ্টি হইতে পারে না। সার্থক নাগরিকতার পথে প্রতিবন্ধক দূরীকরণের উপায় হিসাবে ব্রাইস্ শাসন-ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নাগরিক জীবনের নৈতিক মানোন্নয়নের কথা বলিয়াছেন। তবে, আধুনিক কালের উপযোগী নাগরিকের প্রস্তুতির জন্য প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন রাষ্ট্র ও নাগরিকের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীরটিকে উঠাইয়া ফেলা। সম্যক্ রাষ্ট্রনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষাই এই ব্যবধানটিকে দূর করিয়া সুনাগরিক সৃষ্টি করিতে পারে।

ভারতে সুনাগরিকতার বিকাশ :

ভারতবর্ষে রাষ্ট্রনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার অভাব, জনসাধারণের দারিদ্র্য, এবং বিভিন্ন শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধ সুনাগরিকতার পথে প্রধান অন্তরায়। রাষ্ট্রনৈতিক ও সাধারণ শিক্ষার অভাবহেতু নাগরিক তাহার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয় না। ফলে, নাগরিক কার্য সম্পর্কে সে উদাসীন হয়। দারিদ্র্য ভারতীয় নাগরিকের সুনাগরিক হইবার পথে অন্যতম অন্তরায়। ভারতীয় রাজনীতি মুষ্টিমেয় লোকের বিলাসিতা মাত্র। দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষে বিভিন্ন শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত বিরোধ নাগরিকের মধ্যে স্বার্থপরতা ও দলীয় মনোবৃত্তি আনিয়া দেয়।

আশা করা যায় যে, শিক্ষার প্রসার, জনসাধারণের জীবনমানের উন্নতি এবং সখ্যভাবের সৃষ্টি ভারতীয় নাগরিককে উপরোক্ত ত্রুটিগুলির সংশোধনে বিশেষভাবে সহায়তা করিবে।

প্রশ্নাবলী

1. Explain the hindrances to good citizenship.
(সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি আলোচনা কর।) (পৃঃ ২২৭-২২৮ দেখ)
2. How far do the hindrances exist in India?
(সুনাগরিকতার অন্তরায়গুলি ভারতবর্ষে কতদূর বর্তমান? (পৃঃ ২২৯ দেখ)
3. Discuss the qualities of a good citizen.
(সুনাগরিকের গুণাবলী বর্ণনা কর।) (পৃঃ ২২৬-২২৭ দেখ)

একাদশ অধ্যায়

আইন ও স্বাধীনতা

(Law and Liberty)

আইনের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and Definition of Law) ঃ

সমাজবদ্ধ মানুষের সুন্দর ও সুশৃংখল জীবন সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করিবার জন্য রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকের জন্য কয়েকটি সাধারণ বিধি-নিয়ম সুনির্দিষ্ট করিয়া দেয়। ইহাদিগকে আইন বলে। আইন নাগরিকের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের আইন কেহ অমান্য করিলে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ তাহাকে শাস্তি দিবে। দ্বিতীয়তঃ, আইন সার্বজনীন। রাষ্ট্রের কোন নাগরিকই আইনের এলাকার বাহিরে অবস্থান করিতে পারে না। সকলেই রাষ্ট্রের আইনের অন্তর্গত।

আইনের শাসন রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। সার্বভৌমত্বের অধিকারী বলিয়া রাষ্ট্রের আইন সকলকেই মানিতে হয়। আইনের প্রকৃতি সম্পর্কে, কিন্তু, নানাবিধ ধারণা দেখা যায়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে পর্যবেক্ষণ করার ফলে বিভিন্ন লেখক আইনের স্বতন্ত্র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইংরাজ লেখক জন্ অস্টিনের নাম সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। অস্টিনের মতে আইন রাষ্ট্রের সার্বভৌমের আদেশ। সার্বভৌম সুনির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। আইন এই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। অতএব, পার্লামেণ্ট প্রণীত বিধানগুলিই আইন।

অস্টিনের এই ধারণা অনেকে গ্রহণ করেন না। বিশেষ করিয়া ক্র্যাব, ল্যাস্কি প্রভৃতি লেখকদের মতে আইন সার্বভৌমের আদেশ নয়। ইহা সার্বভৌম-নিরপেক্ষ ; অর্থাৎ, আইনের প্রকৃত উৎস রাষ্ট্র নয়। সামাজিক ন্যায়বোধই আইনের মূল উৎস। ব্যক্তির প্রয়োজন চরিতার্থ করার জন্যই

আইনের সৃষ্টি। রাষ্ট্র যে আইন প্রণয়ন করে তাহা সামাজিক প্রয়োজন ও ন্যায়বোধেরই স্বীকৃতিমাত্র।

উল্লিখিত ধারণাগুলির মধ্যে আপাত বিরোধ থাকিলেও, প্রকৃতপক্ষে, দৃষ্টিকোণের পার্থক্যের জন্যই এই বৈপরীত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। আইনের মূল উৎস সামাজিক ন্যায়বোধ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্যই আইনের সৃষ্টি। কিন্তু, এই ন্যায়বোধ নিতান্তই নৈর্ব্যক্তিক। ইহাকে সুসম্বদ্ধ রূপ দিয়া থাকে রাষ্ট্রসৃষ্ট বিধানগুলি। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ন্যায়বোধকে সুনির্দিষ্ট আইনের পর্যায়ে উন্নীত করে। অতএব, উপসংহারে বলা যায় যে, আইনের মূলগত উৎস সামাজিক ন্যায়বোধ এবং প্রত্যক্ষ উৎস রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। সামাজিক ন্যায়বোধ হইতে উৎসারিত রাষ্ট্রনির্দিষ্ট বিধানগুলিই আইন।

সামাজিক, নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আইন (Social, moral and political Laws)ঃ

সামাজিক ও নৈতিক আইনের সহিত রাষ্ট্রের আইনের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের আইন অমান্য করিলে আইন-অমান্যকারীকে শাসন-কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট শাস্তি দেয়; কিন্তু নৈতিক বা সামাজিক আইন ভঙ্গ করিলে সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয়। রাষ্ট্রিক আইন সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে বিধিবদ্ধ। কিন্তু নৈতিক আইন দেশ, কাল, সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্ন। রাষ্ট্রিক আইন নাগরিকের বহির্জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রিত করে। নৈতিক আইন নাগরিকের বিচারশক্তি, বিবেচনা ও বিবেকের উপর জোর দিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ জীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করে।

সামাজিক ও নৈতিক আইনের সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের বৈপরীত্য সত্ত্বেও মূলগত ঐক্য দেখা যায়। সমাজবদ্ধ মানুষের নৈতিক চরিত্রের সুষ্ঠু ও সামগ্রিক বিকাশের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রীয় আইনেরও প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় শাসনব্যবস্থায় অস্পৃশ্যতা দূরীকরণমূলক আইন প্রণয়ন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আইনের উৎস (Sources of Law)ঃ

১। প্রচলিত প্রথা (custom) আইনের একটি প্রাচীন উৎস।

অনেক সময় জনসাধারণ নিজেদের স্থবিধার জন্য একটি নীতি অনুসরণ করে এবং জনসাধারণ কর্তৃক বার বার গৃহীত হইলে ইহা কালক্রমে প্রচলিত প্রথার রূপ গ্রহণ করে। আদিম সমাজে প্রথা অনুসারে সমস্ত বিরোধের মীমাংসা করা হইত। প্রথা রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করিলে আইনের মর্যাদা পায়।

২। ধর্ম (religion) আইনের অন্যতম উৎস। রাষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় আইন ছিল ধর্মীয় অনুশাসনের সমষ্টি। আধুনিক ভারতেও ধর্ম হিন্দু ও মুসলমান আইনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভিত্তি।

৩। বিচারকের রায় (judicial decision) আইনের মূল্যবান উপাদান। বিচারকেরা শুধুমাত্র আইন অনুসারে মামলার মীমাংসা করেন না; তাঁহারা আইনের নূতন ব্যাখ্যা করিয়া আইনের সংস্কার সাধন করেন। স্থতরাং বিচারকের রায় আইনের অন্যতম উৎস।

৪। আইন-বিশেষজ্ঞদের আলোচনা (scientific commentaries on law) অনেক সময় নূতন আইনের উৎপত্তির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। এই আলোচনা আবার পুরাতন আইনের সংশোধনেও সাহায্য করে। আইন-বিশেষজ্ঞরা প্রাচীন ও আধুনিক আইনের উপর স্থগভীর গবেষণার ভিত্তিতে কয়েকটি নূতন নীতির প্রবর্তন করেন। এই নীতি যখন বিচারপতিরা গ্রহণ করেন তখন উহা আইন হিসাবে গণ্য হয়।

৫। ন্যায়বোধ (equity) আইনের অন্যতম উৎস। যদি প্রচলিত আইন অনুসারে কোন মামলার মীমাংসা করা সম্ভব না হয়, এবং অনেক স্থানে আইন যদি অস্পষ্ট থাকে, তাহা হইলে বিচারপতিরা তাহাদের ন্যায়বোধ অনুসারে বিচার করেন। প্রগতিশীল সমাজে আইন প্রায়ই নূতন অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে পারে না। বিচারপতিরা তাঁহাদের ন্যায়বোধ অনুসারে মামলার বিচার করিয়া পুরাতন আইনের সংশোধন ও পরিবর্তন সাধন করেন।

৬। আইনসভা (legislature) বর্তমানে আইনের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উৎস। আইনসভা জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা সংগঠিত। আইন হইল জনমতের প্রতিফলন। অতএব জনসাধারণের প্রতিনিধিদেরই আইন প্রণয়ন করা উচিত। প্রায় প্রত্যেক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভাই আইনের প্রধান উৎস।

স্বাধীনতার প্রকৃতি (Nature of Liberty) :

দুইটি দিক হইতে 'স্বাধীনতা'র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে।

প্রথমতঃ, সাধারণ অর্থে স্বাধীনতা বলিতে আমরা বুঝি মানুষের সামাজিক জীবন হইতে সমস্ত বাধানিষেধের অপসারণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে স্বাধীনতাকে 'নিয়ন্ত্রণ-বিহীনতা' আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। অর্থাৎ বাহিরের কোন নিয়ন্ত্রণের অধীন না হইয়া নাগরিকের পক্ষে ইচ্ছামত যে কোন কাজ করার নামই স্বাধীনতা। কিন্তু ইহা সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাধীনতা হইতে পারে না। তাহাকে যদি সমাজে বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে কিছু বিধিনিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করিতেই হইবে। এইভাবে সকলের স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। পরের ক্ষতি না করিয়া সব কিছু করার ক্ষমতাই হইল স্বাধীনতা ("Liberty consists in the power to do everything that does not injure others"—French Declaration of the Rights of Man)। অতএব প্রত্যেকের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সকলের স্বাধীনতার উপর প্রয়োজনীয়, ন্যায়সঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতার একটি প্রত্যক্ষ ও গভীর অর্থ আছে। যখন মানুষ তাহার সত্তার পূর্ণ উপলব্ধি করিবার সুযোগ পায় তখনই সে প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা উপভোগ করে। ল্যাস্কি বলেন যে মানুষের ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশের উপযোগী পরিবেশের সংরক্ষণই স্বাধীনতা (Liberty is "the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves")। মানুষের জীবনের সমৃদ্ধির জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা থাকা উচিত। এই সুযোগ সুবিধাকেই রাষ্ট্রনৈতিক ভাষায় 'অধিকার' (rights) বলে। অধিকার ব্যতীত স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই। কোনরূপ বৈষম্য না করিয়া সকল নাগরিককে সমান অধিকার দান করিলেই স্বাধীনতার উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়।

স্বাধীনতার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Liberty) :

স্বাধীনতার প্রকৃতি অনুসারে ইহার পাঁচটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে এই পাঁচ শ্রেণীর স্বাধীনতার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে।

নাগরিকের **ব্যক্তি-স্বাধীনতা (Civil Liberty)** বলিতে আমরা সেই স্বাধীনতাকে বুঝি যাহা সে কোন রাষ্ট্রের নাগরিকরূপে উপভোগ করে। নাগরিকের যে সমস্ত আইনস্বীকৃত অধিকার (যেমন, স্বাধীনভাবে ভাবপ্রকাশের অধিকার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি উপভোগ করিবার অধিকার প্রভৃতি) দেওয়া হয় তাহাতে অপর কোন নাগরিক বা কোন সরকারী কর্মচারী হস্তক্ষেপ করিবে না। সুনির্দিষ্ট আইনের উপযুক্ত প্রয়োগ, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য এবং মৌলিক অধিকারের সাংবিধানিক স্বীকৃতি নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে রক্ষা করে।

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার (Political Liberty) অর্থ নাগরিকের রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করিবার স্বাধীনতা। নাগরিক যখন ভোটাধিকারের দ্বারা সরকার গঠন করিতে পারে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে এবং সরকারী পদ গ্রহণ করিতে পারে তখনই সে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার ভোগ করে। ল্যাস্কির ভাষায়, রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয় হইবার ক্ষমতাকেই রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা বলে।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা (Economic Liberty):

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই যদি মানুষ দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন হইতে মুক্তি না পায়। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার পরিপূর্ণ উপভোগের জন্য অর্থনৈতিক স্বাধীনতা একান্ত প্রয়োজন। নাগরিক যখন বেকারত্ব ও অভাবের ভীতি হইতে মুক্ত হয় তখনই সে পূর্ণ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে। প্রত্যেকের উপযুক্ত বেতনে চাকুরীর ব্যবস্থা করা এবং কাজের ঘণ্টা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আধুনিক কল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare State) দায়িত্ব।

জাতীয় স্বাধীনতা (National Liberty):

যখন কোন রাজনৈতিক সম্প্রদায় বিদেশীর নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত হয় এবং সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়, তখন সেই সম্প্রদায় স্বাধীনতা অর্জন করে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পূর্বে ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা ছিল না। কিন্তু বর্তমানে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনমুক্ত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। বিদেশী নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত না হইলে অন্যান্য স্বাধীনতা (অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাধীনতা, রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা) উপভোগ করা সম্ভব নয়। অতএব জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তিতেই অন্যান্য স্বাধীনতার সৌধ নির্মাণ করা সম্ভব।

প্রাকৃতিক স্বাধীনতা (Natural Liberty) :

রাষ্ট্রসৃষ্টির পূর্বে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যে স্বাধীনতা ভোগ করিত তাহাকেই প্রাকৃতিক স্বাধীনতা বলে। সামাজিক চুক্তি মতবাদের (social contract theory) সমর্থকদের মতে তখন মানুষের সীমাহীন স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক স্বাধীনতার ধারণা ভ্রমাত্মক, কারণ রাষ্ট্রসৃষ্ট আইন ব্যতীত স্বাধীনতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্রের স্বীকৃতি ছাড়া স্বাধীনতার কোন মূল্য নাই।

আইন ও স্বাধীনতা (Law and Liberty) :

অনেক লেখকের মতে আইন ও স্বাধীনতার মধ্যে মূলগত বিরোধ আছে। একটির উপস্থিতি অপরটির অনুপস্থিতি নির্দেশ করে। মানুষকে যদি প্রতি পদক্ষেপে আইন ও নিয়মশৃঙ্খলা মান্য করিতে হয় তাহা হইলে তাহার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা কিছুই থাকে না। এই কারণে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীরা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সংকুচিত করিবার পক্ষপাতী, এবং নৈরাজ্যবাদীরা (anarchists or nihilists) রাষ্ট্রবিহীন সমাজের কল্পনা করেন।

কিন্তু নিয়ন্ত্রণবিহীন স্বাধীনতা সামাজিক মানুষের স্বাধীনতা হইতে পারে না। নিয়ন্ত্রণ বা আইন বিবর্জিত স্বাধীনতার অর্থ শুধুমাত্র বলবানের স্বাধীনতা। আইন প্রত্যেকের স্বাধীনতায় ন্যায়সঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিয়া সকলের স্বাধীনতা সমানভাবে রক্ষা করে। সুতরাং সমাজবদ্ধ মানুষের স্বাধীনতার দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আলোচনা করিলে ইহাই সুস্পষ্ট হয় যে আইন ব্যতীত স্বাধীনতা থাকিতে পারে না।

আইন স্বাধীনতাকে তিনভাবে রক্ষা করে। প্রথমতঃ, আইন প্রত্যেকের স্বাধীনতাকে অপরের হস্তক্ষেপ হইতে রক্ষা করে। নিজস্ব সম্পত্তি ভোগ করিবার স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের আছে। অপর কেহ যদি এই স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তাহা হইলে আইন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়া প্রথম ব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, আইন সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া নাগরিককে প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সাহায্য করে। নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য কয়েকটি সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার একান্ত প্রয়োজন। রাষ্ট্র আইনের দ্বারা এই সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। আইনের দ্বারা অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষার

ব্যবস্থা, শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরী নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া প্রভৃতি ব্যবস্থাগুলি নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়তা করে এবং তাহার প্রকৃত স্বাধীনতার পথ সুবিস্তৃত করে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সংবিধান বা সাংবিধানিক আইন নাগরিকের মৌলিক অধিকার নির্দেশ করিয়া সরকারী হস্তক্ষেপ হইতে নাগরিকের স্বাধীনতা রক্ষা করে। যেমন, ভারতবর্ষের সংবিধানে লিখিত আছে যে, সাধারণতঃ কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইলে তাহাকে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে নিকটবর্তী ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বিচারের জন্য উপস্থিত করিতে হইবে। অতএব, সরকার কাহাকেও বে-আইনীভাবে চব্বিশ ঘণ্টার বেশী আটক রাখিতে পারিবে না।

আইন স্বাধীনতাকে রক্ষা করে বটে, কিন্তু আইন যদি প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে তাহা হইলে আইন স্বাধীনতার পথে প্রতিবন্ধক হয়। স্বাধীনতা-বিহীন রাষ্ট্রকর্তৃত্ব ও আইন স্বৈরাচারের নামান্তর মাত্র, আইন ব্যতীত স্বাধীনতা বিশৃঙ্খলার প্রতীক। সুতরাং স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মধ্যে এমন একটি সমন্বয় বিধান করা উচিত যাহাতে মানুষ সুশৃঙ্খল সমাজব্যবস্থায় বাস করিয়া তাহার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাইতে পারে।

স্বাধীনতার রক্ষাকবচ (Safeguards of Liberty) :

স্বাধীনতা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব উন্মেষের জন্য অপরিহার্য। ইতিহাসে অসংখ্য সংগ্রাম ও গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছে। সুতরাং এই মূল্যবান স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ, মৌলিক অধিকারসমূহ লিখিত সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়। যেমন, ভারতের সংবিধানে সাত প্রকার মৌলিক অধিকারের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিষেধকরূপে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম প্রহরী। প্রত্যেক দেশেই ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব বিচার-ব্যবস্থার উপর ন্যস্ত থাকে। বিচার-ব্যবস্থার উপর সরকারী প্রভাব থাকিলে এই পবিত্র দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয় না। এইজন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। সংবিধান-বর্ণিত মৌলিক অধিকারের উপর সরকারী বা বেসরকারী হস্তক্ষেপ ঘটিলে বিচারালয়ই ব্যক্তির অধিকার রক্ষা করে।

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার পৃথকীকরণ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইহার অর্থ, সরকারী ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হইয়া তুইভাবে বিকেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠীর হাতে আইন সংক্রান্ত, শাসন সংক্রান্ত ও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে না। ইহার ফলে কেন্দ্রীয় স্বৈরাচার সম্ভব হইবে না। এই নীতির জন্য আমরা বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক মণ্টেস্কুর নিকট ঋণী। উপরন্তু, ক্ষমতার আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণও স্বাধীনতা সংরক্ষণের সহায়ক। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিলে জনসাধারণ সহজেই শাসনে অংশগ্রহণ করিতে পারে। ইহার ফলে, তাহাদের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হয়।

চতুর্থতঃ, আইনের শাসন (Rule of law) স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। ইহার অর্থ জাতি-ধর্ম-ব্যক্তি নির্বিশেষে আইনের চক্ষে সকলেই সমান। আইন ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে কোনরূপ বৈষম্য স্থাপন করিবে না। আইনের দৃষ্টিতে এই সাম্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষিত হয়।

পঞ্চমতঃ, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক ন্যায় নাগরিকের স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। সমস্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগসুবিধা যদি মুষ্টিমেয় লোকের কুক্ষিগত হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের অধিকাংশের স্বাধীনতা অর্থহীন হইয়া পড়ে। সেইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক কল্যাণরাষ্ট্রে আর্থিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করিবার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আইন এই উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক।

ষষ্ঠতঃ, সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলব্যবস্থা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজন। ইংল্যাণ্ডে ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি ও লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ না থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তার অন্যতম কারণ সুষ্ঠু দলব্যবস্থা। ইংল্যাণ্ডে বিরোধীদলের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারী কার্যকলাপের উপর সদাজাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি রাখে বিরোধী দল। ফলে, সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না এবং স্বাধীনতা অপহরণের কোন সম্ভাবনা থাকে না।

উপসংহারে বলা যায় যে, আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে স্বাধীনতা সংরক্ষণের যে কোন ব্যবস্থাই অসম্পূর্ণ। গণচেতনাই স্বাধীনতার মৌলিক রক্ষাকবচ। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও সদাজাগ্রত প্রহরাই

স্বাধীনতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারে। মানবীয় প্রেমের মত স্বাধীনতাকে প্রতিটি মুহূর্তে উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

প্রশ্নাবলী

1. Write a note on liberty and explain the different kinds of liberty.

('স্বাধীনতা' কথাটির অর্থ কি? বিভিন্ন শ্রেণীর স্বাধীনতার আলোচনা কর।)

(পৃঃ ২৩৩-৩৫ দেখ)

2. Distinguish between civil liberty and political liberty.

(নাগরিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার পার্থক্য নির্ণয় কর।) (পৃঃ ২৩৪ দেখ)

3. Indicate the relation between law and liberty.

(আইন ও স্বাধীনতার সম্পর্ক নির্দেশ কর।) (পৃঃ২৩৫-২৩৬ দেখ)

4. "Law is the condition of liberty". Elucidate.

("আইন স্বাধীনতার সর্ত"—ব্যাখ্যা কর।) (পৃঃ ২৩৫-২৩৬ দেখ)

5. What are the safeguards of liberty?

(স্বাধীনতার রক্ষাকবচগুলি কি কি?) (পৃঃ ২৩৬-২৩৮ দেখ)

দ্বাদশ অধ্যায়

নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

(Rights and Duties of Citizens)

অধিকারের স্বরূপ (Nature of Rights):

জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই প্রত্যেক মানুষের উদ্দেশ্য। কিন্তু জীবনের পূর্ণ সমৃদ্ধির জন্য কয়েকটি মৌলিক সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজন। যেমন, নিজের মত প্রকাশের সুযোগ না থাকিলে মানুষের আত্মোপলব্ধি ঘটে না। অতএব তাহাকে এই সুযোগ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্র যখন নাগরিকের এই মৌলিক

সুযোগ-সুবিধা স্বীকার করিয়া লয় তখন তাহা অধিকারের মর্যাদা পায়। প্রত্যেকটি অধিকারের দুইটি উৎস আছে: (১) মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং (২) রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। অতএব রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত মানুষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাগুলিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় অধিকার (rights) বলে। ল্যাস্কির ভাষায়, অধিকার বলিতে বুঝায় সামাজিক জীবনের সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যাহা ব্যতীত কোন মানুষ সাধারণতঃ তাহার জীবনের পূর্ণ বিকাশ ঘটাইতে পারে না (Rights are "those conditions of social life without which no man can seek, in general, to be himself at his best"—Laski)।

মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে অধিকারের উদ্ভব ঘটে। সমাজ ব্যতীত কোন অধিকার থাকিতে পারে না। প্রত্যেক অধিকারের সঙ্গে সম্পর্ক আছে সামাজিক কল্যাণের। অতএব আশা করা যায়, নাগরিক সামাজিক কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহার অধিকার ব্যবহার করিবে।

অধিকারের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Rights):

নাগরিকদের অধিকারগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

অধিকার (Rights)

- (১) নৈতিক অধিকার (Moral Rights)
- (২) আইনগত অধিকার (Legal Rights)
  - (ক) সামাজিক অধিকার (Civil Rights)
  - (খ) রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights)

নাগরিকের অধিকারগুলিকে প্রধানতঃ দুইভাগে ভাগ করা যায়—নৈতিক ও আইনগত অধিকার। নৈতিক অধিকারগুলি (Moral Rights) নাগরিকের নীতিবোধ, বিবেক ও বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ এই অধিকারগুলি নাগরিকের শিক্ষা, সামাজিক রীতি ও ধর্মীয় সংস্কার হইতে উৎসারিত। যেমন, স্ত্রী স্বামীর নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশা করে, শিক্ষক ছাত্রের নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পাইবার প্রত্যাশী। রাষ্ট্র আইনের

দ্বারা এইসব অধিকারের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে না। ব্যক্তির ও সমাজের নীতিবোধই এই অধিকারের ভিত্তি।

দ্বিতীয় প্রকারের অধিকারগুলিকে বলা যায় আইনগত অধিকার (Legal Rights)। নাগরিকের এই অধিকারগুলিকে রাষ্ট্র তাহার আইনের মাধ্যমে স্বীকার করিয়া লয়। অর্থাৎ যদি কেহ ঐ অধিকার হইতে বঞ্চিত হয় তবে রাষ্ট্র দায়ী থাকিবে। যেমন, প্রত্যেক রাষ্ট্র আইন দ্বারা স্বীকার করিয়া লয় যে প্রত্যেক নাগরিক তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে পারিবে; যদি কোন অসৎ ব্যক্তি অন্যায় ভাবে অপর ব্যক্তির সম্পত্তি হরণ করে বা সম্পত্তি ভোগে বাধা দেয়, তবে রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে অন্যায়কারীকে শাস্তি দিবে এবং প্রকৃত মালিককে তাহার সম্পত্তি ভোগ করিতে সাহায্য করিবে। আইনগত অধিকার আবার দুই প্রকারের—সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক।

সামাজিক অধিকার (Civil Rights) বলিতে সেই অধিকারগুলি বুঝায় যেগুলি ব্যতীত মানুষের সমাজজীবন সুন্দর হয় না। এইগুলি অতিশয় প্রয়োজনীয়। এইগুলি ব্যতীত সভ্যজীবন যাপন সম্ভব নহে। এইগুলির সাহায্যে নাগরিকগণ তাহাদের মানসিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহের বিকাশসাধন করিতে পারে। যথা—আপন মত প্রকাশের অধিকার, সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, বাঁচিবার অধিকার, স্বাধীনভাবে চলা-ফেরার অধিকার, চুক্তি করিবার অধিকার প্রভৃতি।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার (Political Rights) বলিতে সেই অধিকারগুলি বুঝায়, যেগুলির সাহায্যে নাগরিকগণ রাষ্ট্রের শাসন ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতে পারে। যেমন, ভোট দিবার অধিকার, ভোট প্রার্থী হইবার অধিকার, সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার প্রভৃতি।

রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারগুলি কেবল নাগরিকগণ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু বিদেশী বা বিকৃতমস্তিষ্ক বা গুরুতর অপরাধে অপরাধিগণ সেগুলি ভোগ করিতে পারে না। সামাজিক অধিকার নাগরিক, বিদেশী নির্বিশেষে সকলেই ভোগ করিতে পারে।

সামাজিক অধিকার:

প্রায় সব রাষ্ট্রেই নাগরিকদের কতিপয় সামাজিক অধিকার স্বীকার করা হয়। এই অধিকারগুলি ছাড়া নাগরিকের সত্তার পরিপূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে সামাজিক অধিকারগুলি সকলকেই দিবার ব্যবস্থা করা হয়। সেই অর্থে এই অধিকারগুলি সার্বজনীন ও সুদূরপ্রসারিত।

কয়েকটি মূল্যবান সামাজিক অধিকারের আলোচনা ঃ

জীবনধারণের অধিকার (Right to Life) ঃ

এই অধিকার সর্বাপেক্ষা মৌলিক অধিকার। জীবনের নিরাপত্তা ব্যতীত অন্যান্য অধিকার ভোগ সম্ভব নয়। জীবনের অধিকার বলিতে আমরা বুঝি রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যের আক্রমণ হইতে ও বহিঃরাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নাগরিকের জীবনরক্ষার অধিকার। এজন্য প্রত্যেকটি রাষ্ট্র নাগরিকের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অন্যের আক্রমণ হইতে নিজের জীবনরক্ষা করার অধিকারও নাগরিকের জীবনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এই অধিকার রক্ষার জন্য অনেক রাষ্ট্র আত্মহত্যার প্রচেষ্টাকে দণ্ডনীয় ঘোষণা করিয়াছে। আত্মহত্যা ব্যক্তিত্বের অবলুপ্তি ঘটায়। কিন্তু অধিকারের উদ্দেশ্য মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করা।

শিক্ষার অধিকার (Right to Education) ঃ

শিক্ষা ব্যতীত মানুষ নাগরিকতার আদর্শ উপলব্ধি করিতে পারে না। রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা, এবং নিজ অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার জন্য শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। এইজন্য বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে নাগরিকের শিক্ষার অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে।

স্বাধীনতার অধিকার (Right to Liberty) ঃ

এই অধিকার অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক তাহার মানসিক বৃত্তিকে স্বাধীনভাবে বিকশিত করিতে পারিবে, এবং সর্বত্রই বিনাবাধায় চলাফেরা করিতে পারিবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ কাহাকেও অন্যায়ভাবে বা বে-আইনী ভাবে গ্রেপ্তার করিতে বা আটক রাখিতে পারিবে না। কাহাকেও অন্যায়-ভাবে গ্রেপ্তার করিলে বা আটক রাখিলে সে আদালতে আবেদন করিতে পারিবে। বিচারপতি তখন আটক ব্যক্তিকে আদালতে আনয়নের ব্যবস্থা করেন, এবং আটক বে-আইনী মনে করিলে তাহার মুক্তির আদেশ দেন। কিন্তু যুদ্ধ বা অন্য কোন জাতীয় সংকটের সময় রাষ্ট্র নাগরিকের স্বাধীনতার অধিকারের উপর নানারূপ বাধানিষেধ আরোপ করে।

সম্পত্তির অধিকার (Right to Property) :

প্রত্যেক নাগরিক তাহার সম্পত্তি অবাধে ব্যবহার ও ভোগ করিতে পারিবে। কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক লেখকগণ সম্পত্তির অধিকারের তীব্র সমালোচনা করেন। যাঁহারা এই অধিকারের বিলুপ্তির পক্ষপাতী, তাঁহারা বলেন যে, এই অধিকারের বিলুপ্তি ব্যতীত সাম্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। কিন্তু সোবিয়েৎ রাশিয়া, নয়া চীন প্রভৃতি কয়েকটি সাম্যবাদী (কম্যুনিস্ট) রাষ্ট্র ছাড়া প্রায় প্রত্যেক দেশেই সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করা হয়। কেননা, সম্পত্তি আত্মপ্রকাশের প্রধান উপায়। ইহা মানুষকে সঞ্চয়ী ও পরিশ্রমী করিয়া তোলে।

চুক্তির অধিকার (Right to Contract) :

এই অধিকার অনুযায়ী নাগরিক অপর নাগরিকের সহিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারিবে এবং এই চুক্তির সর্ত দুই পক্ষের উপর প্রযোজ্য। চুক্তি-ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের আইন অনুসারে শাস্তি পাইবে। কিন্তু যে চুক্তি সাধারণের কল্যাণবিরোধী, তাহা রাষ্ট্র সম্পন্ন হইতে দেয় না। যেমন, দাসব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যদি কোন চুক্তি হয়, তবে রাষ্ট্র তাহা স্বীকার করে না।

ধর্মাচরণের অধিকার (Right to Worship) :

এই অধিকার অনুসারে প্রত্যেক নাগরিক তাহার ধর্মবিশ্বাস অনুসারে যে কোন ধর্ম আচরণ করিতে পারিবে। কোন নাগরিক অন্যের ধর্মাচরণে বাধা দিলে শাস্তি ভোগ করিবে। কিন্তু ধর্মের নামে কোন অসামাজিক কার্য-কলাপ কিংবা সাম্প্রদায়িক অশান্তি রাষ্ট্র দমন করিতে অবশ্যই চেষ্টা করিবে।

মতপ্রকাশ, সংবাদপত্র এবং সংঘগঠনের অধিকার (Right to freedom of Speech, Press and Association) :

মত প্রকাশের অধিকার বিশেষ মূল্যবান অধিকার। ইহা ব্যতীত নাগরিক তাহার অভাব অভিযোগ জানাইতে পারে না। গণতন্ত্রে এই অধিকারের বিশেষ গুরুত্ব আছে। মত প্রকাশের অধিকারের দ্বারাই নাগরিক সরকারের ও অন্যান্য নাগরিকের অন্যায় ও অত্যাচার হইতে নিজেকে রক্ষা করে। উপরন্তু, মত প্রকাশের অধিকার স্বীকার করিয়াই সরকার জনসাধারণের দাবীদাওয়া সম্বন্ধে জানিতে পারে। এই স্বাধীনতা না থাকিলে সরকারী নীতি

ও আইন কখনও জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী রচিত হইতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও অন্যের অধিকারের তাগিদে রাষ্ট্র নাগরিকের মত প্রকাশের অধিকারের উপর প্রয়োজনমত বাধানিষেধ আরোপ করে।

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বীকার করা হয়। সংবাদপত্র নানাশ্রেণীর মত ও সংবাদ পরিবেষণ করিয়া সচেতন জনমত সৃষ্টি করে। সুতরাং সাধারণের স্বার্থবিরোধী না হইলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর সরকারের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।

আধুনিক রাষ্ট্র বিরাট ও জটিল। এই রাষ্ট্রে কোন একজন নাগরিকের পক্ষে তাহার মতকে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। সম-মতাবলম্বী লোকের সহিত সংঘবদ্ধ হইয়াই সে তাহার মতকে সক্রিয় ও কার্যকরী করিতে পারে। সুতরাং স্বাধীনভাবে সংগঠন করিয়া ও সমবেত হইয়া মত প্রকাশের অধিকার নাগরিকের থাকা উচিত। কিন্তু যদি কোন সংঘের উদ্দেশ্য হয় রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করা, তাহা হইলে রাষ্ট্র সেই সংঘের স্বাধীনতা সংকুচিত করিতে পারিবে।

সমদর্শিতার অধিকার (Right to Equality) ঃ

এই অধিকারের অর্থ, আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ, ধনী, নির্ধন নির্বিশেষে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার করিবে না। সমদর্শিতার অধিকার ব্যতীত গণতন্ত্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রত্যেক গণতান্ত্রিক সংবিধানে এই অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রয়োজন হইলে অনুন্নত শ্রেণীর লোকদের চাকুরী সম্পর্কে বা নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা বালকদের স্বার্থরক্ষার জন্য রাষ্ট্র নানাপ্রকার বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পারে।

অর্থনৈতিক অধিকার (Economic Right) ঃ

সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন হয় যদি নাগরিকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকে। এইজন্য প্রত্যেক সক্ষম নাগরিককে যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের সংস্থান করিয়া দেওয়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য। কাজের অধিকার বলিতে আবার বুঝায়, শ্রমিকের শ্রমের উপযুক্ত মজুরী দেওয়া। উপযুক্ত মজুরী না পাইলে তাহার পক্ষে জীবনের মৌলিক প্রয়োজনগুলি মিটানো

সম্ভব নয়। শ্রমিকের উপযুক্ত বিশ্রামেরও সুযোগ থাকা উচিত। কারণ, নাগরিকের মানসিক-বৃত্তিসমূহের বিকাশের জন্য উপযুক্ত অবসর একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, দৈনিক শ্রমের সময় নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া রাষ্ট্রের কর্তব্য।

এই সমস্ত অর্থনৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত না হইলে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ অবরুদ্ধ হইবে। এই জন্য আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকারের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

রাজনৈতিক অধিকার :

রাজনৈতিক অধিকার বলিতে আমরা সেই সমস্ত অধিকার বুঝি যেগুলির সাহায্যে নাগরিকগণ শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

কয়েকটি মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকারের আলোচনা :

ভোটাধিকার (Right to Vote) :

নাগরিকের শাসক নির্বাচন করিবার স্বাধীনতা গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। ভোটাধিকার ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিক শাসক বাছিয়া লয়। এইজন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নাবালক, উন্মাদ, গুরুতর অপরাধে অপরাধী এবং বিদেশী ব্যতীত সকলকেই ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কেহ কেহ ভোটারের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিয়া কেবল শিক্ষিত নাগরিকদেরই এই অধিকার দিবার পক্ষপাতী। কিন্তু নির্বাচকমণ্ডলীকে সীমাবদ্ধ করিলে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত নাগরিকগণ সরকারী সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয়। এইজন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহে সার্বজনীন ভোটাধিকারকে (universal adult franchise) স্বীকার করা হইয়াছে।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার (Right to stand for Election) :

গণতান্ত্রিক আইনসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকে। ইহা ভোটাধিকারের পরিপূরক। অর্থাৎ যাহার ভোটাধিকার আছে তাহার নির্বাচনপ্রার্থী হইবারও অধিকার থাকা উচিত।

সরকারী চাকুরী পাইবার অধিকার (Right to Public offices) :

ইহার অর্থ, সরকারী চাকুরীর ব্যাপারে সকল নাগরিকের সমান সুযোগ থাকিবে। রাষ্ট্রপ্রধান হইতে সুরু করিয়া সরকারের সমস্ত পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে। এই ব্যাপারে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অর্থের ভিত্তিতে বা স্ত্রী-পুরুষ ভেদে কোনরূপ বৈষম্য অবলম্বন করা হইবে না। ভারতীয় সংবিধানে এই অধিকারকে বিশেষভাবে সংরক্ষিত করা হইয়াছে।

আবেদন করিবার অধিকার (Right to Petition) :

এই অধিকারের অর্থ এই যে, নাগরিকগণ তাহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য ব্যক্তিগত বা সংঘবদ্ধভাবে শাসনকর্তৃপক্ষ বা আইন-সভার নিকট আবেদন করিতে পারে। গণতান্ত্রিক সরকার নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত। সুতরাং সরকারকে জনসাধারণের অভাব অভিযোগ দূর করিবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট হইতে হয়।

নাগরিকের কর্তব্য (Duties of Citizens) :

নাগরিককে অধিকার দান করিয়া রাষ্ট্র তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশে বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কয়েকটি কর্তব্য আছে।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য (Allegiance to the State) :

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অর্থ প্রত্যেক নাগরিক বহিঃরাষ্ট্রের আক্রমণ হইতে নিজের রাষ্ট্রকে রক্ষা করিতে এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সাহায্য করিবে। এজন্য অনেক রাষ্ট্রে যুদ্ধের সময় নাগরিকগণ রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে বাধ্য।

আইন মান্য করিয়া চলা (To obey laws) :

সাধারণের কল্যাণসাধনের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়। প্রত্যেকটি নাগরিকের কর্তব্য নিজের রাষ্ট্রের আইন মান্য করা। আইন অমান্য করিলে রাষ্ট্রের শৃংখলা বিপন্ন হইবে এবং প্রগতি ব্যাহত হইবে। কিন্তু ল্যাস্কি প্রভৃতি আধুনিক লেখকদের মতে, যে আইন জনসাধারণের কল্যাণের বিরোধী সে আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই নাগরিকের প্রধান কর্তব্য। কিন্তু এই প্রতিবাদের পদ্ধতি শান্তিপূর্ণভাবে ও শাসনতান্ত্রিক উপায়ে হওয়া উচিত।

করদান (To pay taxes) :

রাষ্ট্রের সংগঠনমূলক কার্যগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য অর্থের প্রয়োজন। নাগরিকের করলব্ধ অর্থই রাষ্ট্রের প্রধান আয়। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদান করা।

সুষ্ঠুভাবে ভোটদান (To rightly exercise the right to vote) :

নাগরিকের ভোটের দ্বারাই গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপিত হয়। নাগরিকেরা সততা ও বিচারবুদ্ধির সহিত ভোটাধিকার ব্যবহার করিলেই উপযুক্ত সরকার সংগঠিত হইতে পারে। সুতরাং প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য উপযুক্ত প্রার্থী মনোনয়ন করা। যাহারা নির্বাচনে জয়লাভ করে তাহাদের কর্তব্য নিষ্ঠা ও সততার সহিত নিজেদের কর্তব্য পালন করা।

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল (Rights imply duties) :

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল। উভয়ের উৎস এক। অধিকার ও কর্তব্য সামাজিক চেতনা হইতে উদ্ভূত। ল্যাস্কি বলেন যে অধিকার বলিতে আমরা মানুষের সামাজিক জীবনের সেই সমস্ত সুযোগ-সুবিধাকে বুঝি যাহা ব্যতীত মানুষের জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়। মানুষের সামাজিক প্রকৃতি হইতে কর্তব্যের উৎপত্তি হইয়াছে। সমাজজীবন ও ব্যক্তিজীবন পরস্পর নির্ভরশীল। সুতরাং নাগরিকগণ পারস্পরিক কর্তব্য পালন না করিলে সমাজজীবন বিশৃংখল ও অসুন্দর হইবে।

বিভিন্ন দিক হইতে আমরা অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক আলোচনা করিতে পারি।

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকারগুলি নাগরিকের এমনভাবে ভোগ করা উচিত যাহাতে আত্মসমৃদ্ধির মাধ্যমে সমাজের কল্যাণসাধন সম্ভব হয়। যেমন, শিক্ষার অধিকার প্রায় প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশেই স্বীকৃত। নাগরিকের কর্তব্য এই অধিকার সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিয়া নিজের মনুষ্যত্বকে বিকশিত করা।

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যের প্রতি কর্তব্য আছে। যেমন মন্দিরে উপাসনা করার অধিকার প্রত্যেকটি হিন্দুর আছে, তেমনি তাহার কর্তব্য অন্য

ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির ধর্মাচরণে বাধা না দেওয়া। পারস্পরিক কর্তব্য পালন না করিলে সমাজজীবন অশান্তিপূর্ণ হইবে।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কর্তব্য আছে। নাগরিকের অধিকার রাষ্ট্রের সম্মতি ব্যতীত আইনসঙ্গত মর্যাদা লাভ করিতে পারে না। এই অধিকার নাগরিক ভোগ করিতে পারে যদি সে রাষ্ট্রের প্রতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য পালন করে। রাষ্ট্রের বিপদের সময়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা, সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্রের প্রণীত আইনকে মান্য করা, রাষ্ট্রকে নিয়মিত করপ্রদান করা এবং রাষ্ট্রীয় কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যতীত মানুষের জীবনের পূর্ণ উপলব্ধি সম্ভব নহে। অতএব সমাজবদ্ধ মানুষের অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল। একটির অভাব অপরটিকে মূল্যহীন করে। যুক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তিচরিত্র সৃষ্টির জন্য ও সমাজের প্রত্যাশিত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত অধিকার ভোগ ব্যক্তির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। তাই, হবহাউস্ (Hobhouse) বলেন, অধিকারসমূহ নাগরিকের সামাজিক দায়িত্ব-প্রভাবিত ও সম্পর্কিত।

প্রশ্নাবলী

1. Discuss the rights and duties of a citizen in a modern state.
(আধুনিক রাষ্ট্রে নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য কি কি ?) [পৃঃ ২৪১-২৪৬ দেখ।]

2. Distinguish between (*i*) civil and political rights and (*ii*) legal and moral rights.
(সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের মধ্যে এবং আইনসঙ্গত ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য কি ?) [পৃঃ ২৩৯-২৪০ দেখ।]

3. "Rights and duties are correlative". Explain and illustrate.
("অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর নির্ভরশীল"—উদাহরণসহ এই উক্তির আলোচনা কর।)
[পৃঃ ২৪৬-২৪৭ দেখ।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রনৈতিক দল
(Political Parties)

রাষ্ট্রনৈতিক দলের প্রকৃতি ও সংজ্ঞা (Nature and definition of Political Parties) :

বিভিন্ন মতবাদ প্রকাশের সুযোগ থাকাই গণতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য। ভিন্ন ভিন্ন মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া ভিন্ন ভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। সুতরাং দল গঠনের প্রথা গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি। রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে আমরা এমন এক লোকগোষ্ঠীকে বুঝি যাহাদের মধ্যে নীতি ও কর্মপন্থা সম্পর্কে মূলগত ঐক্য আছে। খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাহারা একমত নাও হইতে পারে, কিন্তু মূলনীতি সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে কোন বিরোধ থাকিবে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই গোষ্ঠী সুসংগঠিত হইবে। সংগঠন না থাকিলে তাহাদের পক্ষে নিজেদের কর্মসূচীকে বাস্তবরূপ দেওয়া সম্ভব নয়। কোন বিশেষ নীতির স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করার জন্য সংগঠন একান্ত প্রয়োজন।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রনৈতিক দল শান্তিপূর্ণ ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিশ্বাসী হইবে। যে দল সহিংস উপায়ে শাসনক্ষমতা পাইবার চেষ্টা করে, তাহাকে প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দল বলে না। নির্বাচনের দ্বারা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারী ক্ষমতা লাভ করা প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

সর্বশেষে, জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করাই রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে যে দল গঠিত হয় তাহাকে রাষ্ট্রনৈতিক দল বলা চলে না। সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যে দল কার্য করে তাহাকে কুচক্রী দল (Faction) বলা হয়। এই জাতীয় সঙ্ঘ জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও রাষ্ট্রনৈতিক উচ্চাদর্শের পরিপন্থী।

রাষ্ট্রনৈতিক দলের কার্যাবলী (Functions of Political Parties) :

গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলিই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালক।

জনসাধারণের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রের কার্যে অংশগ্রহণ করার সুযোগ ঘটে না। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই জনসাধারণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষিত হয়। তাই, রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যবধানের সংযোগ-সেতু হিসাবে দলগুলি কাজ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি দলের প্রথম কাজ একটি সুসম্বদ্ধ কর্মপদ্ধতি রচনা। ইহার মাধ্যমে দলগুলি তাহাদের নিজস্ব লক্ষ্য ও আদর্শ ব্যক্ত করে। লক্ষ্য ও আদর্শকে জনসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরিবার জন্য ব্যাপক প্রচারকার্য চালান দলগুলির দ্বিতীয় কাজ। প্রত্যেকটি দলের নিজস্ব একটি কাঠামো ও সংগঠন থাকে। সভা-সমিতি, আন্দোলন, পুস্তিকা-প্রচার, মেলা-মেশার মাধ্যমে জনসাধারণকে নিজ নিজ উদ্দেশ্য সম্পর্কে দলগুলি বুঝাইবার চেষ্টা করে। জনসাধারণের সমর্থনের মাধ্যমে নিজ নিজ সভ্যদের আইনসভায় নির্বাচিত করার ব্যবস্থা করার জন্যই দলগুলি দিনের পর দিন প্রচারকার্য চালাইয়া যায়। অতএব, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির তৃতীয় কাজ। এই উদ্দেশ্যে তাহারা নিজ নিজ দল হইতে প্রার্থী দাঁড় করাইয়া থাকে। প্রার্থীর গুণাবলী ও দলের উদ্দেশ্যসমূহ নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজ-নৈতিক দলগুলি জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করে। তাহাদের চতুর্থ ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ জনসাধারণের সমর্থনে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়া সরকার গঠন করা। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে অনেক প্রার্থী অবতীর্ণ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলিকে পরাস্ত করিয়া সরকার গঠন করিবার জন্য তাই প্রতিটি দল আপ্রাণ চেষ্টা করে। অপরপক্ষে, যে সমস্ত দলগুলি নির্বাচন দ্বন্দ্বে পরাজিত হয় তাহাদেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। রাষ্ট্রনীতির রঙ্গমঞ্চে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকলাপের যবনিকা পতন হয় না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করিলে অপরাপর দলগুলি বিরোধীপক্ষ হিসাবে কাজ করে। বিরোধীদলের সতর্ক প্রহরা সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে। অতএব, রাষ্ট্রনৈতিক দলের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ কাজ আইনসভার ভিতরে ও বাহিরে সরকারের উপর দৃষ্টি রাখা।

দলীয় ব্যবস্থার গুণ (Merits of Party system) :

দলগঠনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রে একান্ত প্রয়োজন। গণতন্ত্র এমন এক সরকারী ব্যবস্থা যাহা জনসাধারণ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত করে। বিভিন্ন দলের বিকল্পনীতি ও কর্মসূচীর মধ্যে জনসাধারণ একটি বিশেষ নীতি ও কর্মসূচী পছন্দ করিতে

পারে। জাতীয় সমস্যাগুলি অস্পষ্ট অবস্থায় থাকে ; বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক দল তাহাদের পরিস্ফুট করে, এবং প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সুষ্ঠু সমাধানের জন্য স্বতন্ত্র নীতি ও কর্মপন্থা জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করে। ইহাতে জনসাধারণের পক্ষে বিভিন্ন কর্মসূচী বা রাষ্ট্রীয় আদর্শ পছন্দ করা সহজ হয়।

দ্বিতীয়তঃ, দল গঠনের ব্যবস্থা দেশকে স্বৈরাচারের হাত হইতে রক্ষা করে। বিরোধী দলের নেতৃত্বের চাপে সরকার শাসন ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করিতে পারে না। সরকার কোন জনস্বার্থবিরোধী কাজ করিলে বিরোধী দল তাহার সুযোগ লইয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রবল জনমত সৃষ্টি করিবে। ইহাতে পরবর্তী নির্বাচনে সরকারী দলের জয়লাভ করা কষ্টকর হইবে। বিরোধী দলের সমালোচনার ভয়ে সরকার সর্বদাই সতর্ক থাকে এবং গণতান্ত্রিক পথ হইতে বিচ্যুত হয় না।

তৃতীয়তঃ, দল গঠন ব্যবস্থার ফলে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা প্রসারিত হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সভাসমিতি ও পুস্তিকা প্রকাশের দ্বারা জনসাধারণকে সচেতন করিয়া তোলে। ইহার ফলে রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে সাধারণ মানুষের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

চতুর্থতঃ, দল ব্যবস্থা ব্যতীত মন্ত্রিসভা-শাসিত-সরকার সম্ভব নয়। কোন সংঘবদ্ধ দলের সমর্থন না থাকিলে শাসন হইবে স্বল্পস্থায়ী এবং কোন দীর্ঘকালীন গঠনমূলক কর্মসূচীর বাস্তব রূপদান সম্ভব হইবে না। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইলে মন্ত্রিসভা কোন সুসংবদ্ধ নীতি অনুসরণ করিতে পারে না।

দল-ব্যবস্থার ত্রুটি (Defects of Party system) :

দল-ব্যবস্থা জনসাধারণের মধ্যে কৃত্রিম বিভেদ সৃষ্টি করে। এই কৃত্রিম বিভেদ সাধারণ মানুষের মধ্যে তিক্ততা ও স্থায়ী বিরোধের সৃষ্টি করে। ইহা জাতীয় সংহতির বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ, দল-ব্যবস্থা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে নষ্ট করে। বর্তমানে নির্বাচনী এলাকার আয়তন ও ভোটদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন দলের সমর্থন ছাড়া নির্বাচনে জয়লাভ ও দেশের রাষ্ট্রনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না। কিন্তু দলের সদস্যকে সর্বদা দলীয় কর্মপন্থা অনুসরণ করিতে হয়। ইহার ফলে স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা বিনষ্ট হয়।

তৃতীয়তঃ, দল-ব্যবস্থার জন্য জাতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতন ঘটে। কোনমতে নির্বাচনে জয়লাভ করা প্রত্যেকটি দলের উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ইহার জন্য বিভিন্ন দল মিথ্যা ঘটনার বিকৃত রটনা প্রভৃতি অসাধু উপায় অবলম্বন করে।

চতুর্থতঃ, জাতীয় সংকটের সময় দলীয় সরকার বিশেষ দুর্বলতার পরিচয় দেয়। জাতির প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা দলের প্রতি আনুগত্য বেশী দেখা যায়। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। দল-ব্যবস্থার নানাবিধ ত্রুটি সত্ত্বেও প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে দলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যায় না।

বহুদল, দ্বিদল ও একদল ব্যবস্থা (Multi Party, Two-Party and One-Party System) ঃ

বহুদল ব্যবস্থায় সমাজের বিভিন্ন মতের সচেতন প্রকাশ সম্ভব হয়। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনৈতিক দল এক একটি বিশিষ্ট মতবাদের বাহন। সমাজে বহুমতের অস্তিত্ব দেখা যায়। সুতরাং বহুদল ব্যবস্থা থাকা উচিত। কিন্তু বহুদল ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ ত্রুটি আছে।

প্রথমতঃ, বহুদল ব্যবস্থায় কোন দলের পক্ষে আইনসভায় একক সংখ্যা-গরিষ্ঠতা (absolute majority) লাভ করা সম্ভব হয় না। ইহার ফলে মন্ত্রিসভা স্বল্পস্থায়ী ও দুর্বল হয়, এবং কোন সুসংবদ্ধ নীতি অনুসরণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, নিজস্ব আদর্শ বিসর্জন দিয়া অন্যান্য দলের সহিত মিলিয়া আপোষরফা দ্বারা শাসনক্ষমতা অধিকার করার প্রবণতা প্রায় প্রত্যেক দলের মধ্যে দেখা যায়।

এই সব কারণে ল্যাস্কি বলেন যে, দ্বিদল ব্যবস্থাই রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে।

প্রথমতঃ, নির্বাচনকালে জনসাধারণ সহজ ও প্রত্যক্ষভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। মাত্র দুইটি বিকল্প দল থাকায় শাসক নির্বাচন করিতে জন-সাধারণের কোন অসুবিধা হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিদল ব্যবস্থায় বিরোধী-দল বিশেষ শক্তিশালী হয়। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হইতে পারে না।

একদলীয় ব্যবস্থা ঃ

সাম্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী দর্শনে একদলীয় ব্যবস্থার স্বীকৃতি দেখা যায়।

ফলে পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে সাম্যবাদ ও ফ্যাসীবাদের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে, সেই সব দেশে একদলীয় ব্যবস্থা অবস্থিত। সোবিয়েৎ রাশিয়ার সংবিধানে একমাত্র সাম্যবাদী দলকেই স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। একদলীয় ব্যবস্থায় শাসন দক্ষ, সুদৃঢ় ও কর্মতৎপর হয়। কোন বিরোধী দল না থাকায় এবং মানুষের জীবনের উপর রাষ্ট্রের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ থাকায় দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতিও সম্ভব হয়। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থা অ-গণতান্ত্রিক। শাসক পছন্দ করিবার স্বাধীনতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিত্তি। বিকল্পদলের সহ-অবস্থান না থাকিলে এই স্বাধীনতা প্রহসনে পর্যবসিত হয়। কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থায় বিকল্পদলের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং ইহাকে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, কোন বিরোধী দলের স্বীকৃতি না থাকায় শাসন অনেক সময় স্বৈরাচারী হয়। এই স্বৈরাচারী শাসনে নাগরিকের স্বাধীনতা অবলুপ্ত হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রনৈতিক লেখকগণ দ্বিদল ব্যবস্থার পক্ষপাতী। দ্বিদল ব্যবস্থা নির্বাচন কার্যকে সহজ করে, নির্বাচন-ব্যয় সংকোচ করে, শাসন-ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করে এবং সরকারী স্বৈরাচার হইতে দেশকে রক্ষা করে। ইংল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের উৎকর্ষ সম্ভব হইয়াছে দ্বিদল ব্যবস্থার জন্য। দ্বিদল ব্যবস্থার জন্যই সেখানে সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ও শক্তিশালী বিরোধী দল গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রশ্নাবলী

1. What do you understand by Political Parties? Explain their merits and defects.

(রাষ্ট্রনৈতিক দল বলিতে কি বুঝায়? ইহাদের গুণাগুণ আলোচনা কর।)[পৃঃ ২৪৮-২৫১ দেখ]

2. Describe the essential functions of political parties in a democracy.

(গণতন্ত্রে রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির প্রয়োজনীয় কার্যাবলী আলোচনা কর।) [পৃঃ ২৪৮-২৪৯ দেখ]

3. Discuss the relative advantages and disadvantages of (a) multi-party system, (b) bi-party system and (c) one-party system.

(বহুদল, দ্বিদল ও একদল ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধাগুলি বিবৃত কর।) [পৃঃ ২৫১-২৫২ দেখ]

4. Are political parties inevitable in a Democracy? Give reasons for your answer.

(গণতন্ত্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রনৈতিক দল কি অবশ্যম্ভাবী? যুক্তিসহ উত্তর দাও।)[পৃঃ ২৪৮-২৫২ দেখ]

———

চতুর্দশ অধ্যায়

জনমত (Public Opinion)

জনমতের গুরুত্ব ও স্বরূপ (Importance and Nature of Public Opinion) :

গণতন্ত্রে জনমতের বিশেষ গুরুত্ব আছে। জনমত ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক। বলিষ্ঠ ও সচেতন জনমত থাকিলে সরকার স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। সুতরাং জনমত সরকারী স্বেচ্ছাচারের পথ অবরুদ্ধ করিয়া গণতন্ত্রকে রক্ষা করে।

দ্বিতীয়তঃ, জনমতের দ্বারা শাসিত সরকার হইল গণতন্ত্র। গণতান্ত্রিক সরকার জনসাধারণের দ্বারা গঠিত সরকার। অতএব গণতান্ত্রিক সরকারের নীতি ও কর্মসূচীর উপর জনমতের সুস্পষ্ট প্রতিফলন থাকা চাই। জনমতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া গণতান্ত্রিক সরকার নীতি ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। যখন আইন জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে না তখন আইনের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তি শিথিল হয়। (When laws do not represent public opinion they lose their appeal to the mind of the citizen and the foundation of loyalty is shaken.—MacIver)।

লাওয়েলের মতে জনমতের প্রধানতঃ দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমতঃ, জনমত জনসাধারণের স্বার্থে রচিত মত, ইহা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কেন্দ্রিক মত নহে। কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধি করিবার জন্য যদি কোন মত গঠিত হয়, তাহা হইলে সেই মতকে জনমত আখ্যা দেওয়া যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, জনমত তখনই সৃষ্টি হয় যখন জনসাধারণের এক বৃহৎ অংশ এই মত পোষণ করে। জনমত বলিতে আমরা সর্বজনের মত বুঝি না, কারণ সকলে কোন বিষয়ে একমত হইতে পারে না। (In any community of men that which has assumed the character of public opinion is the result not of the opinion of all its members but only of those persons, few or many who are led to think and to form

judgments regarding matters of general interest.—Willoughby) জনমত আবার শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠের মতও নয়। যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া কোন মত গঠন করে তবে সেই মত জনমত নহে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সেই মতই জনমত যাহা সংখ্যালঘিষ্ঠ যুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে।

অতএব জনমত বলিতে আমরা সেই মতই বুঝি যাহা সর্বসাধারণের কল্যাণে সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিনিষ্ঠ, সুচিন্তিত মত। আবার, জনমত ক্ষণিকের আবেগপ্রবণ হইবে না। ইহা দীর্ঘকালীন, সুচিন্তিত সুস্থ মত।

জনমত প্রকাশের বাহন (Organs of Public Opinion) :

সংবাদপত্র (Newspaper) :

জনমত প্রকাশের উৎকৃষ্ট বাহন হইল সংবাদপত্র। সংবাদপত্র জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানাবিধ তথ্য ও সংবাদ পরিবেষণ করে। জনসাধারণ এই তথ্যের ভিত্তিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাহাদের মতামত নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির উপর নিজেদের বিভিন্ন দলের নেতাদের ও চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মতামত প্রকাশ করিয়া জনমত সৃষ্টিতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই জনমত সৃষ্টিতে সংবাদপত্রের অবদান অনস্বীকার্য।

কিন্তু সংবাদপত্রকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিতে হইলে তাহাকে নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে তথ্য ও মতামত প্রচার করিতে হইবে। সংবাদপত্র যদি সরকারের বা ধনিক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে সত্যপথে থাকিয়া সর্বসাধারণের কল্যাণসাধন সম্ভব হইবে না। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সংবাদপত্র সরকারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিবে না। আর ধনী সমাজের প্রভাবাধীন সংবাদপত্র তথ্য বিকৃত করিয়া শুধুমাত্র ধনীর স্বার্থরক্ষা করিবে। সুতরাং সংবাদপত্রকে যদি নিরপেক্ষভাবে দেশের সেবা করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে সর্বদা সরকারের ও পুঁজিপতির প্রভাবমুক্ত থাকিতে হইবে।

সভাসমিতি (Platform) :

সংবাদপত্রের প্রভাব শুধুমাত্র শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সভাসমিতির মাধ্যমে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের উপর প্রভাব বিস্তার করা

সম্ভব। বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন দিক হইতে কোন বিষয়ের আলোচনা করেন। জনসাধারণ তখন একটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবগত হইয়া নিজেদের মতামত গঠন করিতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে বক্তারা তথ্যকে বিকৃত করিয়া নিজেদের বা দলের স্বার্থসিদ্ধি করিবার চেষ্টা করে। ইহা দেশের স্বার্থবিরুদ্ধ।

রাষ্ট্রনৈতিক দল (Political Parties) :

রাষ্ট্রনৈতিক দলের উদ্দেশ্য নিজেদের নীতি ও কর্মপন্থার স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করা। এইজন্য তাহারা দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্বন্ধে তাহাদের নীতি নির্ধারণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে তাহা প্রচার করে। ইহার ফলে জনসাধারণ দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হইয়া তাহাদের মতামত গঠন করিতে পারে।

বেতার ও চলচ্চিত্র (Radio and Cinema) :

বেতারের মাধ্যমে দেশী ও বিদেশী ঘটনাগুলি সম্পর্কে সংবাদ পরিবেষণ করা হয়, এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বেতারের মারফৎ নানাবিধ বিষয়ে আলোচনা করেন ইহাতে জনসাধারণ বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য জানিতে পারে এবং তাহাদের মতামত ঠিক করিতে পারে। দেশের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সাধারণ মানুষের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া তাহাকে শিক্ষিত করা চলচ্চিত্রের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

আইনসভা (Legislature) :

আইনসভার সদস্যরা জনসাধারণের প্রতিনিধি। সুতরাং তাহারা জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করে। এই আলোচনা জনমত সংগঠনে সাহায্য করে। আবার, আইনসভার আলোচনা ও বিতর্কের উপর জনমতের প্রতিফলন দেখা যায়। কোন বিষয়ে জনসাধারণের যাহা মত তাহাই প্রকাশ করে তাহাদের প্রতিনিধিরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational institutions) : ছাত্রাবস্থায় যে শিক্ষা মানুষ পায় তাহা তাহার সমগ্র জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র বিভিন্ন বিষয়ে প্রকৃত তথ্য ও জ্ঞান অর্জন

করিতে পারে। এইজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবহাওয়া সুস্থ এবং দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

জনমতপ্রকাশের উপরোক্ত বাহনগুলি সক্রিয় ও শক্তিশালী হইলে সুষ্ঠু ও বলিষ্ঠ জনমতসৃষ্টির সুবিধা হয়। ফলে, গণতন্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় ও কর্মপ্রণালী সুপরিচালিত হয়। ভারতবর্ষের মত অনুন্নত দেশগুলিতে গণতন্ত্রের দৌর্বল্যের প্রধান কারণ,—বলিষ্ঠ জনমতের অভাব। জনমতপ্রকাশের বাহনগুলি সুসংগঠিত না হওয়ার দরুণ শাসনব্যবস্থার সহিত জনসাধারণের নিবিড় সম্পর্ক গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। তাই স্বভাবতঃই অনুন্নত দেশে গণতন্ত্রের আয়ুস্কাল সম্পর্কে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

প্রশ্নাবলী

1. What is meant by Public Opinion? Discuss its importance in a Democracy.

(জনমত কাহাকে বলে? গণতন্ত্রে ইহার গুরুত্ব নির্ণয় কর।) [পৃঃ ২৫৩-২৫৪ দেখ]

2. Describe the various ways in which Public Opinion is formed and expressed in a modern state.

(আধুনিক রাষ্ট্রে কি কি উপায়ে জনমত গঠিত ও প্রকাশিত হয়?) [পৃঃ ২৫৪-২৫৬ দেখ]

পঞ্চদশ অধ্যায়

নির্বাচন ও ভোটাধিকার
(Election and suffrage)

প্রাচীন গ্রীস ও রোমের নগর-রাষ্ট্রগুলিতে নাগরিকেরা সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ ভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করিত। কিন্তু আধুনিক বৃহদায়তন রাষ্ট্রে নাগরিকগণ প্রত্যক্ষভাবে সার্বভৌমিকতার প্রয়োগ করিতে পারে না। ফলে পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদ্ভব হইয়াছে। বর্তমানে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করিয়া নাগরিকেরা সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। নির্বাচকমণ্ডলী

(electorate) বলিতে রাষ্ট্রের সেই লোকগোষ্ঠীকে বুঝায় যাহারা সরকার নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

ভোটাধিকারের ভিত্তি (basis of suffrage) কি হইবে এই বিষয়ে রাজনৈতিক লেখকদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। অনেক লেখকের মতে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

আবার, কেহ কেহ মনে করেন যে, একমাত্র শিক্ষাগত যোগ্যতাই ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত।

সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments for Universal Adult Suffrage) :

সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার না করিলে গণতন্ত্র প্রহসনে পর্যবসিত হইবে। জনগণের সার্বভৌমিকতা (Popular Sovereignty) গণতন্ত্রের মূলভিত্তি। গণতন্ত্রে জনসাধারণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। সুতরাং রাষ্ট্রের উচিত সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকার করিয়া প্রত্যেক নাগরিককে সরকার গঠনে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দেওয়া।

দ্বিতীয়তঃ, ভোটের অধিকার হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিলে সাধারণতঃ সরকার তাহার স্বার্থ উপেক্ষা করিবে। সরকার শুধু তাহাদের স্বার্থের দিকেই দৃষ্টি দিবে যাহারা ভোটাধিকার প্রয়োগের দ্বারা সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। সুতরাং রাষ্ট্রের সকল শ্রেণীর জনগণের স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনের জন্য প্রত্যেক নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

তৃতীয়তঃ, ইহা সর্বজনস্বীকৃত নীতি যে, যাহা সকলের স্বার্থ স্পর্শ করে, তাহা সকলের দ্বারা নির্ধারিত হওয়া উচিত। সরকারের নীতি ও আইন সকল নাগরিককে স্পর্শ করে। অতএব্ সরকার নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সকল নাগরিককে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

চতুর্থতঃ, নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক সত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গ্রহণ করা উচিত। রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার উপর নাগরিকের রাষ্ট্রনৈতিক সত্তার বিকাশ নির্ভর করে। নাগরিকদের সরকার গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করিবার সুযোগ দিলেই রাষ্ট্রনৈতিক বিষয়ে তাহাদের চেতনা বৃদ্ধি পাইবে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হইবে।

সার্বজনীন ভোটাধিকারের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Universal Suffrage) :

কিন্তু কয়েকজন লেখকের মতে, যাহারা ভোটাধিকার সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতে পারে না তাহাদের এই অধিকার দেওয়া উচিত নয়। মেইন, মিল, স্টিফেন প্রভৃতি ইংরাজ লেখকরা বলেন যে সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতির যথেচ্ছ প্রয়োগে দেশের অকল্যাণ হইবে। যাহাদের বিচারবুদ্ধি আছে শুধুমাত্র তাহাদেরই ভোটাধিকার দেওয়া উচিত।

মিল বলেন যে, যাহারা অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে তাহাদেরই শুধুমাত্র ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা মানুষকে কতখানি চেতনা ও বিচারবুদ্ধি দিতে পারে তাহা ভাবিবার বিষয়। ভোটাধিকারের সুষ্ঠু প্রয়োগ ভোটদাতার রাষ্ট্রনৈতিক বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। শুধুমাত্র শিক্ষার উপর রাষ্ট্রনৈতিক বিচার-শক্তি নির্ভরশীল নহে।

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষাকে ভোটাধিকারের ভিত্তি ধরিলে ভারতবর্ষের মত অল্প-শিক্ষিত দেশে খুব কম সংখ্যক লোকই এই অধিকার অর্জন করিতে পারিবে। ইহাতে সংখ্যালঘিষ্ঠের শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবে, এবং গণতন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। মিল যে সার্বজনীন শিক্ষার কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে কিছুটা সত্য নিহিত আছে। জনসাধারণকে যদি ভোটাধিকারের মত মূল্যবান অধিকারের সুষ্ঠু ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে সকলকে সুশিক্ষিত করিয়া তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। সুতরাং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত। ("Universal education must precede universal enfranchisement"—Mill)।

কয়েকজন লেখকের মতে, যাহারা সম্পত্তির অধিকারী তাহাদেরই শুধুমাত্র ভোটাধিকার দেওয়া উচিত। যাহাদের সম্পত্তি নাই তাহারা সরকারী ব্যয় সম্পর্কে অমিতব্যয়ী হইবে। কিন্তু দুইটি কারণে এই নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

প্রথমতঃ, বর্তমানে প্রত্যেক নাগরিকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কিছু না কিছু কর রাষ্ট্রকে দেয়, এবং সরকারী আয়ের একটি বৃহৎ অংশ সাধারণের করলব্ধ অর্থ।

দ্বিতীয়তঃ, দারিদ্র্য রাষ্ট্রনৈতিক অজ্ঞতার পরিচায়ক নয়। ভোটাধিকারের

সুষ্ঠ প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক চেতনা এবং এই চেতনার উন্মেষের সহিত সম্পত্তির কোন যোগ নাই। আধুনিক লেখকরা কেহই সম্পত্তিকে ভোটাধিকারের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেন না।

বর্তমান জগতের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য রাষ্ট্রে সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি স্বীকৃত হইয়াছে। সমস্ত স্বাভাবিক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বিদেশী, উন্মাদ, দেউলিয়া ও গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত লোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়। ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভারতবর্ষ প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রে সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হইয়াছে। একুশ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়সের ভারতীয় স্ত্রীপুরুষ ভোটাধিকার পাইয়াছে। এই নীতি অনুসারে যে দুইটি সর্বভারতীয় নির্বাচন সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহা জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছে। সার্বজনীন ভোটাধিকার গণতন্ত্রের মূলভিত্তি এবং ইহার মাধ্যমেই গণতন্ত্রের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব।

নারীর ভোটাধিকার (Female franchise) :

অনেক লেখক নারীর ভোটাধিকারের পক্ষপাতী নহেন। তাঁহাদের প্রধান যুক্তি যে, নারীর এই অধিকার স্বীকার করিলে সমাজ-ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। পরিবার সমাজ-সংগঠনের ভিত্তি। পরিবার সংরক্ষণের দায়িত্ব নারীকে গ্রহণ করিতে হয়। নারী রাষ্ট্রনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলে পরিবার অবহেলিত হইবে। পরিবারের প্রতি তাহার নিরাসক্তি সমাজ-সংগঠনের ভিত্তিকে শিথিল করিবে। সুতরাং সামাজিক সংহতির স্বার্থে নারীকে ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, নারীর ভোটাধিকারের স্বীকৃতি পারিবারিক অশান্তি সৃষ্টি করিবে। স্বামী যদি হয় কংগ্রেসের অনুরাগী এবং স্ত্রী যদি সাম্যবাদী দলের অনুগামিনী হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিবে। এই মতবিরোধের জন্য স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ক্ষুণ্ণ হইবে। আবার, স্বামী ও স্ত্রী ভোটদান ব্যাপারে একমত হইলে নারীর ভোটাধিকার অর্থহীন হয়।

তৃতীয়তঃ, নারীর শারীরিক শক্তি কম, এবং এইজন্য তাহার পক্ষে নাগরিকতার সমস্ত দায়িত্ব (যেমন সৈন্যবাহিনীতে কাজ) পালন করা সম্ভব নয়। সুতরাং, ভোটাধিকারের মত মূল্যবান রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার সে দাবী করিতে পারে না।

উপরোক্ত যুক্তিগুলির সারবত্তা বর্তমানে স্বীকার করা হয় না। পরিবার সংরক্ষণের সঙ্গে নাগরিক দায়িত্ব পালনের কোন বিরোধ নাই। উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিলে সচেতন নারী দুই কর্তব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারিবে। উপরন্তু, নারীর শারীরিক শক্তির প্রাচুর্যের অভাবহেতু তাহার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইন সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার অধিকার থাকা প্রয়োজন।

আধুনিক রাষ্ট্রসমূহে নারীর ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এই অধিকারের স্বীকৃতি নারীর ব্যক্তিত্বকে সমুন্নত করিয়াছে এবং রাষ্ট্রনীতিতে কোমলতার সঞ্চার করিয়াছে।

নির্বাচন প্রণালী (Methods of Election) :

প্রতিনিধি নির্বাচনের দুইটি পদ্ধতি প্রচলিত আছে—প্রত্যক্ষ পদ্ধতি ও পরোক্ষ পদ্ধতি (Direct and Indirect Methods)। প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী ভোটদাতারা ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি নিজ নিজ ভোট দিয়া প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের রাজ্য-আইনসভার নিম্নকক্ষের সভ্যবৃন্দ ও লোকসভার সভ্যগণ প্রত্যক্ষভাবে ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত হন। অপরপক্ষে, যে নির্বাচন ব্যবস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচন ব্যাপারে ভোট-দাতারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে না তাহাকে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বলা হয়। এইরূপ ব্যবস্থায় ভোটদাতারা একদল লোককে নির্বাচিত করে এবং এই নির্বাচিত সভ্যরা চূড়ান্তভাবে সর্বশেষ প্রতিনিধিদের নির্বাচন করিয়া থাকে। ভারতবর্ষে পার্লামেন্টের উচ্চতর কক্ষ, অর্থাৎ, রাজ্যসভার অধিকাংশ সভ্যগণ এইভাবে নির্বাচিত হন। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে ভোটদাতারা ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি অংশগ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়া এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক। উপরন্তু, ইহাতে ভোটদাতাগণ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়া উৎসাহ প্রদর্শন করিবার সুযোগ পায়। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে জনতা মনোবৃত্তি প্রকাশের আশঙ্কা করা হয়। ইহার প্রতিষেধক হিসাবে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি কেহ কেহ সমর্থন করেন। উপসংহারে বলা যায় যে, নির্বাচকমণ্ডলী উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হইলে নির্বাচনপদ্ধতি পরোক্ষ না হইয়া প্রত্যক্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation) :

গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে, অধিকাংশক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনব্যবস্থায় পর্যবসিত হয়। অতএব, গণতন্ত্রের অন্যতম মৌলিক সমস্যা হইল,—শাসনব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা। মিলের মতে, জাতীয় আইনসভায় জাতীয় জীবনের সর্বস্তরের মানুষের পরিপূর্ণ প্রতিফলন হওয়া উচিত। সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ—উভয়ের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব আইনসভায় প্রতিবিম্বিত হওয়া কাম্য।

অবশ্য, সংখ্যালঘিষ্ঠ কথাটির নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া সহজ নয়। সংখ্যালঘিষ্ঠ বলিতে সাধারণতঃ, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সংখ্যাল্পতা বোঝায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, রাজনৈতিক দৃষ্টিতে ভারতবর্ষে কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অন্যান্য দলগুলি সংখ্যালঘিষ্ঠ। আবার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হইতে হিন্দুসম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ও মুসলমান বা খৃষ্টান সম্প্রদায় সংখ্যালঘিষ্ঠ।

সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা নিম্নলিখিত পদ্ধতির মাধ্যমে করা হইয়া থাকে :—

(১) **সমানুপাতিক নির্বাচনব্যবস্থা (Proportional Representation) :**

এই নির্বাচনপদ্ধতি অনুযায়ী একটি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকে। নির্বাচনকেন্দ্রের ভোটের মোট সংখ্যাকে ঐ কেন্দ্রের মোট আসনের সংখ্যাদ্বারা বিভক্ত করিয়া যে ভাগফলটি পাওয়া যায় তাহাই সূচকসংখ্যা (quota) বলিয়া নির্ধারিত হয়। ভোটপত্রে নির্বাচনপ্রার্থিগণের নামের পাশে ভোটদাতাগণ ১, ২, ৩, ইত্যাদি লিখিয়া আপেক্ষিক মনোনয়ন প্রকাশ করে। যে নির্বাচনপ্রার্থী প্রথম মনোনয়নে (First Preference) সূচক-সংখ্যার সমান ভোট পান তাঁহাকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হয়। যাঁহার প্রথম মনোনয়ন ভোট সূচক-সংখ্যা অপেক্ষা অধিক, তাঁহার অতিরিক্ত ভোটগুলি দ্বিতীয় মনোনীত প্রার্থীর নামে গণনা করা হয়। এই ব্যবস্থায় সংখ্যালঘু নির্বাচন সমস্যার সমাধান সম্ভব হইলেও পদ্ধতিটি নিতান্তই জটিল।

(২) **একত্রীকরণ ভোট ব্যবস্থা** (Cumulative Vote System) :

এই পদ্ধতি অনুসারে নির্বাচনকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়া থাকে। নির্বাচনকেন্দ্রে যতগুলি আসন ততগুলি ভোট দিবার অধিকার ভোটদাতার থাকে। ফলে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ সহজেই তাহাদের মনোনীত প্রার্থীর স্বপক্ষে সব ভোট একত্র করিয়া তাহাকে নির্বাচিত করিতে পারে।

(৩) **সীমায়িত ভোটব্যবস্থা** (Limited Vote System) :

এই পদ্ধতি অনুযায়ীও একটি নির্বাচনকেন্দ্র হইতে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা থাকে। নির্বাচন এলাকার আসনের সংখ্যা অপেক্ষা ভোটদাতার ভোটের সংখ্যা কম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয় ; ভোটদাতা একজন প্রার্থীর স্বপক্ষে একের অধিক ভোট দিতে পারিবে না। এইরূপ ভোটের সংখ্যা সীমায়িত থাকার দরুণ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সবকয়টি আসন দখল করিতে পারে না ; এবং সংখ্যালঘুসম্প্রদায় অন্ততঃপক্ষে একটি প্রতিনিধি নির্বাচিত করিতে সমর্থ হয়।

(৪) **আসন সংরক্ষণ** (Reservation of seats) :

কোন কোন দেশে (যেমন, ভারতবর্ষে) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকে। ভারতে তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়ের জন্য অনুরূপ ব্যবস্থা আছে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচনের জন্য বিশেষ নির্বাচনপদ্ধতি অবলম্বন করার যৌক্তিকতা অনেকে অস্বীকার করেন। অভিযোগ করা হয় যে, এই প্রকার নির্বাচনের মাধ্যমে দেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক কূপমণ্ডূকতার সৃষ্টি হয়। ফলে, সঙ্কীর্ণ স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কুচক্রী দলের উদ্ভব ঘটে। ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ও ঐক্য বিঘ্নিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল হইতেছে বহুদলীয় ব্যবস্থার উৎপত্তি। কোন একটি দলের পক্ষে আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব হয় না বলিয়া অপরাপর দলগুলির সহিত হাত মিলাইয়া সম্মিলিত সরকার (Coalition Government) গঠন করিতে হয়। ফলে, সরকার স্বল্পস্থায়ী ও দুর্বল হয়।

উপসংহারে এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ লেখক ল্যাস্কির (Laski) মন্তব্য উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। তাঁহার সুচিন্তিত মত হইল যে, নির্বাচনপদ্ধতির সংস্কারের মাধ্যমে বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ত্রুটিগুলি দূর করা সম্ভব নয় ; জনগণের বোধ ও বুদ্ধির সমুন্নতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সংশোধনই ইহার একমাত্র প্রতিকার।

সরকারের উপর নির্বাচক-মণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ (Control of the Electorate over Government) :

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে জনসাধারণের সহিত সরকারের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সম্ভব হয় ; পরোক্ষ গণতন্ত্রে, কিন্তু, এইরূপ সরাসরি নিবিড় সম্পর্ক সম্ভব হয় না। বর্তমান-কালে প্রায় সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেই নির্বাচকমণ্ডলীর সহিত সরকারের সম্পর্ক পরোক্ষ। তাহা সত্ত্বেও সরকারের উপর নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ এই সকল রাষ্ট্রে পরিলক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে নির্বাচক-মণ্ডলী সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করে। পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা আইনসভায় নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের জনসাধারণের ইচ্ছা অনুযায়ী কার্য করিতে প্রণোদিত করে। নির্বাচনপদ্ধতির উপরও এই নিয়ন্ত্রণের পরিমাণ নির্ভর করে। গোপন ভোট ব্যবস্থায় (Vote by ballot) ভোটদাতা স্বাধীনভাবে ভোটাধিকার ব্যবহার করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় বিজয়ী বা বিজিত দলের হস্তে নিপীড়িত হইবার আশঙ্কা ভোটদাতার থাকে না। উপরন্তু, নির্বাচনের দিনে ছুটির ব্যবস্থা করিলে এবং দূরদূরান্তের ভোটদাতাদের নির্বাচন কেন্দ্রে উপস্থিত হইবার সুবন্দোবস্ত করিলে নির্বাচকমণ্ডলীর সক্রিয় অংশ গ্রহণ সহজ হয়। ইহার ফলে, সরকারের উপর তাহাদের নিয়ন্ত্রণও বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, সভা, শোভাযাত্রা, ইস্তাহার বিলি প্রভৃতির মাধ্যমে নির্বাচক-মণ্ডলী সরকারকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীর এই অধিকারগুলিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়।

তৃতীয়তঃ, কয়েকটি দেশে (যেমন, সুইজারল্যাণ্ডে) প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচকমণ্ডলীর নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস দেখা যায়।

গণভোট, গণউদ্যোগ, প্রতিনিধির পদত্যাগ দাবী—এইগুলি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আধুনিক রূপ। (পূর্ণ আলোচনার জন্য পঞ্চম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

গণতন্ত্রে নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা অপব্যবহারের প্রবণতা ইতিহাসে স্বীকৃত। এই রাজনৈতিক ব্যাধির সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষেধক নির্ভীক নির্বাচকমণ্ডলীর চিরন্তন প্রতিবাদস্পৃহা। ব্যাপক রাজনৈতিক শিক্ষার মাধ্যমেই এই জন-চেতনার উন্মেষ সম্ভব। এই প্রসঙ্গে টমাস্ জেফারসনের (Thomas Jefferson) প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণীয়,—শাসকগোষ্ঠীকে যদি প্রায়শঃই সতর্ক করিয়া দেওয়া না যায় যে, জনসাধারণের প্রতিবাদ স্পৃহা শাশ্বত, তবে, কোন্ দেশের স্বাধীনতা সংরক্ষণ করা সম্ভব!

প্রশ্নাবলী

1. Consider the arguments for and against Universal Adult Franchise.
(সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।)
[পৃঃ ২৫৭-২৫৯ দেখ।]

2. Are you an advocate of female franchise? Give reasons for your answer.
(নারীর ভোটাধিকার তুমি সমর্থন কর কি? যুক্তিসহ উত্তর দাও।) [পৃঃ ২৫৯-২৬০ দেখ।]

3. Discuss the various methods of minority representation.
(সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিনিধিত্বের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা কর।) [পৃঃ ২৬১-২৬৩ দেখ।]

4. How does the electorate exercise control over Government?
(নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সরকার কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়?) [পৃঃ ২৬৩-২৬৪ দেখ।]

পরিশিষ্ট (ক)

অনগ্রসর অর্থনীতির প্রকৃতি

(Nature of Underdeveloped Economy)

ভারতবর্ষে সুসংগঠিত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা সুরু হইয়াছে। দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, এবং তৃতীয় পরিকল্পনার কাঠামোকে সম্প্রতি চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে।

অনগ্রসর অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি ভারতবর্ষে প্রকট বলিয়া পরিকল্পনা অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থনীতিতে কৃষি-ব্যবস্থার গুরুত্ব, শ্রমের প্রাচুর্য, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, জীবনযাত্রার নিম্নমান এবং শ্রমের গতিশীলতার অভাব অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য। ভারতের প্রসংগে উল্লেখযোগ্য যে, এদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ কৃষি-ব্যবস্থার সহিত জড়িত আছে। আবার, এই কৃষি-ব্যবস্থার অনগ্রসরতা সর্বজনবিদিত। অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় ভারতবর্ষে কৃষি উৎপাদনের হার সামান্য। দ্বিতীয়তঃ, শিল্পের অনগ্রসরতার জন্য অনগ্রসর দেশের লোকের মাথাপিছু আয় নিতান্ত কম হয়। ভারতের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাব অনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে এদেশের লোকের মাথাপিছু বার্ষিক আয় ২৯০৲ টাকার মত ছিল, অর্থাৎ মাসিক ২৫৲ টাকারও কম। অপরপক্ষে, অগ্রসর দেশগুলিতে (যেমন—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি) লোকের গড়পড়তা মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রায় ১০০০৲ টাকার মত। মাথাপিছু আয় সামান্য হওয়ার অর্থ,—সাধারণ ভারতবাসী নিদারুণ দারিদ্র্য, দুর্দশার মধ্যে বাস করে। আবার, আয়ের এই স্বল্পতা দ্রুত শিল্পায়নের পথে প্রধান প্রতিবন্ধক। জীবনধারণের জন্য সাধারণ ভারতবাসীর আয়ের প্রায় সমস্তই ব্যয়িত হয়; ফলে, সঞ্চয়ের জন্য কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। সঞ্চয়ের পরিমাণের উপরই শিল্পে বিনিয়োগ-যোগ্য মূলধনের পরিমাণ নির্ভর করে। এই কারণে, ভারতবর্ষে মূলধনের স্বল্পতা পরিলক্ষিত হয় এবং ইহার ফলে, শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। অপরপক্ষে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন না ঘটিলে

লোকের মাথাপিছু আয়ও বৃদ্ধি পাইবে না এবং জনসাধারণের জীবনমানেরও উন্নতি হইবে না। এই প্রসঙ্গে সুবিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক নারকৃসের (Ragner Nurkse) মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার মতে, কোন দেশের দারিদ্র্যের কারণ সেই দেশের দারিদ্র্য।

তৃতীয়তঃ, উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ অনগ্রসর দেশে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় না। অপরপক্ষে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায় এই বর্ধিত জনসংখ্যার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্ভব হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দরুণ প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকায় চাষের জমিতে উত্তরোত্তর চাপ সৃষ্টি হইতেছে। এইজন্য ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার অন্যতম সমস্যা "প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব" (disguised unemployment)। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ মিসেস্ রবিন্সন্ (Mrs. Robinson) বলেন, "প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব অনগ্রসর অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য"।

চতুর্থতঃ, শ্রমের গতিশীলতার অভাব অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিলক্ষিত হয়। শ্রমের গতিশীলতা (mobility of labour) সামাজিক কাঠামোর উপর নির্ভরশীল। সামাজিক কাঠামোর নির্দিষ্টতা ও কাঠিন্য অনগ্রসর দেশগুলিতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় কাঠিন্য সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে, এদেশে শ্রমের গতিশীলতার অভাব দেখা যায়।

পঞ্চমতঃ, বাজারের সঙ্কীর্ণতা অনগ্রসর অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বাজারের আয়তন প্রধানতঃ চাহিদার পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। অনগ্রসর দেশে লোকের মাথাপিছু আয় নিতান্ত স্বল্প হওয়ায় চাহিদা স্বভাবতঃই কম হয়। পরিবহন ব্যবস্থার দুর্বলতাও বাজারের সঙ্কীর্ণতার জন্য দায়ী। বাজারের এই সঙ্কীর্ণতা আবার শিল্পগত অনগ্রসরতার অন্যতম মৌলিক কারণ।

অনগ্রসর দেশগুলির প্রায় প্রত্যেকটি কোন না কোন সময়ে বৈদেশিক অধিকারে ছিল। ইদানীংকালে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এই দেশগুলিতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দ্রুত জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা করা হইতেছে। ভারতবর্ষের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি এই প্রচেষ্টারই অন্যতম।

পরিশিষ্ট (খ)

দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে অগ্রগতি ও তৃতীয় পরিকল্পনা

পরিকল্পনা অর্থনীতির পথিকৃৎ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইহারই ধারাকে অব্যাহত রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছে। সেইজন্য প্রথম পরিকল্পনার মৌলিক উদ্দেশ্যগুলি রক্ষা করিয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অধিকতর উৎপাদন, বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান স্থিরীকৃত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাজনিত ভারতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

কৃষি-উৎপাদন এই পরিকল্পনাকালে মোটামুটি ১৬ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। সমাজোন্নয়ন পরিকল্পনার দ্রুত অগ্রগতি এই সময়ের মধ্যে লক্ষণীয়। পরিকল্পনা শেষে প্রায় ৩৭০,০০০ গ্রাম লইয়া ৩১০০ উন্নয়ন ব্লক কার্যকরী হইয়াছে। জাতীয়সম্প্রসারণ ও সমাজোন্নয়ন ব্যবস্থার সংহতি সাধন, পঞ্চায়েৎরাজ প্রতিষ্ঠা ও প্রত্যেকটি ব্লককে উন্নয়ন ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে সংগঠন—দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে উল্লেখযোগ কার্য। ইহা ছাড়া সমবায় ব্যবস্থার বহুমুখীন সম্প্রসারণও প্রসংগতঃ স্মরণীয়। সেচব্যবস্থা ও শক্তিউৎপাদনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনা কালে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই পরিকল্পনাশেষে মোট জলসিঞ্চিত এলাকার পরিমাণ প্রায় ৭০ মিলিয়ন একর হইবে আশা করা হয়। এই সময়ের মধ্যে সার ব্যবহারের পরিমাণ বিশেষ বৃদ্ধি পায়। কৃষিসংক্রান্ত উন্নতির মধ্যে অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বিষয় : পতিতজমি পুনরুদ্ধার, ভূমিসংরক্ষণ প্রচেষ্টা, উন্নততর বীজ যোগান ব্যবস্থা, অরণ্যসম্পদ সম্প্রসারণ ইত্যাদি।

শিল্প ও খনিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে। বিশেষতঃ মূল ও গুরু শিল্পগুলিতে উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ইস্পাত উৎপাদনে প্রায় ৪·৫ মিলিয়ন টন বৃদ্ধি হইবে আশা করা যায় ; অপরাপর প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য উৎপাদন—সিমেণ্ট, কয়লা, এলুমিনিয়াম্ ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০-৫১ হইতে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে সামগ্রিক শিল্পউৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ১২০ শতাংশ হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হয়। অপরদিকে তাঁতশিল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্রশিল্পের ক্ষেত্রেও উৎপাদনবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদন দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে প্রায় ২$\frac{1}{2}$ গুণ বৃদ্ধি পায় ; ১৯৫০-৫১ সালে ২·৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট হইতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া

১৯৬০-৬১ সালে ৫'৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট হইয়াছে। যানবাহন ও সংযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণও এই পরিকল্পনাকালে সাধিত হইয়াছে। ১৯৬০-৬১ সালের শেষে প্রায় ১২০০ মাইল নূতন রেলপথ সৃষ্টি হইয়াছে, এবং ৮৮০ মাইল রেলপথ বিদ্যুতীকরণ হইয়াছে। কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রাথমিক হিসাব ছিল কৃষিব্যবস্থার বাহিরে অতিরিক্ত প্রায় ৮ মিলিয়ন লোকের জন্য চাকুরী সৃষ্টি। পরিকল্পনা শেষে প্রায় ৬'৫ মিলিয়ন লোকের কর্মসংস্থান হইয়াছে বলিয়া হিসাব করা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ২০ শতাংশ ধার্য করা হইয়াছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতবর্ষের পরিকল্পনা অর্থনীতির ইতিহাসে নবতম সংযোজন। ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রচেষ্টার দৃষ্টিকোণ হইতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলি রচিত। অনগ্রসর অর্থনীতির সর্বাঙ্গীণ মানোন্নয়নের উদ্দেশ্যে রচিত বলিয়া পরিকল্পনাগুলির লক্ষ্য সুদূরপ্রসারী। পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলি এই উদ্দেশ্যে পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করিয়াছে; তৃতীয় পরিকল্পনা ইহাদেরই অনুগামী। প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিজ্ঞতার আলোকে তৃতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলি নির্দিষ্ট হইয়াছে। সংক্ষেপে লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ:

(ক) পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বার্ষিক শতকরা পাঁচভাগ হারে বৃদ্ধি;

(খ) খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং শিল্প ও রপ্তানীর প্রয়োজন মিটাইবার জন্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি;

(গ) দেশের নিজস্ব সম্পদের মাধ্যমে প্রায় দশ বৎসরের মধ্যে উত্তরোত্তর শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে ইস্পাতশিল্প, জ্বালানি ও শক্তি ইত্যাদির সম্প্রসারণ;

(ঘ) যত অধিক সম্ভব শ্রম-নিয়োগ ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থানের সম্যক সম্প্রসারণ;

(ঙ) আয় ও সম্পদের বৈষম্য হ্রাস এবং অর্থ নৈতিক ক্ষমতার অপেক্ষাকৃত সমান বণ্টন।

ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি সৃষ্টির প্রথম সোপান হিসাবে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে গণ্য করা যায়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মৌলিক দৃষ্টিকোণ ও অভিজ্ঞতা এই পরিকল্পনাকে স্বভাবতঃই প্রভাবিত করিয়াছে। তথাপি, কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে ইহার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রধানতঃ, তৃতীয় পরিকল্পনায় গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে

কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প, শক্তি ও যানবাহন ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর। শিল্পোন্নয়ন ও যন্ত্রীকরণ প্রচেষ্টার দ্রুত সম্প্রসারণ, সাম্য ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থামুখীন অগ্রগতি এবং অধিকতর কর্মসংস্থান প্রচেষ্টা তৃতীয় পরিকল্পনার কর্মসূচীর অন্তর্গত। এই পরিকল্পনায় সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে কৃষির। যত অধিক সম্ভব কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও বহুমুখীন গ্রামীণ অর্থনীতি সৃষ্টির মাধ্যমে কৃষিনির্ভর প্রয়োজনাতিরিক্ত জনগণের কিছু পরিমাণকে জমি হইতে সরাইয়া আনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যাপক গ্রামীণ উন্নয়ন প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া গ্রাম্য জনসাধারণকে অধিকতর উৎপাদন কার্যে প্রয়োগ করাও এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। এইরূপ গ্রামোন্নয়ন ব্যবস্থায় গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ও দায়িত্ব তৃতীয় পরিকল্পনায় স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে।

দ্রুত আর্থনীতিক উন্নতির জন্য, দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতই তৃতীয় পরিকল্পনাও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে ইস্পাত, শক্তি, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি উৎপাদনকারী মূল ও গুরু শিল্পোন্নয়নের উপর। শিল্প সংগঠনের প্রয়োজনীয় অংশ হিসাবে ক্ষুদ্র শিল্পগুলির উন্নতির প্রতিও তৃতীয় পরিকল্পনায় দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। ইহা ছাড়াও শিক্ষা ও সমাজসেবার ক্ষেত্রেও এই পরিকল্পনা ক্রমোন্নতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে।

কর্মসূচীর ব্যাপকতার জন্য তৃতীয় পরিকল্পনায় বিনিয়োগের পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। পরিকল্পনাকালে (১৯৬০-৬১ হইতে ১৯৬৫-৬৬) মোট সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ হইবে ৭৫০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন খাতে পৃথক পৃথক বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ

	বিষয়	মোট বিনিয়োগ (কোটি টাকা)
১	কৃষি ও সমাজোন্নয়ন	১০৬৮
২	বড় ও মাঝারি সেচব্যবস্থা	৬৫০
৩	শক্তি	১০১২
৪	গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্প	২৬৪
৫	বৃহৎ শিল্প ও খনিজ	১৫২০
৬	যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা	১৪৮৬
৭	সমাজসেবা ও বিবিধ কার্য	১৩০০
৮	অন্যান্য ব্যয়	২০০
	মোট	৭৫০০ কোটি টাকা

উপরোক্ত কর্মধারার জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হইবে তাহার অধিকাংশই দেশের আভ্যন্তরীণ উৎস হইতে যতদূর সম্ভব উত্তোলনের কথা পরিকল্পনা কমিশন চিন্তা করিয়াছেন। তথাপি, শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য বৈদেশিক সাহায্যের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উল্লিখিত কার্যসূচীর মাধ্যমে মোট ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হইবে আশা করা যায়। পরিকল্পনা শেষে জাতীয় আয় প্রায় ৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে হিসাব করা হইয়াছে। কৃষি ও আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে উৎপাদন প্রায় ২৫ শতাংশ, খনি ও শিল্পে ৮২ শতাংশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পাইবে মনে করা হয়। মাথা পিছু আয় ১৯৬০-৬১ সালের ৩৩০ টাকা হইতে তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে বৃদ্ধি পাইয়া ৩৮৫ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

ভারতের পরিকল্পনা অর্থনীতির বিরুদ্ধে যে সাধারণ সমালোচনা করা হইয়া থাকে তাহা তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমালোচকদের মতে তৃতীয় পরিকল্পনায় অধিক পরিমাণ শ্রমবিনিয়োগ অপেক্ষা অধিক অর্থবিনিয়োগের দিকেই বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে। অথচ, ভারতের ক্রমবর্ধমান শ্রমিকসংখ্যার আশু কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বিত হওয়া উচিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, তৃতীয় পরিকল্পনাকালে নূতন শ্রমিকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ হইবে প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষ; অপরপক্ষে, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে মাত্র ১ কোটি ৪০ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের জনগণের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি-পরিকল্পনা অর্থনীতির লক্ষ্য হইলেও, যে পরিমাণ খাদ্য ও আনুষঙ্গিক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণ উপকৃত হইতে পারে সেদিকে তৃতীয় পরিকল্পনার প্রচেষ্টা আশানুরূপ নয়। তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক সাহায্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা, সমালোচকদের মতে, তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম ত্রুটি। সুনিয়ন্ত্রিত রপ্তানীবৃদ্ধির দিকে পরিকল্পনার দৃষ্টি অধিকতর নিবদ্ধ হইলে বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্তির অনিশ্চয়তা অনেকাংশ দূর হইতে পারে।

ভারতীয় অর্থনীতির পুঞ্জীভূত সমস্যার সমাধানের জন্য কোন একটি পরিকল্পনার সাফল্যের মুখাপেক্ষী হওয়া অযৌক্তিক। পরিকল্পনা অর্থনীতির ধারাকে সুষ্ঠু ও অবিচ্ছিন্নভাবে রক্ষা করাই একান্ত প্রয়োজন। উপরন্তু, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিকল্পনা পরিচালনার দরুণ পরিকল্পিত অর্থনীতির ক্রমোন্নতি অনেকাংশে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল।

C. U Pre-University Questions, 1961

ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

Full marks—100

Group A

1. Describe the advantages of division of labour and point out its limitations. (পৃঃ ৩৯-৪৩ দেখ।)

2. What is Capital ? What are the factors upon which the accumulation of capital depends ? (পৃঃ ২৬ ও ২৮-২৯ দেখ।)

3. Distinguish between *elastic* and *inelastic* demand. Is the demand for the following elastic or inelastic ?—

(a) rice, (b) diamonds and (c) motor cars. (পৃঃ ৫৩ ও ৫৪-৫৫ দেখ।)

4. Explain how price is determined in the market under conditions of competition. (পৃঃ ৬০-৬২ দেখ।)

5. State the functions of a Central Bank. (পৃঃ ১০০-১০১ দেখ।)

6. What are the aims and objectives of India's Five-Year Plans ? (পৃঃ ১৫৭-১৫৯ দেখ।)

Group B

7. What do you mean by the following terms ?

(a) State, (b) Government, (c) Nation and (d) Nationality. (পৃঃ ১৭১-১৭২ ও ১৮৫-১৮৬ দেখ।)

8. Distinguish between Democracy and Dictatorship. Which of these two would you prefer, and why ? (পৃঃ ১৯৬ ও ১৯৭-১৯৮ দেখ।)

9. Describe the rights and duties of citizens. (পৃঃ ২৪১-২৪৬ দেখ।)

10. Distinguish between Parliamentary and Presidential forms of Government. Indicate their respective merits and demerits. (পৃঃ ২০৭-২১০ দেখ।)

11. Which would you prefer, a unicameral or a bicameral legislature ? Give reasons for your perference. (পৃঃ ২১৩-২১৪ দেখ।)

12. Define Political Party. Describe the functions of political parties in a modern democracy. (পৃঃ ২৪৮-২৪৯ দেখ।)

1962

Group A

1. How do you define and determine the national income of a country ? (পৃঃ ৯-১২ দেখ।)

2. Describe the relative advantages and disadvantages of large-scale and small-scale production. (পৃঃ ৪৩-৪৬ দেখ।)

3. What is money ? Describe the functions of money. (পৃঃ ৮৮-৯১ দেখ।)

4. Explain how price is determined under conditions of monopoly. (পৃঃ ৬৬-৬৯ দেখ।)

5. Show how wages are determined. (পৃঃ ৭৬-৭৮ দেখ।)

6. Describe the progress of the Indian economy under the Second Five-Year Plan. (পৃঃ ১৫৮-১৬৫ ও পরিশিষ্ট দেখ।)

Group B

7. Explain the characteristics of the State. How would you distinguish the State from the Government ? (পৃঃ ১৭০-১৭৩ ও ১৭৫ দেখ)

8. Distinguish between Unitary and Federal forms of Government. What are their respective merits and drawbacks ? (পৃঃ ২০১-২০৫ দেখ।)

9. Explain the theory of separation of powers. How far is a strict separation of powers practicable and desirable ? (পৃঃ ২১৮-২২১ দেখ।)

10. Explain the meaning of 'liberty', and point out its relation to law. (পৃঃ ২৩৩ ও ২৩৫-২৩৬ দেখ।)

11. What is meant by Public Opinion ? Describe the chief agencies for forming public opinion in modern times. (পৃঃ ২৫৩-২৫৬ দেখ।)

12. Discuss the case for, and against, universal adult suffrage. (পৃঃ ২৫৭-২৫৯ দেখ।)

Burdwan University Entrance Examination

Questions, 1961

ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

Full marks—100

Group A

1. Explain the concept of 'National Income'. How is such income calculated ? (পৃঃ ৯-১২ দেখ।)

2. What is elasticity of demand? Distinguish between elastic and inelastic demand. What are the factors which influence such elasticity? (পৃঃ ৫৩-৫৫ দেখ।)

3. How is price determined in a market under conditions of perfect competition? (পৃঃ ৬০-৬২ দেখ।)

4. Distingush between 'money wages' and 'real wages'. Upon what factors do real wages depend? (পৃঃ ৭৫-৭৬ দেখ।)

5. Briefly outline the main features of India's Second Five Year Plan. (পৃঃ ১৬৪-১৬৫ দেখ।)

Group B

6. Distinguish between Democracy and Dictatorship. What are the conditions for the success of democracy in a country? (পৃঃ ১৯৭-১৯৮ ও ১৯৬-৯৭ দেখ।)

7. Define Liberty. What are its main safeguards? (পৃঃ ২৩৩ ও ২৩৬-২৩৮ দেখ।)

8. Define political party. What are the functions of such parties in a democracy to-day? (পৃঃ ২৪৮-২৪৯ দেখ)

9. Point out the distinction between Parliamentary and Presidential Government. What form of government prevails at the Centre under our new Constitution? Discuss fully. (পৃঃ ২০৭-২০৯ ও ২১০ দেখ।)

10. What is Public Opinion, and what are its principal organs? (পৃঃ ২৫৩-২৫৬ দেখ।)

ELEMENTS OF ECONOMICS AND CIVICS

1962

Group A

1. State the Law of Demand. Explain why a rise in price tends to decrease demand and a fall in price tends to increase it.

2. What is the Central Bank? Discuss its functions.

3. Define Rent and examine the factors that determine Rent.

4. What do you mean by a Direct and an Indirect Tax? Discuss the merits and demerits of Direct and Indirect Taxes.

5. Explain the importance of Cottage industries in Indian economy. Discuss the steps that have been suggested for their development in the Second Five-Year Plan of India.

6. Give a brief outline of India's Third Five-Year Plan.

Group B

7. What do you mean by the term State ?
Are the following States?—
(*a*) The State of West Bengal.
(*b*) A College Union.
(*c*) The United Nations.

8. Distinguish between Unitary and Federal forms of Government. Give at least one illustration in each case.

9. What is a Bi-cameral legislature ? Discuss its merits and demerits.

10. What are the hindrances to good citizenship ? State briefly how they can be removed.

11. Give arguments for and against Universal Adult Suffrage.

Has it worked satisfactorily in India ? Give reasons for your answer.

12. Write short notes on any three of the following :—
(*a*) Nation.
(*b*) Nationality.
(*c*) United Nations.
(*d*) Right of Self-determination.
(*e*) Parliamentary Government.
(*f*) Dictatorship.

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	১	ncome	Income
২৮	১৮	উৎপাদনসমূহ	উপাদানসমূহ
৪২	৯	যদি কোন	যদি কোন কারণে
৫৫	১৪	মূল্য স্তরের	মূল্যের
৬৪	১৮	উৎপাদন কম হয়	উৎপাদন ব্যয় কম হয়
৯৪	১৫	মুদ্রাস্তর	মূল্যস্তর
১৬৪	১	১৯৫১	১৯৫৬